ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা

(১৭৫১-১৮৫৫ খ্রীঃ)

শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক : শ্রীশান্তিকুমার মিত্র
২এসি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর : শ্রীগণেশচন্দ্র মিত্র
জুপিটার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ১৮-এ হরিতকী বাগান লেন
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৬১

মূল্য : ৪॥০ টাকা

বাবা ও মায়ের—

শ্রীচরণে

প্রাক্-কথা

নানাকারণে সুদীর্ঘকাল যন্ত্রস্থ থাকিবার পরে অবশেষে ইতিহাসাশ্রিত 'বাংলা কবিতা' প্রকাশিত হইল। দীর্ঘকাল পরে মুদ্রণকার্য অতিক্রত শেষ করিতে হইয়াছে বলিয়া বেশ কিছু যান্ত্রিক প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। এই ত্রুটি আমার এবং সেজন্য সর্বাগ্রেই সবিনয়ে ইহা স্বীকার করিতেছি। শুদ্ধিপত্রে অপেক্ষাকৃত গুরুতর ভুলগুলির উল্লেখ করিয়াছি। বলাবাহুল্য যে, গ্রন্থের মূল্য বিচারের ভার পাঠকসাধারণের—ভূমিকালেখক স্বয়ং সে দায়িত্ব দেশবাসীর উপর প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থরচনার বেশ কিছুকাল পরে প্রকাশকালে যে কথাগুলি মনে হইতেছে আমি এখানে শুধু তাহাই নিবেদন করিতেছি।

মাত্র এক শতকের মধ্যে রচিত, বাংলা কবিতার মধ্যে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা, উল্লেখ বা ইঙ্গিত আছে, বাংলার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের উপর বিগত শতাব্দীতে তাহা কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, কবিতাগুলির ঐতিহাসিকতা নির্ণয়সূত্রে এই গ্রন্থে তাহাই আলোচনার প্রয়াস পাইয়াছি। গ্রন্থের সময়কাল সম্বন্ধে কথারম্ভে যাহা বলিয়াছি এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবু কবি ঈশ্বরগুপ্তের রচনা গ্রন্থের শেষ আলোচ্য সীমা হিসাবে গ্রহণ করায় কিছু ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে এই আশঙ্কায় সে সম্বন্ধে আরও কিছু বলা প্রয়োজন। ঈশ্বরগুপ্তের সমকালীন কবি রঙ্গলালের ঐতিহাসিক কবি-খ্যাতি অনস্বীকার্য। কিন্তু রঙ্গলালের রচনা এই গ্রন্থের আলোচনাভুক্ত না করিবার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত রঙ্গলাল গুপ্ত-কবির সমকালীন হইলেও তাঁহার ঐতিহাসিক কাব্যগুলি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরবর্তীকালের। প্রসঙ্গত মনে হইতে পারে যে, ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে আলোচনার সীমা নির্দিষ্ট না করিলেই ত' এই সমস্যার নির্বিঘ্ন সমাধান সম্ভব। তাহা হয়ত সম্ভব, কিন্তু রঙ্গলালের রচনা আলোচনাভুক্ত না করিবার প্রধান কারণ সময়কালের কিঞ্চিৎ পূর্বাপরতা নহে। ঈশ্বরগুপ্ত আধুনিকতার অগ্রদূত হইলেও তাঁহার ঐতিহাসিক কবিতাগুলি পূর্ববর্তী কবিদেরই সমশ্রেণীর কিন্তু রঙ্গলালের কাব্যে ঐতিহাসিকতা ভাষা এবং ভাবের বৈচিত্র্যে এবং রোমান্সের রসমাধুর্যে এক নূতন ধারার সৃষ্টি করিয়াছে। পরবর্তীকালে এই ধারার অনুসরণ করিয়াছেন কবি নবীনচন্দ্র সেন। রঙ্গলালের রচনা আলোচনাভুক্ত করিতে হইলে উক্ত ধারাটিরও সামগ্রিক আলোচনা আবশ্যক হইয়া উঠে। কিন্তু তাহার পরিবর্তে যদি এই নূতন ধারার সূচনা এবং প্রসঙ্গক্রমে রঙ্গলালের রচনার উল্লেখ করা যায় তাহা হইলে ঈশ্বরগুপ্তের রচনা আলোচনার শেষ সীমা হিসাবে গ্রহণে কোন বাধা থাকেনা। এই নবধারার বিস্তারিত

আলোচনা অন্যত্র করা উচিত মনে করিয়া আমি ঈশ্বরগুপ্তের রচনাকেই গ্রন্থের আলোচ্যসূচির শেষ সীমায় রাখিয়াছি।

এই সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। আলোচ্য কবিতাসমূহের অনেকগুলিই আয়তনে অতিক্ষুদ্র এবং একান্তভাবে স্থানীয়—সেইজন্য সমগ্র আলোচনার মধ্যে একটি মূলগত ঐক্যসূত্র সর্বত্র সুস্পষ্ট মনে না হইতে পারে, তথাপি স্থানীয় গুরুত্ব ব্যতীত সমগ্রভাবে এই কবিতাগুলির মধ্যে তৎকালীন সমাজ এবং ব্যক্তিমানসপ্রবণতার চিত্র সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করি।

পরিশেষে, এই গ্রন্থ রচনায় যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের উদ্দেশেই কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমার শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ের সদা স্নেহ-সতর্ক দৃষ্টি না থাকিলে এই দুরূহ কার্য বেশিদূর অগ্রসর হইত কিনা সন্দেহ। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের নিকট হইতে পুস্তক প্রকাশের জন্য সস্নেহ তাগিদ পাইয়া বিশেষ উৎসাহিত বোধ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য দুর্লভ গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি এবং অন্যবিধ উপকরণ এবং পরামর্শ দান করিয়া এই গ্রন্থ রচনায় সহায়তা করিয়াছেন। পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর কালীকিঙ্কর দত্ত এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ ও ডক্টর তপনমোহন রায়চৌধুরী এবং আরও অনেকে নানাভাবে পরামর্শ দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। মৌখিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়া তাঁহাদের আন্তরিক স্নেহ ও প্রীতি ক্ষুণ্ণ করিতে চাহিনা। সর্বশেষে জুপিটার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-এর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুধেন্দ্রনাথ ঘোষের নাম না করিয়া পারিতেছি না, কেননা তাঁহার একান্ত আগ্রহ ও শুভেচ্ছা ভিন্ন এই গ্রন্থ কোন-ক্রমেই প্রকাশ করা সম্ভব হইত না।

রথযাত্রা, ১৩৬১ সাল
শ্রীরামপুর

বিনীত
শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ ত্রুটির সংশোধিত পাঠ-নির্দেশ

পৃষ্ঠা			
(১)	টাকাকার	স্থলে পঠিতব্য	টীকাকার
(৭)	কৃষ্ণদাসের জীবদ্দশায়	” ”	কৃষ্ণদাসের গ্রন্থে তাঁহাদের জীবদ্দশায়
(৮)	কৃষ্ণদাস এবং তাঁহার	” ”	কৃষ্ণদাস এবং বৃন্দাবন দাসের
(১০)	ত্রিপুর	” ”	ত্রিপুরা
(১২)	ঢাকায় শায়েস্তা খাঁর	” ”	শায়েস্তা খাঁর ঢাকায় অবস্থানকালের যে বিবরণ
(১৪)	ইতিপূর্বে	” ”	পরে
(৩০)	inadequacy secrets	”	'inadequacy in history—the dead carrying most of their secrets.'
(৩১)	বর্ণাশুদ্ধি	” ”	বর্ণ শুদ্ধ
(১৫)	মল্লানামশিনূর্ণাং	” ”	'মল্লানামশনিনূর্ণাং,
(১৭)	পাদটীকা এরূপ হইবে—		সুজাদি সুজাউদ্দীনের সংক্ষেপ হইতে পারে এবং এই সুজাউদ্দীন সরফরাজ খাঁর জামাতা হইলে কোন কালগত বৈষম্য থাকে না।
(৪৫)	বাহারইস্তান ঘাইবী	স্থলে পঠিতব্য	বহারস্তানই ঘাইবী
(৬৩)	পাদটীকা এরূপ হইবে—		স্থানীয় বিবরণ হইতে পরে জানা যায় যে, রাজকুমারবাবুর হত্যার ব্যাপারে ইংরেজদের কোন যোগসাজস ছিল না।
(৬৬)	জগত শেঠ, ফতেচাঁদ	” ”	জগতশেঠ ফতেচাঁদ (একইব্যক্তি)
(৭৬)	উপভোগ্য উঠিয়াছে	” ”	উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।
(৭৭)	হুলি	” ”	হোলি
(৯৬)	সুইংটন	” ”	সুইন্‌টন
(১১৯)	মুক্তাগার	” ”	স্নানাগার
(১৫৫)	চাল শুদ্ধ	” ”	চালসমেত
(১৯৩)	ছড়াটি হইতে	” ”	ছড়াটিতে

ভূমিকা

শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় নীরবে ও স্বনিষ্ঠায় একটি অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। বাংলা সাহিত্য, বাঙালীর সমাজ ও ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁরা অনুরাগী সুপ্রসন্নবাবু তাঁদের সপ্রশংস কৃতজ্ঞতা অর্জন করবেন, এ-সম্বন্ধে সংশয় নেই। কোন প্রাথমিক কাজই একেবারে ত্রুটিহীন সাধারণত হয় না; এ-গ্রন্থও তা' নয়। তবু তিনি যে কাজটুকু করে গেলেন, যে সম্ভাবনা দেখিয়ে দিলেন তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাতেই হয়।

মধ্যযুগীয় বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও রচিত হয়নি, তার মালমসলা অর্থাৎ উপাদান সংগ্রহ, বিচার ও বিশ্লেষণ চলছে মাত্র। এই সব উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বহুদিন সরকারী দলিলপত্র, বিদেশী পর্যটক ও ব্যবসায়ীর বিবরণ ইত্যাদির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিছুদিন ধরে আমাদের দৃষ্টি সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে, আমরা ক্রমশ জানছি যে, প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য আত্মগোপন করে আছে এই সাহিত্যের মধ্যে, এবং স্বীকার করছি যে. বাঙালীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এই সাহিত্য ছাড়া অন্যত্র পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তা' ছাড়া অনেক সময় এও ক্রমশ মনে হয়, সরকারী দলিলপত্র মাঝে মাঝে যতটা মিথ্যাচারী ও একদেশদর্শী হয়, বিদেশী পর্যটকের বিবরণ যত অসম্পূর্ণ ও অন্ধের হস্তীদর্শনবৎ হয়, সমসাময়িক সাহিত্যের সামগ্রিক উপাদান তত হয় না; অন্তত বাংলার মধ্যযুগীয় সাহিত্য সম্বন্ধে বোধ হয় তা' দাবী করা চলে। সম্প্রতি কোন কোন বাঙালী ঐতিহাসিক প্রমাণ করেছেন, এ দাবী অনেকাংশে সত্য। গাল-গল্প, বস্তুনিরপেক্ষ কল্পনার আকাশমার্গে বিচরণ ইত্যাদি প্রচুর আছে, তবু বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের পক্ষে নীর থেকে ক্ষীর বেছে নেওয়া খুব কঠিন নয়, বিশেষত যেখানে অন্যান্য উপাদান বিদ্যমান।

সুপ্রসন্নবাবুর বইখানা বাংলার সুবিস্তৃত মধ্যযুগের একাংশের উপাদান সংগ্রহের একটি প্রশংসনীয় প্রয়াস, এবং সে প্রয়াস 'ইতিহাসাশ্রিত' কাব্যের সীমার মধ্যে। এ-প্রয়াস তিনি আরো বিস্তৃত করুন, এই আমার অনুরোধ। চর্যাপদ থেকে আরম্ভ করে অন্তত ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বাংলা পদ্য ও গদ্য সাহিত্য উভয়ই তাঁর ভবিষ্যৎ প্রয়াসের অন্তর্ভুক্ত হোক্। বাঙালীর জীবনাচরণের সকল দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি যদি উপাদান অন্বেষণ ও বিশ্লেষণের প্রাথমিক কৃষিকার্যটুকু করে যেতে পারেন, কিছুদিন পর তিনি সোনা ফলাতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

বর্তমান গ্রন্থের মূল্য বিচার ভূমিকার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু প্রয়াসটির দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এবং গ্রন্থকারকে আমার সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২৮ নভেম্বর, ১৯৫৩

নীহাররঞ্জন রায়

বিষয়-সুচী

দ্বিতীয় অধ্যায় : রাজকাহিনী ৮৯—১৫২

সঙ্কেত

সা-প-প= সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

র-সা-প-প= রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

সা-স = বর্ধমান সাহিত্য সভার পুথি

প = বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথি

J. A. S. B. = Journal of the Asiatic Society of Bengal.

I. H. Q = Indian Historical Quarterly.

কথারম্ভ

প্রাচীন ভারতবর্ষে ইতিহাস সাহিত্যের বিষয়ীভূত এবং সাহিত্য ধর্মের অঙ্গীভূত ছিল। সে যুগের পুরাকাহিনীর মধ্যে ইতিহাস ও কাব্যের যেন এক উদ্বাহ-সমন্বয় ঘটিত। তাই সে যুগের শাস্ত্রে ইতিহাসবাচ্য ছিল—"ইতিহাসপুরাণম্"। মহাভারতকারও লিখিয়াছিলেন,—

ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষাণামুপদেশ সমন্বিতম্।
পুরাবৃত্ত কথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের উপদেশ যে পুরাকাহিনীতে থাকিত প্রাচীন কালে তাহাই ইতিহাস বলিয়া গণ্য হইত। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার শ্রীধর স্বামীও লেখেন—

আর্য্যাদি বহু ব্যাখ্যানং দেবর্ষি চরিত্রাশ্রয়ম্।
ইতিহাসমিতি প্রোক্তং ভবিষ্যাদ্ভুত ধর্ম্মযুক্॥

অর্থাৎ পূত চরিত্র ঋষিগণের মুখনিঃসৃত আখ্যানসমূহ, দেব ও ঋষি চরিত্র, ভবিষ্যৎ ধর্ম্মকর্মাদির বিবরণযুক্ত গ্রন্থই ইতিহাস।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও ইতিহাস

বুদ্ধদেব, মহাবীর প্রভৃতি ধর্ম্মনেতাদের কথা বাদ দিলে সংস্কৃত সাহিত্যে ঐতিহাসিক জীবনী হিসাবে বাণভট্টের লেখা "হর্ষচরিত" উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু "হর্ষচরিত" গদ্যে লেখা। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লইয়া রচিত প্রাকৃত কাব্য বাক্‌পতিরাজের 'গউড়বহ' উল্লেখযোগ্য। অপভ্রংশে রচিত 'পৃথ্বীরাজরাসৌ' ঐতিহাসিক কাব্য। রাজস্থানীতে এই ধরণের বহু রচনা আছে। তন্মধ্যে খুব পুরাতন হইতেছে—'বীসলদেব রাসৌ।' ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত চারণদের বহু ছড়াও রাজ-স্থানীতে পাওয়া যায়। "প্রাকৃতপৈঙ্গলের" কতকগুলি ছড়া অবহট্‌ঠে রচিত। এগুলির রচনাস্থান সম্ভবতঃ পূর্বভারত। পাল যুগে মদনপালের রাজত্বকালে সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' নামক একখানি দ্ব্যর্থবোধক ঐতি-হাসিক কাব্য রচনা করেন। এই দুরূহ শ্লেষাত্মক কাব্যের প্রতি শ্লোক অত্যন্ত সুকৌশলে রচিত।

প্রাচীন বাংলা কাব্যে ঐতিহাসিক তথ্য

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক তথ্য প্রাসঙ্গিক উক্তিরূপে কাব্যের অঙ্গীভূত হইয়া আছে। একমাত্র ত্রিপুর-রাজবংশের ইতিহাসমূলক কাব্যগ্রন্থ প্রাচীন রাজমালা এবং চম্পকবিজয় ব্যতীত অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত নিছক ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত অপর কোন কাব্যের উল্লেখ বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায় না। প্রাচীন রাজমালা এবং চম্পকবিজয় নিঃসন্দেহে বিরাট কাব্য গ্রন্থ, কিন্তু যে সময় এই কাব্যগুলি রচিত হয় বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে সেই যুগে অন্যান্য কাব্যে ইতিহাসের অনুরূপ বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে গঙ্গারাম দত্ত বাংলা দেশে বর্গী আক্রমণের ঘটনা লইয়া একটি ইতিহাসাশ্রিত কাব্য রচনা করেন। গঙ্গারামের মহারাষ্ট্রপুরাণে ঐতিহাসিক তথ্যই মুখ্য এবং কাব্য গৌণ। ইহার পরবর্তীকালে রচিত কোন কোন কাব্যের মূল বিষয় দৈব-মাহাত্ম্য কাহিনী হইলেও পূর্ববর্তী ধর্মাশ্রিত কাব্যের সহিত এই কাব্য-গুলির দৃশ্যতঃও পার্থক্য আছে। যুগের পরিবর্তনের সহিত স্বতঃই কবির দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হইয়াছে। তদ্ব্যতীত পূর্ব রীতি অনুযায়ী কাব্যের মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্যের স্বল্পতার পরিবর্তে যে ক্ষেত্রে কবির রচনা পুরাপুরি ইতিহাসাশ্রয়ী নহে, সেক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশ পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বেশী। গঙ্গারাম দত্ত রচিত মহারাষ্ট্রপুরাণের রচনাকাল ১৭৫১ খৃষ্টাব্দ হইতেই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনার বেশ সন্ধান পাওয়া যায়। সেই কারণে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দ হইতেই আমাদের আলোচনা সুরু করিয়াছি।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ রচনা ধর্ম্মসম্পৃক্ত অথবা ধর্মাশ্রয়ী। প্রায়শঃ একই ধর্মাশ্রিত কাহিনী একাধিক কবির উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে। কাব্য-কাহিনীর নূতনত্বের জন্য পাঠক-শ্রোতৃসমাজের পক্ষ হইতে যেমন কোন সচেতন দাবী উঠে নাই, রচয়িতাদের মধ্যেও কাহিনীর বৈচিত্র্য সম্পাদনে কোন আগ্রহ দেখা যায় নাই। দৈবী মাহাত্ম্যসূচক এই সকল ধর্মাশ্রিত কাব্য-কাহিনীর মধ্যে মাঝে মাঝে পৃথিবীর মানুষের কথা পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু দেবদেবীর ক্ষণস্থায়ী সন্তোষ-অসন্তোষের আবর্তে বিপর্যস্ত নরনারীর লৌকিক জীবনের যতটুকু কাহিনী এই সকল কাব্য-কথার মধ্যে আছে, সমগ্র কাব্যায়তনের তুলনায় তাহা যৎসামান্যই। তথাপি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া আরো পরবর্তী সময়ে রচিত কাব্যের মধ্যেও তৎকালীন সমাজ-চিত্র এবং

রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে, দেবদেবীর মহিমা প্রচার কবির উদ্দেশ্য হইলেও দেশকালের প্রভাব, বিশেষতঃ যে রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাবলী জনগণের জীবনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার প্রভাবমুক্ত হইয়া একেবারে অবিমিশ্র দেব-মহিমা কীর্তন কোন কবির পক্ষেই সম্ভব হয় নাই, বরং সমসাময়িক সমাজ-রাষ্ট্র কাহিনী দৈবী মহিমা ও অদৃষ্টবাদের রঙে রঞ্জিত হইয়া ঈষৎ ভিন্নাকারে ব্যক্ত হইয়াছে। সেজন্য যে পরিবেশের মধ্যে কাব্য রচিত, তাহার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রভাব কাব্যের মধ্যে লক্ষিত হয়। সে যুগের কবিগণ আত্মকাহিনী বর্ণনসূত্রে অথবা কোন অপ্রত্যাশিত ও বিশেষ ঘটনার উল্লেখ প্রসঙ্গেই কিছু কিছু সমকালীন ঘটনা প্রকাশ করিতেন এবং ইহাও তাঁহারা এমনভাবে করিতেন যাহাতে সেই ঘটনার লৌকিকতা প্রতিপাদ্য বিষয়ের গুরুত্ব হানি না করে।

চর্যাগীতি

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনরূপে যে চর্যাপদগুলির উল্লেখ করা হয় সেই গীতগুলি অবশ্যই সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রচিত হয় নাই। বৌদ্ধ সহজ-সাধনার গূঢ় ইঙ্গিতব্যঞ্জক এই গীতগুলির প্রকৃত অর্থ পর্যন্ত অনেকস্থলে অবোধ্য, তথাপি ইহাদের মধ্যে সেই যুগের (দশম-একাদশ শতকের) সমাজ-জীবনের এমন এমন বহু চিত্র আছে যাহা অন্যত্র অপ্রাপ্য। এই গীতগুলির মধ্যে এক সুদূর অতীত যুগাশ্রিত নদীমাতৃক বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের একাধিক খণ্ড পরিচয় আছে।[১]

শূন্যপুরাণ

সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ আছে রামাই পণ্ডিতের ভণিতায় শূন্যপুরাণান্তর্গত সাংজাত পদ্ধতির এক ছড়ায়। শূন্যপুরাণের রচয়িতা ও রচনাকাল সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। ইহার আধুনিক রূপ খুব প্রাচীন না হইলেও উল্লিখিত রাজনৈতিক ঘটনাটি চতুর্দশ শতকের। ইহা ধর্মঠাকুরের গাজনের শেষ দিনের অনুষ্ঠান 'ঘরভাঙ্গার' গীত 'জালালি কলিমা' বা বড় জালালির অন্তর্গত। সেই সময়ে বাঙালী হিন্দুগণ নিজেদের দুর্বলতা এবং অপ্রতিরোধী মনোভাব দৈবীবিধানের আস্তরণে গোপন করিয়া মুসলমান অভিযান-শাসন-অত্যাচার কিভাবে অদৃষ্টের দোহাই দিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল—এই ছড়াটিতে তাহার নিদর্শন আছে। মুসলমান শাসনাধিকারে বাস করিয়া রাজশক্তির অত্যাচার নির্বিরোধে সহ্য করিবার সহজ উপায় ছিল সেই শাসকশ্রেণীর অত্যাচারকে

---

১ প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী—সুকুমার সেন পৃ ৩৮

পাপের বিধিদত্ত শাস্তিরূপে গ্রহণ করা। এই ছড়ার রচয়িতাও জনগণের মনে সেই ভাব দৃঢ়তর করিতে সহায়তা করিয়াছেন শাসক মুসলমান শক্তির যদৃচ্ছ আচরণকে যবনবেশধারী ধর্মঠাকুর কর্তৃক শাস্তিবিধান বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়া। ছড়াটি উড়িষ্যার জাজপুর অঞ্চল সংক্রান্ত। এই জাজপুর এককালে ধর্মঠাকুরের পীঠস্থান ছিল। ছড়ার রচয়িতা জাজপুরে মুসলমানদের আগমনের কারণস্বরূপ স্থানীয় ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণদের এই অন্যায় অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্যই কৈলাস ত্যাগ করিয়া যবনরূপে মর্তে আবির্ভূত হইলেন।

এইরূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহরণ
এবড় হইল অবিচার
অন্তরে জানিয়া মর্ম কৈলাস তেজিয়া ধর্ম
মায়ারূপী হৈল খোন্দকার॥
হইয়া যবনরূপী শিরে পরে কাল টুপি
হাতে ধরে তিরকস কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় দেবগণে লাগে ভয়
খোদায় হইল একনাম॥

চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে দিল্লীর বাদশাহ ফীরুজশাহ তুঘলক্ উড়িষ্যা অভিযান করেন। কবি সেই বলদৃপ্ত পরাক্রান্ত বাদশাহকে যবনবেশধারী ধর্ম রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের ফলেই ধর্মের যবনবেশে আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া কবি মন্তব্য করিয়াছেন বটে কিন্তু এই অত্যাচারের বিবরণ সত্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলমান অভিযান তথা বিজয়পর্বকে স্বীকৃতদানের ইহা কি এক প্রকার কৈফিয়ৎ নহে? শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, জাতির মানসক্ষেত্র নানাভাবে আগে হইতেই এই বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। মুসলিম্ অভিযাত্রীরাই তো কল্কি অবতার, এবং অধারূঢ় এই অবতারের আগমনের জন্য দূরদৃষ্টিহীন সংকীর্ণবুদ্ধি ভাগ্যনির্ভর ধর্মোপদেষ্টারা আগে হইতেই দেশের লোকের চিত্তভূমি তৈরী করিতেছিলেন। মুসলমানেরা যখন আসিয়া পড়িলেন, তখন বিহ্বল বিক্ষিপ্ত জনচিত্তকে বুঝাইতে কষ্ট হইল না যে, ইহাই বিধাতার অমোঘ বিধান, কল্কি অবতার তো আসিবেনই।[২]

২ বাঙ্গালীর ইতিহাস পৃ ৮৪৮

ছড়াটির পরবর্তী অংশে উক্ত ধর্মবেশরূপী মুসলমান অভিযাত্রীদের অত্যাচার এবং সেই অত্যাচারের ফলে ভাগ্যনির্ভর দেশবাসীর অনাতঙ্কী নিশ্চিন্তভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে পলায়নের এক বিস্তারিত বর্ণনা আছে। অত্যাচারী শাসকের অন্যায় শাসন অদৃষ্টবাদের দোহাই দিয়া মানিয়া লইবার যে মনোবৃত্তি ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে দেখা গিয়াছে, চারি-পাঁচশত বৎসর পরেও ইংরেজদের প্রথম আগমন এবং শাসনভার গ্রহণ উপলক্ষে গ্রাম্য কবি রচিত কবিতার মধ্যেও সেই একই মনোভাবের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরবর্তী কালের বর্ণনার সহিত পূর্ববর্তী বর্ণনার পার্থক্য শুধু শাসকগোষ্ঠির রূপান্তরগ্রহণে নচেৎ উভয়স্থলেই 'স্বর্গের যতেক দেবে' মর্তে শাসকের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হইয়াছে, রাজ্যের ভাঙ্গাগড়া সূত্রে শাসকগোষ্ঠি পরিবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু দেশবাসীর সেই বিশেষ মনোভাবের লক্ষণীয় কোন পরিবর্তন হয় নাই। অবশ্য পরিবর্তন না হওয়ার স্বপক্ষেও যথেষ্ট কারণ ছিল। এই সময়ের মধ্যে রাজশক্তির রূপান্তর ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু বাঙালীর সমাজ-জীবনে সেই রূপান্তর কোন আলোড়ন সৃষ্টি করিতে পারে নাই, বিদেশী শাসকের কার্যকলাপও বাঙালীর নিষ্ক্রিয় মনোভাব এবং ভাগ্য-নির্ভরশীলতা ঘুচাইতে পারে নাই।[৩]

বাঙালী হিন্দুর অদৃষ্টবাদ

ডাক ও খনার বচনগুলির মধ্যেও কিছু কিছু ইতিহাসের উপাদান আছে। বলাবাহুল্য শূন্যপুরাণ, গোপীচন্দ্রের গান, ডাক ও খনার বচন, সেখ শুভোদয়া, আস্তের গম্ভীরা, মুর্শিদার গান প্রভৃতির অন্তর্গত এই জাতীয় ছড়াগুলির বর্তমান রূপ খুব বেশি প্রাচীন নহে। লোকমুখে প্রচলিত এই ছড়াগুলি ধীরে ধীরে যখন লিপিবদ্ধ হইয়াছে তখন সমসাময়িক সমাজের প্রভাবও অল্পবিস্তর ইহাদের উপর পড়িয়াছে। সুতরাং ইহাদের বর্তমান রূপ প্রাচীন ছড়ার অবিকৃত অনুলিপি বলিয়া গ্রহণ করা চলে না।

বিভিন্ন শ্রেণীর ছড়া

৩ বিপর্যয় যাহারা ঘটাইল সেই মুসলিম অভিযাত্রীরা সামরিক শক্তিতেই শুধু দুর্ধর্ষ ছিলেন, তাঁহারা যখন শাসক অর্থাৎ রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়া বসিলেন তখন কিন্তু গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর জীবনে কোনো পরিবর্তন দেখা দিল না, জীবনের নূতন কোনো বিস্তারও ঘটিল না, না রাষ্ট্রে না সমাজে, না শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যে, না দুঃসাহসী কোনো আবিষ্কার-অভিযানে, না ধ্যানে না মননে। কাজেই মধ্যপর্বের সুদীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়িয়া বাঙালীর ভাগ্য বা দৈবনির্ভরতা ঘুচিল না, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসও ফিরিয়া আসিল না। বাঙ্গালীর ইতিহাস পৃ ৮৫০

গোপীচন্দ্রের গীতের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে মতান্তর আছে। গোপী বা গোবিন্দচন্দ্রের এই কাহিনীর বিস্তৃতি বিস্ময়কর। সর্বত্রই বঙ্গের রাজা বলিয়া গোবিন্দচন্দ্রের উল্লেখ হইতে কাহিনীর উদ্ভব বাংলা দেশেই বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। গোবিন্দচন্দ্রের এই কাহিনীর এমনি একটি মাধুর্য আছে যাহা সমগ্র কাব্যটিকে এপিক কাব্যের ন্যায় মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। মা হইয়া তরুণ ছেলেকে সন্ন্যাস দিতেছেন—কাহিনীর এই করুণ কথা পাঠ মাত্রেই সকলের চিত্ত মথিত করিয়া তোলে। তাই তথ্য হিসাবে গোবিন্দচন্দ্র রাজার অস্তিত্ব সম্পর্কে যতই মতানৈক্য থাকুক না কেন. এই মহৎ জনশ্রুতি বিশ্বাসের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহাকে অস্বীকার করাও বড় সহজ কথা নয়। "কারণ, ইতিহাস কেবলমাত্র তথ্যের ইতিহাস নহে, তাহা মানবমনের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস।"[৪]

বিশ্বাসের ইতিহাস

ষোড়শ শতকের প্রারম্ভ হইতেই মহাপ্রভুর পন্থানুগামী ভক্ত বৈষ্ণব মহাজনগণ তাঁহার অলৌকিক চরিত্র ও জীবনী অবলম্বনে গীতিকাব্য এবং পাঁচালী রচনা করিতে আরম্ভ করেন। মানুষ শ্রীচৈতন্যের কাহিনী এই সকল মঙ্গলকাব্যের বা গীতিকবিতার উপাদান হইলেও মহাপ্রভু তাঁহার জীবদ্দশাতেই অবতার বলিয়া সর্বত্র সম্পূজিত হইয়াছিলেন এবং নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবভক্ত মহাজনের রচনা বলিয়া এই সকল কাব্যে মহাপ্রভুর অলৌকিক লীলা যেন এক দেবকল্প মানব-চরিত্রের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। জীবনীকারের নিরপেক্ষ দৃষ্টি নহে, যে-দৃষ্টিতে ভক্ত ভগবানকে দেখেন, এই বৈষ্ণব মহাজনগণ মহাপ্রভুকেও ঠিক সেই দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন এবং তাঁহাদের রচনার মধ্যেও সেই দৃষ্টি সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ঐতিহাসিক তথ্য আহরণ এবং পরিবেষণের পক্ষে এই দৃষ্টি অনুকূল নহে বলিয়া তাঁহারা আধুনিক জীবনীকারের পর্যায়ভুক্ত নহেন এবং তাঁহাদের রচনাও আধুনিক জীবনী-কাব্যের সর্বগুণযুক্ত নহে। তথাপি বৈষ্ণব মহাজনগণের কাব্যেই প্রথম সমসাময়িক মানুষের জীবন বন্দনীয় হইয়া উঠে। শ্রীচৈতন্যের চরিত্র বর্ণনাসূত্রে জীবনীকারগণ সমসাময়িক সমাজ, রাষ্ট্র এবং ধর্মের কথা নানা প্রসঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণীর জীবনীকাব্যের মধ্যে বহু ইতিহাসাশ্রিত ঘটনা ও অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।[৫]

চৈতন্যজীবনী কাব্যে ঐতিহাসিক পরিবেশ

৪ 'ঐতিহাসিক চিত্রের সূচনা'—ইতিহাস, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮

৫ 'বৈষ্ণব সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ', সা-প-প ৩য়-৪র্থ সংখ্যা ১৩৩১

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ছাড়াও এই সকল চৈতন্য-জীবনী হইতে তৎকালীন সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য আহরণ করা যায়।[৬] বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে' আছে যে, শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষগণ শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন কিন্তু জয়ানন্দের মতে শ্রীহট্টে বাস করিবার পূর্বে তাঁহারা উড়িষ্যার জাজপুরে বাস করিতেন এবং রাজা ভ্রমরের ভয়ে সে স্থান হইতে তাঁহারা শ্রীহট্টে পলায়ন করেন। এই রাজা 'ভ্রমরে'র নাম কি ছিল তাহা জয়ানন্দ বলেন নাই। জয়ানন্দ রচিত 'চৈতন্যমঙ্গলে'র সম্পাদকদ্বয় কাব্যের মুখবন্ধে এই প্রসঙ্গে কটক জেলার অন্তর্গত গোপীনাথপুর হইতে প্রাপ্ত উৎকলাধিপ কপিলেন্দ্রদেবের একটি শিলালিপির উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাহাতে মহারাজ কপিলেন্দ্র দেবের 'ভ্রমর' উপাধি দৃষ্ট হয়। এই শিলালিপিতে উল্লিখিত রাজা ভ্রমর অভিন্ন হইলে জয়ানন্দের বিবরণ হইতে নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বৃন্দাবন দাস এবং কৃষ্ণদাসের জীবদ্দশায় বৈষ্ণব ধর্ম জীবিকার উপায়রূপে অবলম্বিত হওয়ার কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

রাজা ভ্রমর

কোন দেবালয়ে কেহ সেই বৃত্তি করি।
পরিবার পুষিবেক বৈষ্ণবরূপ ধরি॥

অন্যান্য বিবরণে মধ্যে শ্রীচৈতন্যের তিরোধান সম্পর্কে জয়ানন্দ যে ঘটনা ব্যক্ত করিয়াছেন অপর চৈতন্যজীবনীকারগণের অভিমতের তুলনায় তাহাই অধিকতর প্রত্যয়বাচক। মহাপ্রভুর তিরোধানের অনতিপর হইতে বৈষ্ণবগণ যে ক্রমশঃই গুরুভেদে ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত এবং মহাপ্রভু প্রদর্শিত পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছিলেন তাহা শুধু জয়ানন্দ নহেন, লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' হইতেও উপলব্ধি হয়।

চৈতন্যজীবনীর অনুসরণে পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণব মহান্তদের জীবনী রচনার প্রবণতা দেখা যায়। এইরূপ জীবনী-কাব্য ব্যতীত 'বৈষ্ণব বন্দনা' 'শাখা নির্ণয়' প্রভৃতি জীবনী পর্যায়ভুক্ত রচনার মধ্যেও বৈষ্ণব মহান্ত ও পদকর্তাদের নাম এবং সময়ের যে বিবরণ আছে তাহা কালনির্ণয়ের পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

বৈষ্ণব জীবনীকাব্য
রসিকমঙ্গল

বৈষ্ণব জীবনী-কাব্যসমূহের অন্যতম 'রসিকমঙ্গলের' মধ্যে কিছু ইতিহাসের উপকরণ রহিয়াছে। রসিকের তিরোভাব হয় ১৫৭৪ শকাব্দ

৬ 'পাঠান বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলি খাঁ'—প্রবন্ধ সংগ্রহ, প্রমথ চৌধুরী ১ম খণ্ড বিশ্বভারতী প্রকাশিত।

অর্থাৎ ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে। ইহার কিছুকাল পরেই 'রসিকমঙ্গল' রচিত হওয়া সম্ভব। কবি গোপীজনবল্লভ হিজলী, ঘাটশিলা প্রভৃতি স্থানের ভূঞা রাজার বিবরণের সহিত মেদিনীপুরের তদানীন্তন প্রতাপশালী শাসনকর্তা আহম্মদী বেগের অত্যাচারের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

আহম্মদ বেগ বড় দুষ্ট সে যবন॥
উড়িষ্যা দেশেতে যত ভূঞা রাজা বৈসে।
সবাকার ঘরদ্বার ভাঙ্গিল বিশেষে॥

কবির জন্মস্থান ছিল মেদিনীপুর জেলার ধারন্দা গ্রামে। রসিকের নাগপুর যাত্রা পথে এক অত্যাচারী কোল অধিপতির উল্লেখও তিনি করিয়াছেন। এই সকল জীবনী-কাব্যের মধ্যে সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-জীবনের কিছু কিছু পরিচয় ইতস্ততঃ পাওয়া গেলেও এযাবৎ কবিদের দৃষ্টি লোকোত্তর চরিত্রের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। পরবর্তী যুগের আলোচনায় আমরা দেখি যে, লোকোত্তর চরিত্রের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে লৌকিক চরিত্র। লৌকিক ঘটনাবলীও কবির বর্ণনীয় হওয়ায় সমসাময়িক রাষ্ট্র এবং সমাজের কথাও অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আকারে পাওয়া যাইতেছে।

কবির আত্মকাহিনী

কবির সংক্ষিপ্ত আত্মকথা সর্ব প্রথম পাওয়া যায় কির্ত্তিবাসের রামায়ণে এবং মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে এবং পরবর্তীকালে বৈষ্ণব-জীবনী কাব্যগুলির মধ্যে ভক্ত কবিদের আত্মকথার অনুপ্রবেশনে। চৈতন্য-ভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস নিজের কোন লৌকিক পরিচয় না রাখিলেও নানাপ্রসঙ্গে সমসাময়িক রাষ্ট্র ও সমাজের উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস এবং তাঁহার পরবর্তী জীবনীকারগণ সকলেই স্বল্পবিস্তর স্বীয় বংশ পরিচয় এবং গুরুর উল্লেখ করিয়াছেন। জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল কাব্যে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের কথাও ব্যক্ত করিয়াছেন। আরো পরবর্তীকালের কবি গোপীজনবল্লভ তাঁহার রসিকমঙ্গল কাব্যে স্বীয় বংশপরিচয় প্রদানকালে পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে অনেক সংবাদ প্রদান করিয়াছেন।

বৈষ্ণবজীবনী আশ্রিত এইরূপ স্বল্প বিবৃত কবি-কাহিনী কিন্তু বাংলা সাহিত্যের অপর একশ্রেণীর কাব্যের মধ্যে পূর্ণতর প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্যের কবিগণ এই আত্মকাহিনী বর্ণনায় আরো কিছুটা অগ্রসর হইয়াছিলেন। শুধু বংশাবলীর বর্ণনা নহে, প্রসঙ্গক্রমে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, সামাজিক প্রতিচ্ছবি, অর্থনৈতিক কাঠামো এবং জনগণের জীবনযাত্রার নির্ভরযোগ্য পরিচয়ও তাঁহারা প্রদান করিয়াছেন।

তাঁহাদের বন্দনীয় দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কাহিনীর মধ্যে না হইলেও এই আত্মজীবনী অংশে সমসাময়িক ইতিহাসের বহু তথ্যই প্রোথিত আছে। অবশ্য সকল মঙ্গলকাব্য রচয়িতাই সমানভাবে সমাজ-সচেতন ছিলেন না কিন্তু সাধারণভাবে মধ্যযুগের একাধিক প্রতিনিধিস্থানীয় কবির আত্ম-জীবনীর মধ্যে ইহার সন্ধান পাওয়া যায়।

মুকুন্দরাম

চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরামের আত্মকাহিনী হইতে পাঠান রাজত্বের অবসানকালে জায়গীরদারদের পরস্পরের অধিকার লইয়া বিবাদ, দরিদ্র প্রজার উপর অত্যাচার, বলপূর্বক জমিজমা দখল, খাজনা বৃদ্ধি, প্রভৃতি নানাবিধ অত্যাচারের এক বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। পাঠান রাজা দাউদ খাঁ কররাণীর অধীনস্থ শিকদারের অত্যাচার কবির মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। এই অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য কবি সপরিবারে দেশত্যাগী হন। কিন্তু এই পতনোন্মুখ পাঠান রাজত্বকালে শিকদারের যে নির্যাতন, কবি তাহা প্রজারই পাপের ফল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কবির এই বিশ্বাসের মধ্যে বাঙালীর সেই পুরাতন ভাগ্যনির্ভরতাই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য কবির বিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, তাঁহার বর্ণনা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত এবং ইতিহাসাশ্রিত। অত্যাচারিত প্রজার দুরবস্থার কবি অতি নিখুঁত চিত্রই অঙ্কন করিয়াছেন। ষোড়শ শতকী রাজনৈতিক উপপ্লবের ইহা এক মূল্যবান উপকরণ। মুকুন্দরাম প্রসঙ্গক্রমে আর একটি সমসাময়িক ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান রাখিয়া গিয়াছেন জলপথে যাত্রাকালে 'হার্মাদে'র উল্লেখে।

মনসামঙ্গলের কবি-কাহিনী

'মনসামঙ্গলের' কবি ক্ষেমানন্দও মুকুন্দরামের ন্যায় আত্মকাহিনী অংশে কিছু ঐতিহাসিক উপকরণ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। বিপ্রদাস তাঁহার মনসাপাঁচালীর প্রারম্ভে নৃপতিতিলক হোসেন শাহের উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্মমঙ্গলের অন্যতম রচয়িতা রূপরাম তাঁহার দুঃখাকীর্ণ জীবনের বর্ণনায় গৃহত্যাগ করিয়া বহু পথ ভ্রমণান্তে অবশেষে এড়াল-বাহাদুরপুরে গোপভূমের ব্রাহ্মণ রাজা গণেশের আশ্রয় লাভের কথা লিখিয়াছেন। ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, দিনাজপুরের একজন প্রতাপশালী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদারের নাম ছিল গণেশ। মালদহ জেলার পূর্বদিকে ভাতুরিয়া পরগণাতে তাঁহার জমিদারী ছিল।'

> The most powerful of these nobles at the close of Ghiyas-ud-din Ajam Shah's reign was Ganesh, a baron of Dinajpur who had an independent and hereditary source of strength in his large ancestral estate and personal contingent of troops not in the Sultans pay.
>
> Tne History of Bengal (D. U.) Vol II. p 126

ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধেও মতানৈক্য আছে। কাহারও মতে ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কবিকল্পনার ইহার কোন কোন অংশ পল্লবিত হইয়াছে। ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, দেবপাল কামরূপ ও উৎকল জয় করেন। ভাগলপুরের তাম্রশাসনে আছে যে এই উৎকল ও কামরূপ বিজয়ে তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা জয়পাল সৈনাপত্য করেন। ধর্মমঙ্গলকাব্যেও অনুরূপভাবে ধর্মপালপুত্রের কামরূপ বিজয়ে সামন্তরাজের পুত্র লাউসেনের সহায়তা করার কথা আছে। কিন্তু ইতিহাসে লাউসেনের কোন উল্লেখ নাই।

ধর্মমঙ্গলের ঐতিহাসিকত্ব

বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব গ্রন্থ ছাড়া ঐতিহাসিক ঘটনার ইঙ্গিত যাহা প্রথম পাওয়া গিয়াছে তাহা গৌণত ত্রিপুরা লইয়াই। প্রাচীন ভারত-পাঁচালী-কাব্য রচয়িতা পরমেশ্বর দাস কাব্যে তাঁহার পোষ্টা পরাগল খাঁ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে সুলতান হোসেনশাহ তাঁহাকে মূল্যবান খেলাত দান করিয়া চাটিগ্রামের লস্কর অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করিয়া কাছাড়-ত্রিপুরা অভিযানে প্রেরণ করেন।

পরাগল খাঁ

নৃপতি হোসেন শাহা গৌড়ের ঈশ্বর…
তান এক সেনাপতি…
লস্কর পরাগল-খান মহামতি
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি।
লস্করি বিষয় পাই আইলন্ত চলিয়া,
চাটিগ্রামে চলি আইল [হরষিত হইয়া।]

পরাগল খাঁর পুত্রও হোসেন শাহের সেনাপতি হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ত্রিপুরা অভিযানে সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহার নাম ছিল নসরৎখাঁ। পিতার জীবৎকালে ইনি ছুটী খাঁ নামে সুপরিচিত ছিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও নিজের সভাকবি শ্রীকর নন্দীকে দিয়া মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্ব কাহিনীর অনুবাদ করান। শ্রীকর নন্দী কাব্যের আরম্ভে সংক্ষেপে সুলতান হোসেন শাহের সুশাসনের উল্লেখ করিয়া স্বীয় পোষ্টা ছুটী খাঁর বিক্রমে ত্রিপুর-নৃপতির পর্বতগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণের উল্লেখ করিয়া তাঁহার জয়গান করিয়াছেন।

ছুটী খাঁ

নৃপতি হোসেন শাহা হয় ক্ষিতিপতি
সাম-দান-দণ্ড-ভেদে পালে বসুমতী।
তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটি-খান
ত্রিপুরা-গড়েতে গিয়া কৈল সন্নিধান।

লস্কর পরাগল-খানের তনয়
সমরে নির্ভয় ছুটি খান মহাশয়।
•• ত্রিপুর নৃপতি যার ভয়ে এড়ে দেশ
পর্ব্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥
যদ্যপি অভয় দিল খান মহামতি
তথাপি আতঙ্কে থাকে ত্রিপুর-নৃপতি॥

ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, হোসেন শাহের সিংহাসনারোহণের পূর্ব হইতেই ত্রিপুরার সহিত গৌড়ের যুদ্ধবিগ্রহাদি চলিতেছিল, হোসেন শাহের রাজ্যকালে গৌড়েশ্বর কর্তৃক ত্রিপুরার কিয়দংশ অধিকারের ঠিক তারিখ নির্ণয় করা না গেলেও ইহা যে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দের পরে নহে, 'সোনারগাঁও' লিপি হইতে তাহা জানা যায়।[৮] যতদূর জানা যায় দ্বিতীয়বার গৌড়াই মল্লিক, তৃতীয়বার হেতায়েন খাঁ (Hatain Khan) এবং চতুর্থবার সম্ভবতঃ স্বয়ং হোসেন শাহ ত্রিপুর আক্রমণ করেন এবং পূর্ববর্তীগণ অপেক্ষা বেশি সাফল্য অর্জন করেন।[৯] রাজমালায় আছে যে, ধর্মমাণিক্যের পুত্র ধন্যমাণিক্য (রাজ্যকাল ১৪১২-১৮ শক) সুলতান হোসেন শাহের সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া তিনবার চাটিগ্রাম অধিকার করেন—তন্মধ্যে প্রথম যুদ্ধ হয় ১৪৩৫ শক অর্থাৎ ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে।[১০] কিন্তু পূর্বোক্ত সোনারগাঁও লিপি হইতে জানা যায় যে, এই যুদ্ধের পর ত্রিপুরার কিয়দংশ হোসেন শাহের জনৈক কর্মচারীর শাসনাধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১১] রাজমালার বর্ণনানুযায়ী (পৃ ৫৪৫-৪৬) হোসেন শাহ ত্রিপুরার সহিত গৌড়ের সংঘর্ষকালে সুযোগ বুঝিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া লন।

ত্রিপুর-বিজয়কথা

বড়খাঁ গাজী পীরের মাহাত্ম্যসূচক একটি ছড়ায় নবাব শায়েস্তা খাঁর উল্লেখ আছে। গাজী পীরের কাহিনীর মধ্যে এইরূপ ঘটনাল্লেখ কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিকার কাজ করিয়াছে। ছড়াটি 'মদনের গান' বা মদনপালা বলিয়া বর্ণিত। পুথি খণ্ডিত এবং রচয়িতার নামহীন।[১২] 'শ্রীশ্রীখোদায়' বলিয়া শুরু দেখিয়া রচয়িতা মুসলমান বলিয়া মনে হয়। পুথির কাহিনী রচয়িতা নবাবের নিকট খাজনার দায়ে অভিযুক্ত

মদন পালা

৮ The History of Bengal (D. U.) vol II p 149
৯ ঐ
১০ প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫৪
১১ J. A. S. B 1872
১২ প ৯৩৪

মেদনমল্ল (অধুনাতন চব্বিশ পরগণার) জমিদারের বড়খাঁ গাজী পীরের কৃপায় উদ্ধারের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে নবাব শায়েস্তা খাঁ কি ভাবে জমিদারদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতেন এবং খাজনা বাকী পড়িলে কিরূপ শাস্তির ব্যবস্থা হইত তাহার বিবরণও ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। ছড়াটিতে নবাব শায়েস্তা খাঁর চিত্র অতি কঠোর। প্রারম্ভে শায়েস্তা খাঁর ঢাকায় আগমন এবং জমিদারদের আহ্বানের বিবরণ রহিয়াছে—

নবাব শায়েস্তা খাঁ

নবাব শায়িস্তে খাঁ এসেচে ঢাকায়।
খায়োক্বমে জমিদার সব মাঙ্গাইল॥
ঢাকা কোটে নবাব বসে নাম সায়িস্তি খাঁ।
ইনসাব আদালত নবাব কিছু করে না॥
জমিদার মাঙাএ নবাব আনে যেই ঘড়ি
তজবিজ তঙ্কা খাই নাই তার পায়ে লাগাযে বেড়ি॥"

খাজনা বাকী থাকিলে নবাব বিচারের পরিবর্তে জমিদারদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন।

কারে কারে ইটের উপরে করে রেখেছে খাড়া।
চাবুকের চোটে কার পোস্ত দিচ্ছে নাড়াচাড়া॥
কারু কারু ফেলে রেখেছে সিংহমাছের গড়ি।
পিষ্ট [কারু] তুলে মারে জোড়া বেতের বাড়ি॥

শাস্তির বিধিবিধান কত প্রকারের—

তামাক খেযে গুল কারু ছাপ ধচ্চে গায়।
লঙ্কা মরিচের ধোঙা কারো নাকে দেয়॥
সাঁড়াসি লাগাএ কারে টানে নাক কান।
কেউ বলে·· আমার চেরাকি কড়ি আন। ইত্যাদি।

নবাব শায়েস্তা খাঁ ঢাকায় 'ইনসাব আদালত' কিছু না করিলেও তাঁহার নির্দ্দেশে কর্মচারিগণ জমিদারদের নিকট হইতে নানাপ্রকারে অর্থ আদায়ে বিশেষ তৎপর হইয়া উঠে। সমসাময়িক ইংরেজ বণিক (William Hedges তাঁহার Diaryতে ঢাকায় শায়েস্তা খাঁর যে পরিচয় লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহার সহিত এই ছড়াটির অনেক সাদৃশ্য আছে।[১৩]

---

১৩ "We get from this source a picture of Shaista Khan's life in Dacca in an almost royal style of luxury and splendour. He also sent from time to

সপ্তদশ শতকের আর একজন কবির রচনায় ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের অত্যাচারের এক প্রত্যক্ষ বর্ণনা আছে। ইনি রোসাঙ্গ রাজসভার বিখ্যাত কবি এবং 'পদ্মাবতী' কাব্যের রচয়িতা আলাওল। কবি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এই হার্মাদের আক্রমণের এবং তাহাদের হাতে পিতার প্রাণত্যাগের কথা লিখিয়াছেন। কাব্যের উপক্রমে কবি স্বীয় আবাসভূমির ও বংশ-পরিচয়ের একটি সুন্দর চিত্রও অঙ্কন করিয়াছেন—

আলাওল রচিত পদ্মাবতী কাব্য

গ্রাম মধ্যে প্রধান ফতেয়াবাদভূম।
বৈসে সদা সাধুলোক হর্ষ মনোরম॥
অনেক দানেশ মন্দ খলিফা সুজান।
বহুত আলেম গুরু আছে সেই স্থান॥
হিন্দুকুলে মহাভাগ আছে ভট্টাচার্য্য।
ভাগীরথী গঙ্গাধার বহে মধ্যে রাজ্য॥
বাজ্যেশ্বর মজলিস কুতুব মহাশয়।
আমি ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্য তনয়॥
কার্য্যহেতু পন্থক্রমে আছে কর্ম্মলেখা।
দুষ্ট হার্মাদ সঙ্গে হই গেল দেখা॥
বহু যুদ্ধ করি শহীদ হৈল তাতে।
রণক্ষেত্রে শুভযোগে আইলাম প্রাতে॥
কহিতে অনেক কথা দুঃখ আপনাব।
রোসাঙ্গে আসিয়া হৈলুম রাজ-আসোয়ার॥

আরাকানে আসিয়া ঘোড়সওযাব হইলেও আলাওলের কবিপ্রতিভা বেশীদিন চাপা থাকে নাই। আরাকানরাজ চান্দেহু অর্থাৎ অদো-মিনতারের (রাজ্যকাল ১৬৪৫-৫২) কন্যার প্রধান ওমরাহ মাগনঠাকুর

time very costly presents to his master the Emperor. In February 1682, Shaista Khan promised to pay five lakhs annually as the tribute of Bengal as long as the Emperor was out on his deccan expedition. We Know that this annual aid continued till 1685 and probably later...such extravagance could be maintained only by squeezing the people."

The History of Bengal (D. U.) Vol II p 373

সেনাপতি'। এই রাস্তি খাঁ সুলতান রুকনউদ্দিন বারবকশাহের রাজত্বকালে ১৪৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চট্টগ্রামে একটি মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।[১৫] রাস্তি খাঁর পুত্র গাভুর খাঁ পরম বলশালী—'যার কীর্তি গৌড়দেশভরি' এবং যিনি করিয়া বিষম রণ, জিনিলা ত্রিপুরাগণ, হেলায় পাঠানগণ জিনি।' শ্রীযুক্তদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সমসাময়িক পর্তুগীজ বিবরণী আলোচনান্তে লিখিয়াছেন যে,—কবি বর্ণিত গাভুর খাঁর পাঠান-পরাভববার্তা ও পর্তুগীজ বর্ণিত খোদা বকস্ খাঁর প্রতিবেশীর সহিত সংঘর্ষ ("Feud with a neighbouring chief"—ঐ পৃঃ ৩১) একই ঘটনা বলিয়া মনে হয়।"[১৬]

গাভুর খাঁর দ্বিতীয় বিজয়লেখ ত্রিপুরা সম্বন্ধে। রাজমালার বর্ণনানুযায়ী রাজা ধন্যমাণিক্যের রাজ্যকালে সুলতান হোসেন শাহের সৈন্যদল তিনবারই শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।[১৭] এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন—ধন্যমাণিক্যের ১৪৩৫ শকাব্দের "চাটিগ্রামজয়ি" রজত মুদ্রার আবিষ্কার দ্বারা রাজমালার উক্তির যাথার্থ প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং গাভুর খাঁ নসরতশাহের সময়ে (১৫১৯-২৫ সন) বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া ধরা যায় এবং ত্রিপুররাজের সহিত সংঘর্ষকালে গাভুর খাঁর পিতৃব্য-পুত্র ছুটী খাঁ সেনাপতি ছিলেন।[১৮] চট্টগ্রামের মুসলমানী ইতিহাসেও পাওয়া গিয়াছে যে নসরত শাহই সর্বপ্রথম মগদের নিকট হইতে চট্টগ্রাম অধিকার করেন।[১৯] প্রাচীন রাজমালায় ধন্যমাণিক্য-পুত্র রাজা দেবমাণিক্যের প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে,—

চাটীগ্রাম থানা রাখি আসিলেক দেষ।
জত রার্ষ্যি পিতৃসত্ত আছিলেক পুনি।
সকল সাসিল যুখে সেই নৃপ মণি॥

তাহা হইলে কি দেবমাণিক্য গাভুর খাঁ-বিজিত চাটিগ্রাম পুনরায় উদ্ধার করিয়াছিলেন?

মহম্মদ খাঁর রচনায় গাভুর খাঁর বিদ্যোৎসাহেরও উল্লেখ আছে।

---

১৫ বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২য় ভাগ
১৬ 'চাটিগ্রামে পাঠান ও মগ রাজত্ব'—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সা-প-প ১৩৫৪
১৭ রাজমালা, দ্বিতীয় লহর
১৮ সা-প-প, ১৩৫৪ সন
১৯ J. A. S. B. 1872.

প্রসঙ্গক্রমে কবি হামজা খাঁর (গাভুর খাঁর পুত্র ?) পুত্র এক নসরত খাঁর পরাক্রমের বর্ণনা দিয়াছেন। এই বর্ণনা কবির রচনার প্রসাদগুণের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। নসরত খাঁর পুত্র জলাল খাঁর বৃত্তান্তও অনুরূপ রচনা গুণের নিদর্শন। এই নসরত খাঁ হোসেনশাহ পুত্র নসরতশাহ নহেন। কবি স্বীয় প্রমাতামহ ছদর্জাহা উপাধিধারী সাহা আবদুল ওহাব-এর পরিচয় দানসূত্রে লিখিয়াছেন যে, চাটিগ্রামপতি নসরত খাঁ তাঁহাকে কন্যাদান করেন। বিবরণটি এস্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে,—

গৌড়ধাম অধিপতি যাঁকে প্রশংসিলা।
ভিক্ষুক জনের প্রতি যাঁহাকে বলিলা॥
চাটিগ্রামপতি জান নসরত খান।
আপনার প্রিয় সুতা দিল যার স্থান॥
বার বাঙ্গালার পতি ইছা খান বীর।
দক্ষিণ কুলের রাজা আদম সুধীর॥
স্নেহভাবে যাঁহাকে পূজন্ত নিতি নিতি।
যাঁহাকে প্রশংসা কৈলা মগধের পতি॥

ইতিহাস হইতে জানা যায়, সোনার-গাঁর পাঠান সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ সর্বপ্রথম চাটিগ্রাম জয় করেন। এস্থলে ইশা খাঁর সমসাময়িক উক্ত পণ্ডিতবরের উল্লেখ হইতে কেহ কেহ তাঁহার শ্বশুর নসরত খাঁর শাসনকাল ষোড়শ শতকের তৃতীয় পাদে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[২০] প্রাচীন রাজমালা হইতে পাওয়া যায় যে, বিদ্রোহী মগসামন্ত 'আদম পাদসাহকে' মগরাজের নিকট প্রত্যর্পণে অস্বীকৃত হওয়ায় মগরাজা সেকেন্দার শাহ ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে অমরমাণিক্যকে পরাজিত করিয়া উদয়পুর অধিকার করেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য আরাকানের ইতিহাস হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন যে, এই ত্রিপুর-মগ যুদ্ধে "চাইতাগঙের উজী (র) জলাল" ম্রুঙ্-রাজার (ত্রিপুররাজের) পক্ষ অবলম্বন করেন এবং তাঁহার পরাজয় ঘটিলে ভয়ে প্রাণত্যাগ করেন।[২১] কবির বর্ণনা অনুযায়ী জলাল খাঁর পুত্র 'বিরাহিম খান' তাঁহার কাব্য রচনা কালে (১৬৪৬ খৃঃ) জীবিত ছিলেন।

লয়লা-মজনুর ন্যায় রোমান্টিক কাব্যের রচয়িতা কবি বহরামের কাব্যের মধ্যে যে ঐতিহাসিক তথ্য রহিয়াছে এই প্রসঙ্গে তাহাও স্মরণ করা যাইতে পারে। কবির পিতা মোবারক খাঁ চাটিগাঁয়ের নৃপতি 'নেজাম

বহরামের লয়লা-মজনু

---

২০ সা-প-প ১৩৫৪ সন
২১ ঐ

শাহের' দৌলত উজীর ছিলেন। পরে পুত্রও সেই পদলাভ করেন। কবির গুরু পীর আছুওদ্দীন পূর্বোল্লিখিত 'মুক্তলহোছেন' কাব্য রচয়িতা মহম্মদ খাঁর প্রমাতামহ ছদর্জাহার নাকি প্রপৌত্র ছিলেন।[২২] বর্ণনানুযায়ী কাব্যের রচনাকালে দিল্লীশ্বর 'আওরঙ্গসাহা' এবং চাটিগ্রাম অধিপতি ছিলেন 'ধবল অরুণ গজেশ্বর' নেজামশাহা। এই নেজাম শাহা শায়েস্তা খাঁ পরবর্তী শাসক (১৭৫৭-৫৩ খৃঃ) মহম্মদ নিজামুদ্দীনের সহিত অভিন্ন নহেন। তিনি চাটিগ্রামের মোগলপূববর্তী কোন পাঠান শাসক হইতে পাবেন।[২৩]

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে প্রাসঙ্গিক উক্তি হিসাবে যে কিছু ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায় এতক্ষণ আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে আমাদের আলোচ্য সময়ের পূর্ববর্তীকালে রচিত ইতিহাসাশ্রিত কাব্য প্রাচীন রাজমালা এবং চম্পকবিজয়ের পর্যালোচনা করিতেছি। ত্রিপুর রাজবংশের ইতিহাসাশ্রিত কাব্যগ্রন্থ রাজমালার সকল অংশ সমভাবে প্রাচীন নহে, কারণ মহারাজ কাশীচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্ব-কালে (১৮২৬-৩০ খৃঃ) দুর্গামণি উজীর সমগ্র রাজমালা সংশোধন করিয়া (অংশবিশেষ বর্জন এবং সংক্ষেপনে) প্রকাশ করেন। এই সংশোধনের স্বীকৃতি দুর্গামণি স্বয়ং রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার রাজমালায়—

অষ্টাদশ শতকের পঞ্চমদশক পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক কাব্য

পুরাতন রাজমালা আছিল রচিত।
প্রসঙ্গেত অলগ্নিক ভাষা যে কুৎসিৎ॥
পূর্ব্ব প্রসঙ্গ পবে পর পূর্ব্বে কত।
সেইত কারণে লোকে নাহি বুঝে তত॥

* * *

বারশ আটত্রিশ সন ত্রিপুরা যখনি।
তাহাকে সুধিল পুনি উজির দুর্গামণি॥

রাজমালার এই অপ্রকাশিত মুদ্রিত সংস্কারণটি ১৩১১ ত্রিপুরাব্দে ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত হয়।[২৪] এই সংস্করণে কোনরূপ টীকাটিপ্পনী

---

২২ "শায়েস্তা খাঁর বিজয়ের পর চাটিগ্রামে যে শাসনপ্রণালী নূতন প্রবর্তিত হয়, তন্মধ্যে উজীর কিম্বা নায়েব-উজীরের পদ নাই। উজীর-পদাধিকারী সকলেই সুতরাং ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী।"— সা-প-প ১৩৫৪ সন

২৩ ঐ

২৪ রাজমালা, অপ্রকাশিত মুদ্রিত সংস্করণ

এবং ভূমিকা নাই, শুধু কাব্যটির মুদ্রণ করা হইয়াছে। ইহা অধুনা একেবারে দুষ্প্রাপ্য। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের সৌজন্যে আমি ইহা পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। কালীপ্রসন্ন সেন কর্তৃক সম্পাদিত রাজমালার যে তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে তাহার শেষ খণ্ডের সীমাকাল কল্যাণমাণিক্যের রাজত্বকাল পর্যন্ত। ইহার পরবর্তী রাজাদিগের সময়ের বিবরণ সম্বলিত রাজমালার সম্পাদনকার্য তিনি সম্পূর্ণ করেন নাই। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সংগৃহীত অপ্রকাশিত মুদ্রিত রাজমালার সহিত কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত রাজমালার সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয় যে, উভয় সংস্করণই দুর্গামণি উজীর সংশোধিত রাজমালার কোন পুথি অবলম্বনে প্রস্তুত এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের পরবর্তী কালের রচনা। দুর্গামণি যে 'পুরাতন রাজমালার' উল্লেখ করিয়াছেন বর্তমানে তাহা অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে রাজমালার একটি পুথি[২৫] (পত্রসংখ্যা ১-৪১,৪৩-৬৫) আছে। পুথিতে শুধু লিপিকরের নাম আছে-"শ্রীরামনারায়ণ দেব।" (৪৯।৫৫ পৃঃ) পুথির লিপিকালেরও কোন উল্লেখ নাই। ত্রিপুরাধিপতি দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের রাজ্যচ্যুতি এবং নরেন্দ্রমাণিক্যের বিদ্রোহকাহিনী সম্বলিত 'চম্পকবিজয়' নামক কাব্যগ্রন্থের একটি পুথির লিপিকরের উল্লেখ এইভাবে পাওয়া গিয়াছে—"পুস্তক শ্রীরামজয়ঠাকুর স্বাক্ষর শ্রীরামনারায়ণ দেব সন ১২০৬ তারিখ ১৮ই বৈশাখ।" রাজমালার আলোচ্য পুথিটির লিপিকর এবং এই রামনারায়ণ দেব এক ব্যক্তি হইলে রাজমালার পুথির লিপিকাল ঐ সময়ের কাছাকাছি বলিয়া অনুমান করা যায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে রক্ষিত রাজমালার পুথিটি চতুর্থ খণ্ডে সমাপ্ত। শেষ খণ্ডটি অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের অনুরোধে জয়দেব উজীর বিশ্বাসনারায়ণকে দিয়া লেখান। ইহার পূর্ববর্তী খণ্ড সমূহের মধ্যে প্রথম খণ্ড যথাক্রমে রাজা ধর্মমাণিক্যের সময়ে (১৪৭০-৮০ খৃঃ) দ্বিতীয় খণ্ড রাজা অমরমাণিক্যের সময়ে (১৫৭৭-৮৬ খৃঃ) এবং তৃতীয় খণ্ড রাজা গোবিন্দমাণিক্যের (১৬৭০-৭৩ খৃঃ) সময়ে ১৫৯১ শকে অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে রচিত হইয়াছিল। ত্রিপুরার রাজপরিবারের ইতিহাসসূচক এই পূর্বপুরুষ কাহিনী বিভিন্ন রাজার অনুরোধে তাঁহাদের সভাপণ্ডিতগণ লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু

২৫ প ২২৫৯

অধিকাংশ খণ্ডেরই প্রকৃত রচয়িতার কোন পরিচয় নাই। প্রথম খণ্ডের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, রাজা ধর্মমাণিক্য একদিন রাজসভায় অবস্থানকালে স্বীয় বংশের কথা স্মরণ করিয়া সভাসদ ব্রাহ্মণকুমার শুক্রেশ্বর বাণেশ্বর এবং রাজকুল-পুরোহিত চোন্তাই প্রধান দুর্লভেন্দ্র—

এ তিনেতে জিজ্ঞাসা করিল গুণমনি।
আমার বংশের কথা কহ কিছু শুনি॥
তন্ত্র প্রমাণ করিয়া তিন জন।
রাজাতে কহিল তান বংশের কথন॥

এখানে তিনজনই বক্তা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তাহা হইলে প্রকৃত রচযিতা কে? দুর্লভেন্দ্র চোন্তাই সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

আর দুর্ব্বভেন্দ্র নাম চোন্তাই প্রধান।
রাজবংশ কথাতে বড়ই সাবধান।

এই দুর্লভেন্দ্রই কি ধর্মমাণিক্যের পূর্বপুরুষ-কাহিনীর বক্তা এবং অপর দুইজন সভাপণ্ডিত বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর কাহিনীর রচয়িতা? সেনাপতি রণচতুরনারাযণ রাজা অমরমাণিক্যের রাজসভায় দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনী বিবৃত করিলেও এই অংশেরও বচযিতার নাম পাওযা যায় না। রাজমালার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেনও ইহা লক্ষ্য করিযা লিখিয়াছিলেন—সেনাপতি বিবরণ কহিলেন, একথা পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এই লহরেব রচয়িতা কে তাহা পাওযা যায় না। সেনাপতি স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন রাজমালার উক্তি দ্বারা এরূপ বুঝা যায় না। শতাধিক বৎসর বযস্ক স্থবির সৈনিক বিভাগের কর্মচারী দ্বারা গ্রন্থ রচিত হওয়া সম্ভাব্যও নহে। রণচতুরের বর্ণনানুসারে নিশ্চযই কোন সভাপণ্ডিত কর্তৃক রাজমালার এই অংশ রচিত হইয়াছিল॥[২৬] তাঁহার এই অনুমান যথার্থ বলিয়া মনে হয। আবার তৃতীয় খণ্ডের শুধু রচয়িতা নহে, রচনাকাল সম্পর্কেও মতভেদ আছে। উজির দুর্গামণি সংশোধিত রাজমালা হইতে জানা যায যে, তৃতীয় খণ্ড রাজা রামমাণিক্যের সময়ে দ্বারপণ্ডিত সিদ্ধান্তবাগীশ কর্তৃক কথিত হয়।[২৭]

সিদ্ধান্তবাগীশ কহে কর অবধান।
যাহা দেখি শুনিয়াছি বলিব আখ্যান॥

রাজমালার প্রাচীন পুথি

কিন্তু প্রাচীন রাজমালা হইতে জানা যায়, তৃতীয়খণ্ড রাজা গোবিন্দমাণিক্যেব সময় লিখিত হয়।

গোবিন্দমাণিক্য রাজা পুস্তক লিখাইয়া।
মন্ত্রিএ কহিল তাহা শুনিল চিত্ত দিয়া॥

২৬ রাজমালা, দ্বিতীয় লহর
২৭ রাজমালা, অপ্রকাশিত মুদ্রিত সংস্করণ

এস্থলে মন্ত্রিবরের কোন নামোল্লেখ না থাকিলেও ইহা যে গোবিন্দ-মাণিক্যের রাজত্বকালে রচিত হয় সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। তদ্ব্যতীত প্রাচীন রাজমালা হইতে আরো জানা যায় যে, পূর্ববর্ত্তী রাজা কল্যাণমাণিক্য তুলাপুরুষ দান উপলক্ষে দ্বারপণ্ডিত সিদ্ধান্তবাগীশকে প্রচুর দানাদি দ্বারা সম্মানিত করেন। এই বিবরণ সিদ্ধান্তবাগীশের স্বরচিত না হওয়াই স্বাভাবিক। প্রাচীন রাজমালার মধ্যে একমাত্র চতুর্থ খণ্ড—যাহা কৃষ্ণমাণিক্যের অনুরোধে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে রচিত হয়, তাহার রচয়িতার নামই সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।

উজীরে কহেন রাজা করি নিবেদন।
গোবিন্দমাণিক্য ছিল ধর্ম্মপরায়ণ॥
জযধ্যা বিবরণ পূর্ব্বের লিখন।
তারপরে লিখাইব সার বিবরণ॥
বৃদ্ধেত আছয়ে যে বিশ্বাসনারায়ণ।
বিদ্বান্ হএ জানে আইদ্দ বিবরণ॥
রাজ আজ্ঞা হলেক ডাকে মন্ত্রিবর।

*　　*　　*

রাজ আজ্ঞা মন্ত্রি আজ্ঞা সিবেত বান্ধিয়া।
লিখীতেক বিবরণ দড় চিত্ত হৈয়া॥

এই প্রাচীন রাজমালা হইতেই বুঝা যায় যে, দুর্গামণির সংশোধনের ফলে বহু প্রয়োজনীয় অংশ এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রাজমালার প্রকাশিত সংস্করণ হইতে বাদ গিয়াছে। প্রাচীন রাজমালা অনুযায়ী রাজমালার প্রথম খণ্ডের নাম 'দত্যখণ্ড' এবং দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'দুর্জয খণ্ড।'

এত জদি রণচতুরনারাযণ কৈল।
অমরমাণিক্য রাজা সন্তোষ হইল॥
পূর্ব্ব ২ নৃপতির বুলিলেক কথা।
"দত্যখণ্ড" পুথি তবে করিলেক গাথা॥
"দুর্যখণ্ড" বলিয়া পুস্তক নাম রাখে।
শ্রীধর্ম্মমাণিক্য হতে রাজা তাতে লিখে॥
সেই পুস্তক পরে গোবিন্দদেবে পাইল।
তাহার পরে রাজা পুস্তক গাঁথিল।
ইতি দুর্যখণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ডের এই নামকরণ এবং গোবিন্দমাণিক্য কর্তৃক গ্রন্থপ্রাপ্তির কথা দুর্গামণি বর্জন করিয়াছেন এবং তাহার ফলে পরবর্তী অংশ বহু পরে রামমাণিক্যের সময় দ্বার পণ্ডিত কর্তৃক রচিত হইয়াছিল বলিয়া ভ্রান্ত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রাচীন রাজমালা অনুযায়ী গোবিন্দমাণিক্যই ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে পূর্বসূত্রে 'ইতি উত্তর দুর্ষ্যখণ্ডে কল্যাণমাণিক্য স্বর্গারোহণ' নামক পরবর্তী খণ্ডের যোজনা করাইয়াছিলেন। শুধু এইরূপ স্থানবিশেষ বর্জনই নহে, গ্রন্থমধ্যেও বহু পরিবর্তন করিয়াছেন দুর্গামণি। প্রাচীন রাজমালা হইতে জানা যায়, মহারাজ রামমাণিক্যের (রাজ্যকাল ১৬৭৩-৮৫ খৃঃ) ত্রয়োদশ পুত্র ছিল। দুর্গামণি এই উক্তি অগ্রাহ্য করিয়া লিখিয়াছেন যে তাঁহার অষ্টাদশ পুত্র ছিল এবং তাহাদের জ্যেষ্ঠ চন্দ্রসিংহনারায়ণকে সরাইলের জমিদার 'নাছির আলী' হত্যা করেন। কিন্তু প্রাচীন রাজমালার বিবরণ ভিন্নরূপ। নাছির মাহাম্মদই রাজকুমারকে হত্যা করেন, নাছির আলি (ইনি সরাইলের অন্য এক জমিদার ছিলেন এবং তাঁহার হিস্যা ছিল ।৵ আনা অংশ) নহেন।[২৮] প্রকৃতপক্ষে রামমাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দ্রসিংহনারায়ণের সহিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারিকাঠাকুরের বিরোধ ঘটে এবং এই বিরোধে সরাইলের দেওয়ান নাছির মাহাম্মদ দ্বারিকাঠাকুরের পক্ষাবলম্বন করিয়া চন্দ্রসিংহের হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। এই পারিবারিক বিদ্রোহ সম্বন্ধেই দুর্গামণি শুধু ভ্রান্ত অভিমত ও অযথা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন নাই, নাছির মাহাম্মদ রাজার করুণা উদ্রেক করিয়া ভূখণ্ড অর্জন করেন এবং 'নাছিরাবাদ' নামে এক প্রাসাদ নির্মাণ করেন বলিয়াও তিনি মন্তব্য করিয়াছেন।[২৯] কিন্তু প্রকৃত তথ্য যে অন্যরূপ তাহা শুধু প্রাচীন রাজমালা নহে, ত্রিপুরার অন্যতম নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থ "চম্পকবিজয়েও" তাহার প্রমাণ আছে। নরেন্দ্রমাণিক্যকে সাহায্য করার জন্য নাছির মাহাম্মদ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন এবং দ্বারিকা ঠাকুর রামমাণিক্যের রাজত্বের শেষভাগে নরেন্দ্রমাণিক্য নামে রাজসিংহাসন অধিকার করেন। রামমাণিক্য নবাবের সহায়তায় রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন এবং নরেন্দ্রমাণিক্য ঢাকায় কারারুদ্ধ হন। অবশ্য নরেন্দ্রমাণিক্য দ্বিতীয়বার (রত্নমাণিক্যের রাজত্ব কালে) সিংহাসন অধিকার করেন। রামমাণিক্যের বাকী পাঁচ পুত্রকেই তাঁহার শ্যালক যুবরাজ বলিভীম হত্যা করান এবং যে চারিজন জীবিত

দুর্গামণির রচনার ত্রুটি

---

২৮ 'সরাইল পরগণার ঐতিহাসিক বিবরণ' চুন্টা প্রকাশ, চৈত্র ১৩৪৫
২৯ ঐ

ছিলেন তাঁহাদের সর্বজ্যেষ্ঠ শ্রীধর পাঁচ বৎসর বয়সে রত্নমাণিক্য নামে সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠের নাম ছিল দুর্যোধন ঠাকুর। চম্পকবিজয়ে তিনি 'দুর্জয়সিংহনারায়ণ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এই দুর্জয়সিংহ ভ্রাতৃহন্তা রাজা মহেন্দ্রমাণিক্যের মৃত্যুর পর ধর্মমাণিক্য (দ্বিতীয়) নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অভিষেক মুদ্রার তারিখ এবং তৎপ্রদত্ত নিষ্কর ভূমিদানপত্র হইতে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হন বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।[৩০] রাজত্বের প্রথমদিকে তিনি মির্জা মুরাদ বেগ নামে একজন প্রবীণ সেনাপতির উপর মন্ত্রিত্ব অর্পণ করেন। এই মির্জা মুরাদ প্রথমে ভালভাবে রাজকার্য চালাইয়া শেষে কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হইলে প্রজাদের হস্তে প্রাণ হারান। প্রাচীন রাজমালার এই বিবরণ দুর্গামণি বর্জন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ধর্মমাণিক্যের সহিত ঢাকার নবাবের প্রথম সংঘর্ষের বিবরণও পরিত্যাগ করিয়া মোগলদের সহিত শেষ যুদ্ধে ধর্মমাণিক্যের পরাজয় কাহিনী লিপিবদ্ধ করিযাছেন। এই সংক্ষিপ্তকরণের ফলে ধর্মমাণিক্যের জ্ঞাতি জগতরাম যে দুইবার রাজা হইবার জন্য চেষ্টা করেন দুর্গামণির 'রাজমালা' পাঠে তাহা জানা যায় না। কিন্তু প্রাচীন রাজমালার সকল অংশ বর্তমানে অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া একরূপ অসম্ভব। বিশ্বাসনারায়ণ লিখিত চতুর্থ খণ্ডে সন্নিহিত তথ্যাদির পরবর্তী অংশসমূহের জন্য দুর্গামণি রচিত রাজমালার পূর্বোক্ত অপ্রকাশিত মুদ্রিত সংস্করণের উপব নির্ভর করা ভিন্ন উপায় নাই। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে 'কৃষ্ণমালা', 'চম্পক বিজয়', 'গাজিনামা' প্রভৃতি ইতিহাসাশ্রিত কাব্যের সহিত তুলনামূলক পাঠ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

রাজমালা ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিবৃত্ত নহে

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাজমালাকে ঠিক ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিবৃত্ত বলা সঙ্গত নহে, ইহা ত্রিপুর-রাজবংশেরই ক্রমেতিহাস। বংশানুক্রমে রাজাগণের রাজ্যলাভ, শাসনকার্য ও সমরকাহিনী প্রধানতঃ এই সুবৃহৎ মালাগ্রন্থের বিষয়বস্তু। অবশ্য ত্রিপুরার ইতিহাস না হইলেও ত্রিপুরবাসীর শৌর্য-বীর্যের পরিচয় ও অন্য নানা রাজনৈতিক তথ্য ইহার মধ্যে অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। প্রথম খণ্ডের ঐতিহাসিক গুরুত্ব নাই বলিলেও চলে— ত্রিপুর ইতিহাসের পৌরাণিক যুগই এই খণ্ডে প্রাধান্য পাইয়াছে। পরবর্তী দুই খণ্ডে প্রথম খণ্ডের ন্যায় রাজাগণের রাজ্যলাভ, রাজ্যচ্যুতি, যুদ্ধ,

৩০ শ্রীভারতী, চৈত্র ১৩৪৫

শাসন ও রাজপরিবার সংক্রান্ত ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে বটে কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড হইতেই রাজমালা প্রকৃতপক্ষে ত্রিপুর রাজবংশের ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। রাজমালার দ্বিতীয় খণ্ডেই দেখা যায় শক্তিশালী ত্রিপুর সেনাপতিগণের প্রাধান্যের সীমা ছিল না—এমন কি ত্রিপুরার রাজ-সিংহাসনের উপরও তাঁহারা অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ধর্মমাণিক্য সন্ন্যাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে এক ব্রাহ্মণের মুখে শুনিয়াছিলেন—

তোমা চারি ভাই আছে রণের মাঝার।
সেনাপতি নাহি দিছে রাজা করিবার॥
দশ সেনাপতি মধ্যে রাজা হতে চায়।
না মানে কাহাকে কেহ মনে ভয় পায়॥[৩১]

রাজা ধন্যমাণিক্য ত্রিপুর-রাজ্যে এই সৈনাপত্যপ্রাধান্যের প্রতিরোধ করেন কৌশলে এই সকল শক্তিশালী সেনাপতিদের হত্যা করাইয়া, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে সেনাপতিরা পুনরায় প্রবল হইয়া উঠেন। ধন্যমাণিক্যের পরবর্তী রাজা বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকালে প্রধান সেনাপতি দৈত্য-নারায়ণেরই ছিল সর্বময় কর্তৃত্ব। এমন কি দৈত্যনারায়ণের এক ভাই দুর্লভনারায়ণ এক স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করায় তাঁহার স্বামী রাজার নিকট অভিযোগ করিলে রাজা তাঁহার স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর স্বামী মাধবের নিকট এই বলিয়া দুঃখ করেন যে—

ত্রিপুরার সৈনাপত্য-প্রাধান্য

শুন শুন মাধব তুমি আমার বচন।
আমার নহে এরাজ্য দৈত্যনারায়ণ॥[৩২]

এই মাধবের সহায়তায়ই অবশ্য পরে তিনি দৈত্যনারায়ণ বধে কৃতকার্য হন। সেনাপতিদের এই অপ্রতিরোধ্য প্রাধান্যের এক কারণ হইল, রাজারা সেনাপতিদের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন এবং ইহার ফলে সেনাপতিগণ শাসন পরিচালনায়ও অপ্রত্যাশিত কর্তৃত্ব লাভ করিতেন।
ত্রিপুরেশ্বরগণ প্রধানতঃ শৈবমতাবলম্বী ছিলেন। শাক্তমতের প্রভাবও ধীরে ধীরে রাজপরিবারে লক্ষিত হয়। অমরমাণিক্যের পরে বৈষ্ণব যুবরাজ রাজধরমাণিক্যের রাজত্বকালে আবার বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

বিষ্ণুমন্ত্রেতে দীক্ষা ছিল মহারাজা।
পরম বৈষ্ণব সাধু না হিংসয়ে প্রজা॥
রাত্রি দিবা অষ্ট নিশি হরির কীর্ত্তন।
কীর্ত্তনিয়া আষ্টজন পাইছে বেত্তন॥[৩৩]

---

৩১ দুর্গামণি বিরচিত রাজমালা
৩২ ঐ

রাজমালার অনেকস্থলে বঙ্গদেশী সৈন্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সৈনিকগণ ত্রিপুর সৈন্যদল এবং পাঠান সৈন্যদলেও নিযুক্ত হইত। রাজমহিষীদের তেজস্বিতা ও বুদ্ধির কথনো কথনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মন্ত্রী গোপীপ্রসাদ—যিনি পরে উদয়মাণিক্য নাম ধারণ করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন, তাঁহার কন্যা পিতার অন্যায়ের যেভাবে বিরোধিতা করেন তাহা প্রশংসনীয়। ওদেশে সুরাসক্তি নারীদের মধ্যেও অপ্রতুল ছিল না। সুবর্ণ কুষ্মাণ্ডের বিনিময়েও মদ্যপানের কথা শোনা যায়। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের মহিষী সৈনিক রমণীদের মদ্যপান করাইয়া তাহাদের মত্ত অবস্থা দর্শনে নাকি আনন্দলাভ করিতেন। রাজমালার বিবরণ অনুযায়ী জানা যায়, সেই সময় এক আনা মূল্যে আট সের অর্থাৎ প্রতি পয়সায় দুই সের মদ্য পাওয়া যাইত।

চম্পকবিজয়

চম্পকবিজয়ের বর্ণনার সহিত ক্ষেত্রবিশেষে দুর্গামণি সংশোধিত রাজমালার বর্ণনার পার্থক্যের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। বিভিন্ন সময়ে রচিত এবং একত্র গ্রথিত রাজমালার সংশোধিত (?) সংস্করণ অপেক্ষা সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত 'চম্পকবিজয়' অধিকতর বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক রচনা এবং ত্রিপুরার ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উপকরণ বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। ত্রিপুররাজ দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের রাজত্বকালের (১৬৮৫—১৭১০ খৃঃ) প্রথম দশকে রাজা নরেন্দ্রমাণিক্যের বিদ্রোহ (১৬৯৩—৯৪ খৃঃ) এবং রাজা রত্নমাণিক্যের সাময়িক রাজ্যচ্যুতি এই গ্রন্থের প্রধান ঘটনা। রত্নমাণিক্যের রাজ্য পুনরুদ্ধারে যে সকল সেনাপতি সহায়তা করেন তাঁহাদের মধ্যে মির খাঁ গাজীর নাম সর্বাধিক শোনা যায়। কবি সেখ মহদ্দির ভণিতা হইতে জানা যায় যে এই মিরখাঁ গাজীর আদেশ তিনি রাজা রত্নমাণিক্যের রাজত্বকালের মধ্যেই কোন এক সময় এই কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীরত্নমাণিক্য রাজা গুণে অনুপাম।
তান পদতলে করি সহস্র প্রণাম॥

* * *

হীন মহদ্দিয়ে কহে মিরখাঁ আদেশে।
সমসের ভারত পুথি রচিনু বিশেষে॥

* * *

শ্রীযুত মির খাঁ প্রতাপে ভাস্কর।
কহে হীন মহদ্দিয়ে তান আজ্ঞাপর॥[৩৪]

৩৪ চম্পকবিজয় (হস্তলিখিত পুথি) বিবরণ এবং উদ্ধৃতাংশ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

গ্রন্থের নামকরণের উল্লেখ পাওয়া যায় প্রথমভাগে বলিভীমের বন্দীত্ব তথা পতন-বৃত্তান্তের শেষে—'ইতি চম্পকবিজয়ে বলিভীম নারায়ণ বন্দী"

বলিভীমনারায়ণ সম্পর্কে রত্নদেবের মাতুল হইলেও তিনি পঞ্চমবর্ষীয় বালক রত্নদেবকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং যুবরাজ হন রত্নদেবের বয়স্ক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অমরসিংহ, শক্রসিংহনারায়ণ প্রভৃতিকে হত্যা করিয়া।[৩৫] বলিভীমের এই অত্যাচারের ভয়ে অন্যান্য রাজবংশীয়গণ পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। চম্পক রায়ও সেই সময় আত্মগোপন করেন।

সেকালে চম্পকরায় আছিল লুকাই।

শায়েস্তা খাঁর অবসর গ্রহণের পরে বাহাদুর খাঁ সাময়িকভাবে (১৬৮৮-৯০ খৃঃ) বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। চম্পকবিজয় হইতে জানা যায়, তাঁহার বাংলাদেশে আগমন উপলক্ষে সকল জমিদারগণ তাঁহার দরবারে উপস্থিত হন কিন্তু ত্রিপুরার পক্ষ হইতে বলিভীম উপস্থিত না হওয়ায় ত্রিপুরা আক্রান্ত হয় এবং বলিভীম সংরাইল গড় হইতে ধৃত হইয়া বন্দী হন।

শাস্তা খাঁ নবাব যদি তৈগির হইল।
খানবাহাদুর তবে বাঙ্গালাতে আইল॥
সর্ব্বদেশের জমিদার আসিয়া মিলিল।
ত্রিপুর নৃপতি তবে গরহাজির হৈল॥

কিন্তু দুর্গামণির রাজমালায বলিভীমের পতন শায়েস্তা খাঁর সময়ে হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে।[৩৬] বলিভীমের বিতাড়নের পরে রত্ন-মাণিক্যের পিতৃব্য জগন্নাথদেবের বংশেব আধিপত্য ঘটে। সূর্যপ্রতাপ নারায়ণ উজীর হন এবং 'দেওয়ান মুন্সী হইল চাম্পারায ঠাকুর।' চম্পক বিজয়ের দ্বিতীয় ভাগের সূত্রপাত হইয়াছে এইখানে। কবির পৃষ্ঠপোষক সেনাপতি মির খাঁর আবির্ভাবও এই সময়ে—

মির খাঁরে আনি তবে উকিল করিলা।
মোগল বুঝাইলে তবে তানে নিযোজিলা॥

রাজমালার আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, মহারাজ রাম-মাণিক্যের রাজত্বকালেই রত্নমাণিক্যের পিতৃব্যপুত্র দ্বারিকাঠাকুর বিদ্রোহী হইয়া নরেন্দ্রমাণিক্য নামে রাজা হন। রামমাণিক্যের চেষ্টায় তিনি ঢাকায় কারারুদ্ধ হইলেও পরে রত্নমাণিক্যের রাজ্যকালে রাজা দলসিংহ নামক রাজপুরুষের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া পুনরায় বিদ্রোহী হন এবং উজীর ও

---

৩৫ প্রাচীন রাজমালা পৃ ২৮৭

৩৬ রাজমালা পৃ ২৯৩

নেব-উজীরকে হত্যা করাইয়া দলসিংহের সৈন্যবলের সহায়তায় রাজধানী উদয়পুর অধিকার করিয়া রাজা হইয়া বসেন। নরেন্দ্রমাণিক্যের প্রথম বিদ্রোহের কাহিনী প্রাচীন রাজমালার উল্লেখ সূত্রে আলোচনা করা হইয়াছে। চম্পকবিজয় হইতে নরেন্দ্রমাণিক্যের প্রতি রত্নমাণিক্যের সেনাপতি মির খাঁর তিরস্কার বাক্যের মধ্যে তাঁহার দ্বিতীয় বিদ্রোহের বিবরণ পাওয়া যায়।

নরেন্দ্র দেবের ঠাই কহিল বচন।
বিরোধ করিতে পুনি চাহ কি কারণ।
এক বিরোধ তুমি কৈলা শিশুকালে।
না পারিলা স্থির হৈতে দেবের বলে॥
বৃদ্ধ নরপতিয়ে তোমা করিত গৌরব।
না বুঝিয়া তার সনে করিলা রৌরব॥
শিশুকালে হইল তোমার বাপের মরণ।
কোলে করি পালিলেক রাজা মহাজন॥
ভ্রাতৃপুত্র জানিয়া তোমারে কৈল দয়া।
তুমি তার প্রতি কিছু না করিলা মায়া॥
বৃদ্ধ নৃপতিরে তোমার করিলেক হিত।
তানে মারিবার যুক্তি কৈলা বিপরীত॥

নরেন্দ্রমাণিক্যের দ্বিতীয় বিদ্রোহকালে শায়েস্তা খাঁর স্থলে বঙ্গের নবাব ছিলেন ইব্রাহিম খাঁ (১৬৯০-৯৭খৃঃ)—'খান বিরাহিম হৈল বঙ্গ অধিপতি।' দ্বিতীয় ভাগের শেষ রত্নমাণিক্য, চম্পক রায় প্রভৃতির অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণে। তৃতীয় এবং চতুর্থ ভাগই গ্রন্থের আসল অংশ—এই দুই অংশে রত্নমাণিক্যের রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টা এবং চম্পকরায়ের বিক্রমকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থের যে আধুনিক প্রতিলিপি ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার রাজগ্রন্থাগারে রক্ষিত তাহা এইখানে শেষ হওযায় পরবর্তী ঘটনার বিস্তারিত বিববণ পাওয়া সম্ভব নহে।[৩৭] অবশ্য গ্রন্থারম্ভের নির্দেশ হইতে সমগ্র গ্রন্থটির মূল সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রধানতঃ চম্পক রায়ের চেষ্টায়ই রাজা রত্নমাণিক্য সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে চম্পক রায় যুবরাজ সম্মানলাভ করেন। চম্পক রায়ের পরাক্রমের উল্লেখপ্রসঙ্গে কবি প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ—

জগন্নাথসুত যদি যুবরাজ না হৈত।
রাজার রাজ্যের পরে অনর্থ পড়িত॥

অন্যত্র— চম্পকবিজয় কথা মধুরস বাণী।
সেক মহাদ্দিয়ে কহে যুদ্ধের কাহিনী॥

---

৩৭ চুণ্টা প্রকাশ, চৈত্র ১৩৪৫

এ হেন অপুর্ব্ব কথা শুনে যেই জনে।
বুদ্ধি সাহস তার বাড়ে সেই ক্ষণে॥

সেনাপতি মির খাঁ ছিলেন চম্পকরায়ের অতি প্রিয়পাত্র এবং বিশ্বাস-ভাজন।

যশবন্ত রসকীর্ত্তি সাহা মিরখান।
চম্পকরায়ের প্রিয় প্রাণের সমান॥

চম্পক রায়ের পরাক্রমের পরিচয় পাওয়া গেলেও তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর বিবরণ উক্ত পুঁথিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন রাজমালা হইতে জানা যায়, দুই বৎসর পরে রত্নদেবের হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার হইলে চম্পক রায় নামে যুবরাজ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনিই সুদীর্ঘকাল (প্রায় পনের বৎসর) ত্রিপুরার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু রত্নমাণিক্যের রাজত্বের প্রায় শেষ সময়ে তিনি স্বয়ং রাজা হইতে ইচ্ছুক হন—'রাজা হইতে মনে তার হইল প্রস্তাব।' দুর্ভাগ্যক্রমে পবলপরাক্রমশালী চম্পক রায়কেও সৈন্যগণের বিরোধিতায় প্রাণ হারাইতে হয়।

বিধাতা বিপক্ষ হৈলে বোদ্ধি হএ নাষ।
রাজা হইতে মনে তার হইল প্রস্তাষ॥
রাজসন্য সব জত রাজাদিগে হইল।
সব দেখিয়া তবে চিন্তাজুক্ত হইল॥
জত সব পরিবার রাখীয়া দেসেতে।
প্রাণভয় পলাইয়া গেলেক বনেতে॥
রাজসন্য বন হতে ধরিয়া আনিল।
অপরাধ জানি তারে সংহার করিল॥[৩৮]

চম্পকবিজয়ের প্রারম্ভেও আছে যে, তিনি তন্ত্রমতে লক্ষ হোম সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহা রাজ্যলাভ প্রত্যাশায়ও হইতে পারে। চম্পকবিজয়ের মধ্যে ত্রিপুর রাজ্যের একাধিক অশ্রুতপূর্ব দুর্গ ও গড়ের বিবরণ আছে। এই গ্রন্থে চম্পক রায়ের রাজউপাধি গ্রহণেরও কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কালী-পক্ষীয় টীকার একটি পুঁথির গ্রন্থসমাপ্তির নিম্নোদ্ধৃত পুষ্পিকা হইতে এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, চম্পক রায় ঘোরতর শাক্ত ছিলেন এবং ১৬২৭ শকাব্দের মাঘ মাসে (১৭০৬ খৃঃ) মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন।[৩৯] এই দুই ব্যক্তি অভিন্ন হইলে অনুমান করা যায় যে, সেই

---

৩৮ প্রাচীন রাজমালা

৩৯ "ইতি শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ চম্পক মহীনাথ—নিদেশিত শ্রীচন্দ্রচূড় ব্রহ্মচারি বিরচিতা কালীপক্ষীয়া বিদ্যাসুন্দর কাব্যটীকা সংপূর্ণা॥ শকাব্দা ১৬২৭॥" সা-প-প, ৫৮শ ভাগ।

সময়ে ইতিনি সৈন্যহস্তে নিহত হন এবং চম্পকবিজয়ে তাঁহার মৃত্যুর কোন উল্লেখ না থাকায় গ্রন্থটি ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

রাজমালা এবং চম্পকবিজয় উভয় কাব্যগ্রন্থই ত্রিপুর-রাজবংশের ইতি-বৃত্তমূলক। কাব্যাকারে লিখিত হইলেও ইহাদের কাব্যাংশ একেবারেই গৌণ বলা যায়। মাঝে মাঝে কচিৎ কখনো কবিত্বের ছাপ রহিয়া গিয়াছে ত্রিপদীর বর্ণনবৈচিত্র্যের মধ্যে। রাজমালার নাম অল্পবিস্তর পরিচিত হইলেও এই উভয় বর্ণনাত্মক কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ঐতিহাসিক রচনা হিসাবে চম্পকবিজয়ের অসামান্যতা স্বীকার করিতে হয়। রাজমালার বর্ণিত ঘটনার সীমাকাল সুদূর প্রসারী—বিভিন্ন সময়ে একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক ইহা রচিত। গ্রন্থের মধ্যে স্থানে স্থানে ভাষা অতিরঞ্জিত, কিন্তু চম্পকবিজয়ের ঘটনাকাল মাত্র একটি দশকে সীমায়িত হওয়ায় ঘটনাবলী যতদূর স ব যথাযথ বিবৃত হইয়াছে।

উভয় গ্রন্থের তুলনা-মূলক আলোচনা

এযাবৎ আলোচনা হইতে আমরা দেখিতেছি যে, ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিবৃত্তিকা ব্যতীত সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক কোন কাহিনী অবলম্বনে পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক কাব্য রচিত না হইলেও প্রায় অষ্টাদশ শতকের কয়েক দশক পর্যন্ত রচিত বিভিন্ন কাব্য এবং ছড়ার মধ্যে বহু ঐতিহাসিক—সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। এক্ষণে আমাদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রচিত ইতিহাসাশ্রিত কবিতা সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে ইতিহাসের সহিত ইতিহাসাশ্রিত কবিতার সম্বন্ধ সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। ইতিহাস অবলম্বনে রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে নানা মত ব্যক্ত হইয়াছে। ইতিহাসের ব্যতিক্রমের অপরাধে ঐতিহাসিক ফ্রীমান (Freeman) স্কটের আইভ্যানহো পড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন কারণ আইভ্যানহো-এর মধ্যে 'ক্রুজেগ যুগ' সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যের অভাব। প্যালগ্রেভ সাহেবের মতে ঐতিহাসিক উপন্যাস যেমন একদিকে ইতিহাসের শত্রু তেমনি অন্যদিকে গল্পেরও মস্ত রিপু। ডক্টর গুচ (Gooch) আবার ইহার বিরুদ্ধ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে,—Historical fiction has played an active part in reviving and sustaining the sentiments of nationality, which for good or evil has changed the face of Europe in the nineteenth and and twentieth centuries."[৪০] রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক উপন্যাসের আলোচনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের

ইতিহাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাস

৪০ Times Literary Supplement June 1945.

লোভ, তাহার সত্যের প্রতি কোন খাতির নাই। এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসে 'লেখক ইতিহাসকে অখণ্ড রাখিয়াই চলুন আর খণ্ড করিয়াই রাখুন সেই ঐতিহাসিক রসের অবতারণায় সফল হইলেই হইল।'[৪১] কিন্তু ইতিহাসের সত্যের প্রতি কোন খাতিরই না থাকিলে ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঐতিহাসিক রসের অবতরণায় সফল হওয়া শক্ত। ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস বা কাব্যের উদ্দেশ্য অভিন্ন নহে। অনেকের মতে উহারা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে ডক্টর গুচ-এর (Gooch) মন্তব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক লিখিয়াছেন—What might have been is not the same as what was. [Dr Gooch] and fiction therefore, however conscioutious and erudite, could never provide a substitute for genuine historical study. How ever it is because of a certain inadequacy secrets with them to the grave and our knowledge [of past ages] thus remaining eternal incomplete—that Dr. Gooch championed the cause of historical novel.[৪২]

রবীন্দ্রনাথও লিখিয়াছেন—এক্ষণে কর্তব্য কী? ইতিহাস পড়িব, না আইভ্যানহো পড়িব? ইহার উত্তর অতি সহজ। দুইই পড়ো। সত্যের জন্য ইতিহাস পড়ো, আনন্দের জন্য আইভ্যানহো পড়ো। ···কাব্যে যদি ভুল শিখি ইতিহাসে তাহা সংশোধন করিয়া লইব।[৪৩]

ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ইতিহাসাশ্রিত কবিতা

ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে যে কথা প্রযোজ্য ইতিহাসাশ্রিত কাব্য সম্পর্কে সর্বাংশে না হইলেও মোটামুটীভাবে তাহাই প্রযোজ্য বলা যাইতে পারে। রূপকৃতির (form) পার্থক্যের জন্য ঐতিহাসিক রসের অবতারণায় ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ঐতিহাসিক কাব্যের উপাদান বস্তুর বর্জন-গ্রহণে কিছু হেরফের ঘটা স্বাভাবিক। কাহিনীর রূপায়ণে তথ্যসম্ভারের ফাঁক কল্পনার সংমিশ্রণে পূর্ণ করিবার যতখানি সুবিধা ঐতিহাসিক উপন্যাস-লেখকের আছে ঐতিহাসিক কাব্য রচয়িতার ঠিক ততখানি না থাকিলেও কল্পনা বিস্তারের যথেষ্ট সুযোগ আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সহিত ইতিহাসাশ্রিত কবিতার পার্থক্য অন্যত্র। ঐতিহাসিক কবিতা অপেক্ষা ঐতিহাসিক উপন্যাস আধুনিক।

৪১ সাহিত্য, পৃ ১৬৯
৪২ Times Lt. St.
৪৩ সাহিত্য পৃ ১৭০

ইতিহাস অবলম্বনেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টি কিন্তু অনেকক্ষেত্রে ঐতিহাসিক কবিতা-ছড়াগুলিই ইতিহাসের অন্যতম উপাদানরূপে গৃহীত হইয়াছে এবং অন্য উপাদনের অভাবে ঐতিহাসিক কবিতা অবলম্বনেই ইতিহাসের তথ্য নির্ণীত হইয়াছে। বস্তুতঃ বাংলাদেশের তথা বাঙালী জাতির জীবনধারার যথার্থ পরিচয় প্রদানে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত উপাদানের মূল্য অসীম। এই ঐতিহাসিক কবিতা-ছড়াগুলি অনেকাংশে সেই উপাদানেরই উপকরণ হইয়া উঠিয়াছে। রাজমালা, চম্পকবিজয় প্রভৃতির ন্যায় রাজসভাজাত কাব্য হইতে উপাদান সংগ্রহের অসুবিধা আছে, এসমস্ত উপাদান রাজা অথবা তদাশ্রিতের পোষকতায় রচিত কিন্তু গ্রাম্য কবিতা, ছড়া, গীতগুলির উৎসারণ স্বতঃস্ফূর্ত এবং সেই হিসাবে এগুলি বহুলাংশে সমসাময়িক সমাজ জীবন ও ধর্ম বিশ্বাসের পরিচায়ক।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের আরম্ভকালের উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বেই করিয়াছি। বর্তমানে শেষ সীমা সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। আলোচনার শেষ সীমা ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ। ইহার কারণ আমাদের আলোচ্য কালের সর্বশেষ ছড়াটি হইতেছে বীরভূমের সাঁওতাল হাঙ্গামা সম্পর্কে। এই হাঙ্গামার সূত্রপাত কালেই ইহা রচিত হয়। ছড়াটির আলোচনাকালে আমরা দেখিব যে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে একই বিষয়ে রচিত দ্বিতীয় ছড়াটির সহিত এই ছড়াটির বেশ প্রভেদ রহিয়াছে। শেষ কবিতাটির উপর আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্যেই প্রথম লক্ষিত হয়। আমরা গুপ্ত কবির যুদ্ধবিষয়ক কবিতাগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করিয়াছি।

আলোচ্য বিষয়ের শেষ সীমা

ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ ক্রমবর্ধমান স্বাজাত্যবোধ এবং স্বাধীনতা-স্পৃহার প্রকাশ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাংলাদেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্বগামী।[৪৪] ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য সর্বাংশে যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা শক্ত। গুপ্ত কবির রচনার মধ্যে দেশবাৎসল্যের নামে দেশাচারই প্রাধান্য পাইয়াছে। তদ্ব্যতিরিক্ত কিছু নহে। তাঁহাকে স্বদেশ-প্রেমিক বলিতে গেলে সংস্কারকামী অর্থেই বলা চলে। পরাধীনতার জন্য তিনি কোনদিন বেদনা বোধ করেন নাই, বরং দেশীয় সৈন্যদের ইংরেজবিরুদ্ধাচরণে তিনি বিরক্তবোধ করিয়া দেশবাসীর উদ্দেশে ইংরেজ আনুকূল্যেরই আহ্বান জানাইয়াছেন। তথাপি কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে, প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে তিনি আধুনিকতার অগ্রদূত বই কি। গুপ্ত কবির যুদ্ধবিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ-মাত্র আছে, কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক কবি রঙ্গলালের উত্তরকালীন কাব্যে

গুপ্ত কবির দৃষ্টি-ভঙ্গীর আধুনিকতা

৪৪ 'গুপ্তের কবিত্ব'—বঙ্কিমচন্দ্র রচিত

সেই ঐতিহাসিকতাই রোমান্সের অঙ্কশায়িনী হইয়া কাব্য-সাহিত্যে এক নূতন ধারার সৃষ্টি করিয়াছে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে তাহার সংঘটনক্ষেত্র ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল হইলেও সুদূর বাংলা দেশের সরকারী কর্মচারীদের মনে ইহা যেমন আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল,[৪৪] তেমনি আদর্শবাদী, ভাবুক, পরাধীন বাঙালী জাতির নিভৃত মানস-কন্দরেও ইহা কম আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই। ঈশ্বর গুপ্তের যুদ্ধবিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে বিপরীত সুর ধ্বনিত হইলেও রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের প্রতি রাণা ভীমসিংহের উৎসাহ বাক্যের মধ্য দিয়া পরাধীনতার যে বেদনা ব্যক্ত হইয়াছে তাহাই নবজাতীয়তাবোধে বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল।

১৭৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দীর মধ্যে রচিত ইতিহাসাশ্রিত কবিতাসমূহ আমরা চারিটি শ্রেণীভুক্ত করিয়া চার অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। রাষ্ট্রীয় ঘটনাশ্রিত কবিতা-সমূহ প্রথম পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে রচিত রাজকাহিনী এবং জীবনীকাব্য সমূহের মধ্যে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্বিপাক-কাহিনী অবলম্বনে রচিত ছড়াসমূহের ঐতিহাসিকত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। চতুর্থ এবং সর্বশেষ অধ্যায়ের উপাদান—ইংরেজ রাজত্বের সূচনাকাল হইতে প্রতিষ্ঠালাভের মধ্যবর্ত্তী-কালের সংঘাতমূলক ঘটনা সম্পর্কে রচিত ঐতিহাসিক ছড়াগুলি।

অধ্যায় পরিচিতি

আলোচ্য বিষয়ের সত্যতা প্রতিপাদনার্থে যে কাব্যাংশগুলি উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেগুলি সম্বন্ধে পরিশেষে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। কথা শেষে তাহাই ব্যক্ত করিতেছি। প্রাচীন পুঁথির বানান সম্বন্ধে অনেকে এই মত পোষণ করেন যে পুঁথির নকলকারের ভ্রম সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করা উচিত। কিন্তু অপরপক্ষের মতে পুঁথির বর্ণাশুদ্ধি করিলে তাহার অঙ্গহানি করা হয়। আমরা এক্ষেত্রে যে অশুদ্ধ বর্ণের কোনরূপ সংশোধন করি নাই, তাহার কারণ আমরা কেবলমাত্র অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছি। কোন সম্পূর্ণ পুঁথি মুদ্রণের ক্ষেত্রে যাহা বিধেয় এস্থলে তাহা প্রযোজ্য হইতে পারে না।

উদ্ধৃতাংশের বর্ণাশুদ্ধি

৪৪ It was all but universally credited that the Barrackpur brigade was in full march on calcutta, that the people in the subarbs, had already arisen, that the king of Oudh with his followers was plundering Garden Reach. Those highest in office were the first to give alarm.

Red Pamphlet—Colnel Malleson.

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রকথা

মহারাষ্ট্রপুরাণ

অষ্টাদশ শতকেব পঞ্চম দশকেব পববর্তী ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কাব্যের মধ্যে পথম উল্লেখ কবিতে হয কবি গঙ্গাবাম বচিত 'মহাবাষ্টপুবাণে'ব।[১] কাব্যশেষে একমাত্র ভণিতা 'কবি গঙ্গাবাম' ব্যতীত কাব্য হইতে কবিব সম্বন্ধে আব কোন তথ্য পাওযা যায না। প্রাপ্ত পুথিব শেষ এইরূপ—"ইতি মহাবাষ্টপুবাণে প্রথম কাণ্ডে ভাস্কব পবাভব॥ সকাব্দা ১৬৭২ সন ১১৫৮ সাল॥ তাবিখ ১৪ পৌষ, বোজ সনিবাব॥" কাব্যগ্রন্থকাব এই ভাস্কব পবাভব কাহিনীকে মহাবাষ্ট্রপুবাণেব প্রথমকাণ্ড বলিযাছেন দেখিযা মনে হয অপবাপব কাণ্ড লিখিবাব বাসনা হযতো তাঁহাব ছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই ক্ষুদ্র কাণ্ডটি ভিন্ন অপব কোন কাণ্ডেব সংবাদ পাওযা যায নাই। এতৎসহ যে তাবিখ দেওযা হইযাছে তাহা গ্রন্থবচনাব কি লিপিকালেব তাহা বলা হয নাই, তবে লিপিকব সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন উল্লেখ ন থাকায উহা গ্রন্থ বচনাবই তাবিখ মনে কবা হইযাছে।

রচয়িতা

পুথিব প্রকাশক ব্যোমকেশ মুস্তফী পুথিব ভাষা পবীক্ষান্তে লিখিযাছেন—"পুথিখানিব অধিকাংশ স্থানেই বাঢেব উচ্চাবণসুলভ আনুনাসিক ক্রিযাপদেব বহুল প্রযোগ দেখিযা কবিকে বাঢেব লোক বলিযা সহজেই অনুমাণ কবা যায।"[২] প্রসঙ্গক্রমে বমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায 'বামাযণ', 'ঊষাহবণ', 'সুদাম চবিত্র' প্রভৃতি কাব্যেব বচযিতা জনৈক গঙ্গাবাম দত্তেব উল্লেখ কবিযাছেন। ইনি যশোহবেব অন্তর্গত বিখ্যাত নডাইল গ্রামনিবাসী গঙ্গারাম দত্ত। এই দত্ত বংশ হাওডাব নিকটবর্তী বালি গ্রামে বাস কবিতেন। বর্গীব উৎপাতেব ফলে তাঁহাবা প্রথমে মুর্শিদাবাদেব নিকট চেঁরা নামক স্থানে এবং পবে আবো দূবে সবিযা গিযা এক নূতন বাসস্থানেব পত্তন কবেন। এই নূতন বাসস্থান হইল নডাইল। বমেশবাবুব অনুমান, এই গঙ্গাবামই 'মহাবাষ্টপুবাণ' বচযিতা গঙ্গাবাম দত্ত।[৩] কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র। কেদাবনাথ মজুমদাব 'কবি

১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব পুথি ১৭৮৪

২ সা প-প ১৩১১

৩ ভারতবর্ষ ১৩৪৬ শ্রাবণ

কারণ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তাঁহার বর্ণনানুযায়ী শিব নন্দীকে দক্ষিণ সহরে যাইতে আদেশ দিয়াছিলেন—'শাহু রাজা নামে এক আছে পৃথিবিতে অধিষ্ঠান হয় জাইআ তাহার দেহেতে।' পুথির প্রকাশক ব্যোমকেশ মুস্তফী ইহার উল্লেখ করিয়া গঙ্গারামের ভৌগোলিক জ্ঞান সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে, এই শাহু রাজাকে এবং দক্ষিণ শহরটিই বা কোথায় তাহা কবি বলিয়া দেন নাই।[৫] কিন্তু এই সংশয় অমূলক। কয়েক ছত্র পরেই কবি এই শাহু রাজা এবং দক্ষিণ দেশ সম্বন্ধে আরো স্পষ্ট উক্তি করিয়াছেন। রাজার দূত বাদশাহের নিকট পত্র লইয়া গিয়াছিল। বাদশাহের আদেশে উজীর তাঁহার প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া শাহু রাজাকে বাংলা হইতে চৌথ আদায়ের ফরমান দিলেন।

এতেক বচন পত্রে লিখীলা উজীর।
পত্র পাইঞা দুত তবে নোঞাইল সির॥
দুত তবে বিদাএ হইলা তরিতে।
সিগ্রগতি য়াসি পহুছিলা সেতারাতে॥
সভা করিঞা রাজা বইসা আছে স্থানে।
হেনকালে পত্র দুত আনে সেইখানে॥

সুতরাং ইহা মনে করা যাইতে পারে যে, কবির মতে দাক্ষিণাত্যের সাতারার রাজা শাহুর আদেশক্রমেই রঘুরাজা স্বীয় অনুচর ভাস্কর পণ্ডিতকে চৌথ আদায়েব জন্য বাংলায় পাঠাইয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রও তাঁহার অন্নদামঙ্গল কাব্যের সূচনাংশে বাংলা দেশে বর্গীর উৎপাতের কারণ উল্লেখ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, মোগল সৈন্য উড়িষ্যা প্রদেশে অত্যাচার কালে শিবের পীঠস্থান ভুবনেশ্বরেও আসিযা দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলে শিবের পরামর্শক্রমে নন্দী গড় সেতারার বর্গী রাজাকে এক স্বপ্নাদেশ দেন—

আছয়ে বর্গির রাজা গড় সেতারায়।
আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়॥
সেই আসি যবনেরে করিবে দমন।
শুনি নন্দী তারে গিয়া কহিলা তখন॥
স্বপ্ন দেখি বর্গি রাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত॥

৫ সা-প-প ১৩১৩

মারাঠা ইতিহাস হইতে জানা যায়, অওরঙ্গজেবের বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে শিবাজীর পুত্র শাম্ভাজী আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়া অওরঙ্গজেব মারাঠা রাজ্য আক্রমণ করিয়া শাম্ভাজীকে বন্দী এবং অনুচরসহ হত্যা করেন ও ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে শাম্ভাজীর সাত বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্র শাহু বা দ্বিতীয় শিবাজীকে নিজ অন্তঃপুরে নজরবন্দী করিয়া রাখেন। অওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর জিঞ্জিদুর্গবিজয়ী জুলফিকর খাঁর পরামর্শে আজমশাহ ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে শাহুকে মুক্তিদান করেন। শাহু বালাজী বিশ্বনাথ নামক এক ব্রাহ্মণের সহায়তায় ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে সাতারায় রাজা হইয়া বসেন। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে শাহু বালাজী বিশ্বনাথকে পেশবা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। এই বালাজী বিশ্বনাথ ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ ফরুকথ সিয়রের নিকট হইতে শাহুর নামে এক ফরমান বা সনদ আদায় করেন। এই সনদে সম্রাট মারাঠাদের দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবা হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের ক্ষমতাদান করেন। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে অথবা তাহার কিছুকাল পরে শাহুর মৃত্যু ঘটে। সুতরাং মারাঠাদের বাংলা দেশ আক্রমণকালে শাহু নামে একজন রাজা সাতারার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলা যায়। কিন্তু মারাঠাদের বাংলা দেশ আক্রমণের অন্যবিধ কারণেরও উল্লেখ কোন কোন ইতিহাসে পাওয়া যায়।[৬] গঙ্গারাম ও ভারতচন্দ্র তাঁহাদের কাব্যে মারাঠা আক্রমণের যে কারণ দর্শাইয়াছেন তাহা পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে।

৬ Mir Habib, a clever Persian of Shiraj, had long ago migrated to India and from humble beginings risen to the deputy Nawabship of Orissa in which post he served his master another Murshid Quli-khan, Governor of Orissa with devotion and distinction. He remained loyal to his master to the last and after the latter's defeat by Aliwardi, had unsuccessfully attempted to engage the Marathas in his master's cause. Raghuji Bhosle was then in the Karnatak and his deputy Bhaskar Ram in his master's absence was disinclined to undertake major operations in Bengal. Mir Habib being compelled by circumstances re-entered Aliwardi's service though he continued to nurse severe hatred for the usurper. Raghuji Bhosle of Nagpur looked

তাঁহারা উভয়েই যদিও পাপাচার, জনসাধারণের দুর্ভোগ, অসন্তোষ এবং দৈব প্রতিকারের উপর জনগণের নির্ভরশীলতার উল্লেখ করিয়াছেন তথাপি ভারতচন্দ্র উল্লিখিত নবাব আলীবর্দীর সৈন্যদল কর্তৃক ভুবনেশ্বর মন্দির লুণ্ঠন ও অপবিত্র করার অভিযোগ সত্য বলিয়া মনে হয় না। ভারতচন্দ্র নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। তাঁহার আশ্রয়দাতা এবং পোষ্টা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বার লক্ষ টাকা নজরানা প্রদানে অপারগ হওয়ায় কিছুকালের জন্য আলীবর্দী কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। এই কারণে প্রভুর শত্রুর উপর ভারতচন্দ্রের রোষ এবং তাঁহার প্রদত্ত বিবরণে পক্ষপাতিত্বের সুর অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কবি গঙ্গারামের জীবনে অনুরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই। সেইজন্য তাঁহার কাব্যে জনগণের মনোভাবের যথার্থ প্রতিফলন ঘটিয়াছে। তিনি প্রথমে মারাঠাদের আগমনে জনসাধারণের মনে আশা ও স্বস্তি সঞ্চারের সংবাদ দিয়া পরে তাহাদের অত্যাচারে দেশবাসীর হতাশা, ঘৃণা, বিরাগ এবং পরিচিত বিপদগ্রস্ত মুসলমান রাজশক্তির প্রতি আস্থা ও সহযোগিতার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। সমসাময়িক কোন মুসলমান ইতিহাসে মারাঠাদের আগমনে হিন্দুদের এই মনোভাবের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ হিন্দুদের এইরূপ মনোভাব সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃই তাঁহারা মারাঠা আক্রমণের যত দোষ অন্য মুসলমানদের (সরফরাজ খাঁর হিতৈষী, অসন্তুষ্ট কর্মচারী

on this eastern province of Bengal as his special sphere and had showed deep resentment when Peshwa Baje Roy made demands on the revenues of Bengal in his negotiations with Nijum-ul-Mulk at Bhopal in 1738. Raghuji's Karnatak expedition had added to his reputation and on his return to Nagpur, in 1741, he was informed of the political change in Bengal and of the offers received from Mir Habib and the disgruntled section of the New Nabab's ambitious views towards the province and decided to forestall him by at once sending his army eastward. He was naturally anxious to have an independent field for his activities and readily grasped the offer made to him by Mir Habib. At Satara, therefore, he hurriedly took his leave of Sahu. At this very time the Peshwa

অথবা নিজাম-উল-মুল্কের)৭ উপর আরোপ করিয়াছেন।৮ সেই হিসাবে মহারাষ্ট্রপুরাণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। গঙ্গারাম তাঁহার পৌরাণিক পদ্ধতিতে লিখিত কাব্যে ইতিহাসের এক অবহেলিত, অবজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন। মুসলমান ঐতিহাসিকদের প্রদত্ত কারণসমূহ এবং গঙ্গারাম প্রদত্ত কারণ একত্র করিলে আমরা বাংলা দেশে মারাঠা আক্রমণের শুধু কারণই নহে, তাহাদের প্রথমে জয়লাভ এবং পরিশেষে পরাজয়ের কারণও বুঝিতে পারি।

himself conceived the plan of taking a hand in the affairs of Bengal, being jealous of Raghuji's rising power. Immediately after his arrival at Nagpur Raghuji formed plans in consultation with his trusted lieutenant Bhasker Ram, who had directly arrived there from Trichinopoly with Chande Saheb in his custody. A strong expedition was fitted out for proceeding into Orissa and Bengal. It started on the Dassara day of 1741, with about ten thousand troopers.

New History of the Marahatas—G.S. Sardesai.—p 233

৭ ইউসুফ আলী, করম আলি প্রভৃতি মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে আসফজা নিজাম-উল-মুল্ক রঘুজী ভোসঁলেকে বাংলা অভিযানে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। নিজাম-উল-মুল্ক মনে করিয়াছিলেন যে, ইহার ফলে মারাঠাদের লুব্ধ দৃষ্টি দক্ষিণে তাঁহার রাজ্যের উপর হইতে সরিয়া গিয়া উত্তর-পূর্ব বাংলার উপর পড়িবে, এতদ্ব্যতীত আলীবর্দীও আর ইহার ফলে দক্ষিণে তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তারের কামনা চরিতার্থ করিতে সাহসী হইবেন না।

৮ Contemporary Muslim Historions seem to have no knowledge of the state of Hindu feeling described above, they suspected intrigues but were inclined to throw the whole blame on other Muslims in India (e. g. partisans of Sarfaraj Khan, discontented officials, or the Nijam-ul-Mulk). Probably they were partly right, and it was also natural that the Muslim writers of Bengal should be largely out of touch with the undercurrent of discontent amongst Hindu subjects.

Alivardi and His Times—K. K. Dutta, p. 58

তৎপরে ভাস্কর পণ্ডিতের অভিযান বর্ণিত হইয়াছে। বর্গীদের বর্ধমান আগমনের তারিখ গঙ্গারাম এইভাবে নির্ধারণ করিয়াছেন,—

বৈশাখের উনিশা যাএ বরগি আইল তাএ
মহা য়ানন্দিত হইয়া মনে।

এই 'বৈশাখের উনিশা' কোন্ সালের গঙ্গারাম তাহা উল্লেখ না করিলেও যতদূর জানা যায ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকেই মারাঠারা বর্ধমান পৌঁছাইয়াছিল।[৯] ভারতচন্দ্রের বিবরণ হইতেও জানা যায় যে, ১৬৬৪ শক অর্থাৎ ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে এদেশে বর্গীর বিভ্রাট ঘটে।[১০] গঙ্গারাম লিখিয়াছেন যে, নবাব যখন হরকরা মারফৎ বর্ধমানে বর্গী আসিবার সংবাদ পাইলেন তখন তিনি রাজারাম হরকরাকে 'ফৌজের নির্ণয জানিবারে' পাঠাইলেন। হরকরার নিকট হইতে শাহুরাজা প্রেরিত ভাস্করের আগমনবার্তা পাইযা নবাব ভাস্করের সহিত চৌথ সম্পর্কে কথাবার্তা বলিবার জন্য একজন উকীল পাঠাইলেন। এইখানে উকীল এবং ভাস্করের কথাবার্তা হইতে বুঝা যায যে, নবাব আলীবর্দী খা সরফরাজ খাঁকে হত্যা করিযা সিংহাসন অধিকার করায় বাদশা তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই এবং তখনও তিনি আলীবর্দীকে কোনরূপ উপাধি প্রদান করেন নাই এবং সেইজন্যই নাকি আলীবর্দী দিল্লীতে খাজনা প্রেরণ বন্ধ রাখিযাছিলেন। গঙ্গারামের এই বিবরণ সম্পর্কে মতভেদ আছে। আলীবর্দীর উপাধিপ্রাপ্তির কথা দেশীয সকল ঐতিহাসিক স্বীকার

৯ Alivardi Khan was surprised to learn of these Marahata movements and the activities of Mir Habib when the Nawab was leisurely returning from Cuttack. Realising that he was unable to hold his own against the strong Marahata hordes, he by a rapid march with a slender camp reached Burdwan on 15th April, 1742 where he formed his camp on the bank of the Rani's lake outside the town. To his dismay, however, he found himself early next morning completely sorrounded by the Marahatas and was faced with utter starvation.

—New History of the Marahatas.—G.S. Sardesai p 211.

১০। শকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে।
বরগীর বিভ্রাট হইবে এইদেশে॥

—অন্নদামঙ্গল

করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রও তাঁহার কাব্যে আলীবর্দীর মহাবৎজঙ্গ উপাধি লাভের উল্লেখ করিয়াছেন। একমাত্র Holwell সাহেব তাঁহার 'Interestig Historical Events' নামকগ্রন্থে ইহার বিপরীত কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধ যুক্তিই প্রবলতর। মারাঠা ইতিহাস হইতেও আলীবর্দীর উপাধি প্রাপ্তির কথা জানা যায়। ভারতচন্দ্রের কাব্যের আলোচনাসূত্রে আমরা ইহার উল্লেখ করিয়াছি। মারাঠা সৈন্যদল কর্তৃক অবরোধের ফলে নবাব-শিবিরে খাদ্যাভাব প্রকট হইয়া উঠে। এই অবরোধজনিত জিনিষপত্রের দুর্মূল্যের গঙ্গারাম এইস্থানে এক উজ্জ্বল বাস্তব চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

বরগির তরাসে কেহ বাহির না হএ।
চতুর্দ্দিকে বরগির ডর রসদ না মিলএ॥
চাউল কালাই মটর মুষরি।
তেল ঘি আটা চিনি লবন একসের করি॥
টাকা সের হইল আনাজ কিনতে নাই পাএ। ইত্যাদি।

শুধু তরিতরকারীই যে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল, তাহা নহে, নেশার জিনিষও পাওয়া শক্ত হইয়া উঠে—'গাজাভাং তামাকু না পাএ কিনিতে।' দারুণ খাদ্যাভাবে লোকে আর কিছু বাছবিচার না করিয়া কলাগাছের এঠো সিদ্ধ করিয়া খাইতে লাগিল। গঙ্গারাম অনুপ্রাস সহকারে লিখিয়াছেন,—

বিষম বিপত্য বড় বিপরিত হইল।
অন্যপরে কা কথা নবাব সাহেব খাইল॥

নবাব ভক্ষণ করেন আর নাই করেন দারুণ খাদ্যাভাবে সৈন্যদের পক্ষে কলার এঠো ভক্ষণ আদৌ বিচিত্র নহে। অবরোধ ব্যর্থ হইলে ভাস্করের সৈন্যগণ লুণ্ঠনের দিকে মনযোগ দেয়। ভাস্কর তাঁহার জমাদারকে এই নির্দেশ দেন যে, কয়েকজন প্রহরায় থাকিবে এবং কয়েকজন লুণ্ঠনের জন্য বাহির হইবে। যে দশজন লুণ্ঠনের ভার পাইয়াছিল গঙ্গারাম তাহাদের নামোল্লেখও করিয়াছেন।[১১] গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন করায় গ্রামবাসিগণ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিতে থাকে। গঙ্গারাম এই গণ-পলায়নের এক নিখুঁত চিত্র আঁকিয়াছেন। গ্রামের যে যেখানে ছিল সকলেই নিজ নিজ 'ভাত ভিত্তির' উপকরণাদি সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিতে থাকে। শুধু বণিক-ব্যবসায়ী এবং স্ত্রীলোক-বৃদ্ধ নহে, ক্ষেত্রি-রাজপুতগণও তলোয়ার ফেলিয়া পলায়ন করে। কবি এই পলায়ন-বর্ণনার মধ্যেও একটু

১১ The History of Bengal (Dacca University) Vol II p 460 ff

রসিকতা করিতে ছাড়েন নাই। গোঁসাই-মোহান্তদের স্বভাব তাঁহার ভালরকম জানা ছিল বলিয়াই লিখিয়াছেন—

গোসাঞি মোহান্ত যত চোপালাএ চড়িয়া।
বোচকাবুচকি লয় জায় বাহুকে করিয়া।

দেশশুদ্ধ লোক বর্গীর ভয়ে পলাইতে থাকিলেও কেহই তখনো স্বচক্ষে বর্গীকে আসিতে দেখে নাই, সকলেই অপরের পলায়নে পলাইতে ব্যস্ত।

দশ বিশ লোক য়াইসা পথে দাড়াইলা।
তা সভারে সোধাএ বরগি কোথাএ দেখিলা॥
তারা সব বলে মোরা চক্ষে দেখি নাই।
লোকের পলান দেইখা আমোরা পলাই॥

'ছোট বড় গ্রামে যত লোক ছিল' বর্গীর ভয়ে সকলেই এই ভাবে পলায়ন করিল বটে কিন্তু পলাইয়া যাইবে কোথায়?

এই মতে সব লোক পলাইয়া জাইতে।
আচম্বিতে বরগি ঘেরিলা আইসা সাথে॥
মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।
সোনা রূপা লুঠে নেএ আর সব ছাড়া।
কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
একি চোটে কারু বধএ পরাণ।

এইভাবে ধনরত্ন লুণ্ঠন, ঘরবাড়ী ভস্মীভূত করিযা বর্গীরা গ্রামবাসীদের নিকট অর্থ দাবী করিতে থাকে এবং মনোমত টাকাকড়ি না পাইলে কাহারও নাকের মধ্যে জল ভরিয়া দেয়, কাহারও হাত ধরিয়া পুকুরের মধ্যে ডুবাইয়া রাখে। গঙ্গারাম গ্রামের পর গ্রামে বর্গীদের এই অত্যাচারের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। ইতিহাসেও ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।[১২]

শ্রীযুক্ত রামচরণ চক্রবর্ত্তী বেনারস হইতে ১৯৪০ সালে "চিত্রচম্পূ" নামক একটি সংস্কৃত কাব্যের পুথি সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন। গুপ্তিপল্লীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার এই কাব্যের রচয়িতা। ভূমিকা অংশ হইতে জানা যায় যে, বর্দ্ধমানের তদানীন্তন মহারাজ চিত্রসেনের (১৭৪০-৪৪খৃঃ) নামানুসারে কাব্যের নামকরণ হইয়াছে। চিত্রসেনই এই কাব্যের নায়ক এবং তাঁহার এক কল্পিত মৃগয়াভিযান কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। কাব্যের প্রারম্ভে মহারাজের প্রজাবাৎসল্য, বীরত্ব, রাজ্যপালনে নৈপুণ্য প্রভৃতি গুণের ব্যাখ্যা করিয়া প্রসঙ্গক্রমে মারাঠা সৈন্যদের

চিত্রচম্পূ

১২ Alivardi and His Times—K. K. Dutta. p 7

বাংলা দেশে আগমন এবং অত্যাচার, প্রজাবর্গের ভীতি ও পলায়ন এবং মহারাজ চিত্রসেন কর্তৃক তাহাদের আশ্রয় প্রদানের উল্লেখ আছে।

চিত্রচম্পূ কাব্যটি বাংলা দেশে মারাঠা আক্রমণের অব্যবহিত পরবর্তী এবং মহারাষ্ট্রপুরাণের কিছু পূর্ববর্তী রচনা। কাব্যটির মধ্যে বর্গীর উপদ্রবের কবিজনোচিত সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। সমসাময়িক রচনা হিসাবে ইহা মহারাষ্ট্রপুরাণের সহিত তুলনীয়। বর্গীদের অতর্কিত আগমনে পলায়মান ব্রাহ্মণগণের স্কন্ধোপরি 'লম্বালক' শিশু, গলদেশে দোদুল্যমান আরাধ্য শালগ্রাম শিলা, মনের মধ্যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর 'দুর্বহমহাভার' সঞ্চিত শাস্ত্রগ্রন্থরাশি বিনাশের আশঙ্কা, গর্ভভারালস পলায়মান রমণীদের নিদাঘসূর্যের তাপক্লেশ, পানাহারবঞ্চিত ব্যাকুল শিশুগণের করুণ চীৎকারে ব্যথিত জননীদের আর্তনাদ এবং অসহ্য বেদনায় সমস্ত পৃথিবীকে 'বর্গীময়' বলিয়া ধারণা প্রভৃতি বর্ণনা বাণেশ্বরের রচনার উজ্জ্বলতার পরিচায়ক। গঙ্গারাম অনুরূপ সুললিত ভাষা এবং বিষয়বিন্যাসে চমৎকারিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু উভয়ের প্রদত্ত বিবরণের মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। বাণেশ্বর বরং বর্গীর অত্যাচারে প্রপীড়িত গৌড়জনের অসহায় অবস্থার বর্ণনায় কিছু ভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাই যে কাহিনীকে তিনি কবিত্বসহকারে বর্ণনা করিয়াছেন, গঙ্গারাম (হয়ত অপেক্ষাকৃত কম কবিত্বশক্তির অধিকারী বলিয়াই) ভাবস্রোতে না ভাসিয়া তাহারই একটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, বাস্তব এবং সংহত চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন। মারাঠা শক্তির উদ্বোধক স্বয়ং শিবাজী যুদ্ধের সময় সৈন্যগণকে নারী ও শিশুর প্রতি যেরূপ সতর্ক আচরণের উপদেশ দিয়াছিলেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মারাঠাবর্গীরা যে তাহা বিস্মৃত হইয়াছিল এই দুই কবির বর্ণিত কাহিনী হইতে তাহা সমর্থিত হয়। অবশ্য বর্গী শব্দটি 'বর্গীর' অপভ্রংশ। ইহা হইতে বুঝা যায় যে ইহারা 'শিলাহদার' শ্রেণীভুক্ত সৈন্য নহে বরং নিম্নশ্রেণীর সৈন্য ছিল এবং ইহাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং অশ্ব নিজেদের সংগ্রহ করিতে হইত। সুতরাং ইহাদের শিলাহদার সমপর্যায়ভুক্ত করা চলে না।[১৩]

বাণেশ্বর ও গঙ্গারাম

মারাঠা সৈন্য ও বর্গী

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, গঙ্গারাম ইতিহাসাশ্রিত ঘটনা বর্ণনা করিলেও স্বীয় কাব্যকে তিনি পুরাণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এতক্ষণ

১৩ The History of Bengal (D. U.) Vol II p 457 fn.

রসিকতা করিতে ছাড়েন নাই। গোঁসাই-মোহান্তদের স্বভাব তাঁহার ভালরকম জানা ছিল বলিয়াই লিখিয়াছেন—

গোসাঞি মোহান্ত যত চোপালাএ চড়িয়া।
বোচকাবুচকি লয় জায় বাহুকে করিয়া।

দেশশুদ্ধ লোক বর্গীর ভয়ে পলাইতে থাকিলেও কেহই তখনো স্বচক্ষে বর্গীকে আসিতে দেখে নাই, সকলেই অপরের পলায়নে পলাইতে ব্যস্ত।

দশ বিশ লোক য়াইসা পথে দাড়াইলা।
তা সভারে সোধাএ বরগি কোথাএ দেখিলা॥
তারা সব বলে মোরা চক্ষে দেখি নাই।
লোকের পলান দেইখা আমোরা পলাই॥

'ছোট বড় গ্রামে যত লোক ছিল' বর্গীর ভয়ে সকলেই এই ভাবে পলায়ন করিল বটে কিন্তু পলাইয়া যাইবে কোথায়?

এই মতে সব লোক পলাইয়া জাইতে।
আচম্বিতে বরগি ঘেরিলা আইসা সাথে॥
মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।
সোনা রূপা লুঠে নেএ আর সব ছাড়া।
কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
একি চোটে কারু বধএ পরাণ।

এইভাবে ধনরত্ন লুণ্ঠন, ঘরবাড়ী ভস্মীভূত করিয়া বর্গীরা গ্রামবাসীদের নিকট অর্থ দাবী করিতে থাকে এবং মনোমত টাকাকড়ি না পাইলে কাহারও নাকের মধ্যে জল ভরিয়া দেয়, কাহারও হাত ধরিয়া পুকুরের মধ্যে ডুবাইয়া রাখে। গঙ্গারাম গ্রামের পর গ্রামে বর্গীদের এই অত্যাচারের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। ইতিহাসেও ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।[১২]

চম্পূ

শ্রীযুক্ত রামচরণ চক্রবর্ত্তী বেনারস হইতে ১৯৪০ সালে "চিত্রচম্পূ" নামক একটি সংস্কৃত কাব্যের পুঁথি সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন। গুপ্তিপল্লীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার এই কাব্যের রচয়িতা। ভূমিকা অংশ হইতে জানা যায় যে, বর্ধমানের তদানীন্তন মহারাজ চিত্রসেনের (১৭৪০-৪৪খৃঃ) নামানুসারে কাব্যের নামকরণ হইয়াছে। চিত্রসেনই এই কাব্যের নায়ক এবং তাঁহার এক কল্পিত মৃগয়াভিযান কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। কাব্যের প্রারম্ভে মহারাজের প্রজাবাৎসল্য, বীরত্ব, রাজ্যপালনে নৈপুণ্য প্রভৃতি গুণের ব্যাখ্যা করিয়া প্রসঙ্গক্রমে মারাঠা সৈন্যদের

১২ Alivardi and His Times—K. K. Dutta, p 7

বাংলা দেশে আগমন এবং অত্যাচার, প্রজাবর্গের ভীতি ও পলায়ন এবং মহারাজ চিত্রসেন কর্তৃক তাহাদের আশ্রয় প্রদানের উল্লেখ আছে।

চিত্রচম্পূ কাব্যটি বাংলা দেশে মারাঠা আক্রমণের অব্যবহিত পরবর্তী এবং মহারাষ্ট্রপুরাণের কিছু পূর্ববর্তী রচনা। কাব্যটির মধ্যে বর্গীর উপদ্রবের কবিজনোচিত সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। সমসাময়িক রচনা হিসাবে ইহা মহারাষ্ট্রপুরাণের সহিত তুলনীয়। বর্গীদের অতর্কিত আগমনে পলায়মান ব্রাহ্মণগণের স্কন্ধোপরি 'লম্বালক' শিশু, গলদেশে দোদুল্যমান আরাধ্য শালগ্রাম শিলা, মনের মধ্যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর 'দুর্বহমহাভার' সঞ্চিত শাস্ত্রগ্রন্থরাশি বিনাশের আশঙ্কা, গর্ভভারালস পলায়মান রমণীদের নিদাঘসূর্যের তাপক্লেশ, পানাহারবঞ্চিত ব্যাকুল শিশুগণের করুণ চীৎকারে ব্যথিত জননীদের আর্তনাদ এবং অসহ্য বেদনায় সমস্ত পৃথিবীকে 'বর্গীময়' বলিয়া ধারণা প্রভৃতি বর্ণনা বাণেশ্বরের রচনার উজ্জ্বলতার পরিচায়ক। গঙ্গারাম অনুরূপ সুললিত ভাষা এবং বিষয়বিন্যাসে চমৎকারিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু উভয়ের প্রদত্ত বিবরণের মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। বাণেশ্বর বরং বর্গীর অত্যাচারে প্রপীড়িত গৌড়জনের অসহায় অবস্থার বর্ণনায় কিছু ভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাই যে কাহিনীকে তিনি কবিত্বসহকারে বর্ণনা করিয়াছেন, গঙ্গারাম (হয়ত অপেক্ষাকৃত কম কবিত্বশক্তির অধিকারী বলিয়াই) ভাবস্রোতে না ভাসিয়া তাহারই একটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, বাস্তব এবং সংহত চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন। মারাঠা শক্তির উদ্বোধক স্বয়ং শিবাজী যুদ্ধের সময় সৈন্যগণকে নারী ও শিশুর প্রতি যেরূপ সংযত আচরণের উপদেশ দিয়াছিলেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মারাঠাবর্গীরা যে তাহা বিস্মৃত হইয়াছিল এই দুই কবির বর্ণিত কাহিনী হইতে তাহা সমর্থিত হয়। অবশ্য বর্গী শব্দটি 'বর্গীর' অপভ্রংশ। ইহা হইতে বুঝা যায় যে ইহারা 'শিলাহদার' শ্রেণীভুক্ত সৈন্য নহে বরং নিম্নশ্রেণীর সৈন্য ছিল এবং ইহাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং অশ্ব নিজেদের সংগ্রহ করিতে হইত। সুতরাং ইহাদের শিলাহদার সমপর্যায়ভুক্ত করা চলে না।[১৩]

বাণেশ্বর ও গঙ্গারাম

মারাঠা সৈন্য ও বর্গী

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, গঙ্গারাম ইতিহাসাশ্রিত ঘটনা বর্ণনা করিলেও স্বীয় কাব্যকে তিনি পুরাণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এতক্ষণ

১৩ The History of Bengal (D. U.) Vol II p 457 fn.

ইতিহাসের ঘটনা বিবৃত করিলেও পুরাণের কল্পনা তাঁহার মন হইতে যে একেবারে অপসৃত হয় নাই পরবর্তী বর্ণনা হইতেই তাহা বুঝা যায়। সুযোগ পাইয়াই তিনি এখানে একটু পৌরাণিক সুর ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন গঙ্গার মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিয়া। বর্গীর আক্রমণবিপর্যস্ত জনসাধারণ গঙ্গা অতিক্রম করিয়া মুর্শিদাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিরাপদ হইয়াছিল। গঙ্গারাম সেই সূত্রে গঙ্গার স্তব করিয়াছেন,---

ত্রেতা যুগে রাজা ভগীরথ ছিলা।
অনেক তপস্যা করি গঙ্গা আনিলা ॥
পৃথিবীতে নাম তার হইল ভাগীরথী।
তার পার হইয়া লোকে পাইলা অব্যাহতি ॥

বর্গীরা পর পর যে সকল গ্রাম দগ্ধ করে গঙ্গারাম তাহাদের যথাক্রমে নামোল্লেখও করিয়াছেন। হুগলী, বর্ধমান, বীরভূমের গ্রাম ভস্মীভূত করিয়া মারাঠারা বিষ্ণুপুরে পৌঁছায় কিন্তু বিষ্ণুপুর তাহারা লুঠ করিতে পারে নাই। গঙ্গারামের ভাষায় —

বনবিষ্ণুপুর গোপাল রক্ষা করে।
য়সাধ্য বরগির তবে কি করিতে পারে ॥

গঙ্গারামের এই বিবরণ ছাড়াও আরো কয়েকটি গ্রাম্য ছড়ায় আমরা মারাঠাদের বিষ্ণুপুরে আগমন এবং বিনা লুণ্ঠনেই ফিরিয়া যাওয়ার কথা পাইয়াছি। সেগুলি পরে আলোচ্য। গঙ্গারামের প্রত্যেকটি বর্ণনার সহিত যে ইতিহাসের হুবহু মিল আছে তাহা নহে। তিনি ভাস্কর পণ্ডিতের দ্বিতীয় অভিযানকেই তাঁহার বাংলা দেশে শেষ অভিযান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই অভিযানকালেই নবাব আলিবর্দী তাঁহাকে ষড়যন্ত্র করিয়া হত্যা করান বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কবির বর্ণনানুযায়ী এই অভিযানে ভাস্কর পণ্ডিত তাঁহার সৈন্যদের ডাকিয়া নির্দেশ দেন যে—

"স্ত্রী পুরুষ আদি করি যতেক দেখিবা।
তলয়ার খুলিয়া সব তাহারে কাটিবা ॥

ভাস্কর পণ্ডিতের এই আদেশ অনুযায়ী মারাঠা সৈন্যগণ ভীষণ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। কবি লিখিয়াছেন যে, সেই পাপেই ভাস্করের নিধন দেবী দুর্গার অভিপ্রেত হইয়া উঠে। তিনি ভৈরবীদের বলেন, অতঃপর 'ভাস্করকে বাম হইয়া নবাবকে সদয় হবি।' গঙ্গারামের বর্ণনানুযায়ী ভাস্কর নবাবের ষড়যন্ত্রে মোনকরা শিবিরে নিহত হইয়াছিলেন একথা সত্য কিন্তু তাহা দ্বিতীয় অভিযানকাল অর্থাৎ ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে নহে। ভাস্কর পণ্ডিতের প্রথম পরাজয়ের পর ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভোসলা স্বয়ং ভাস্করের সহিত বাংলা দেশে উপস্থিত হন। অপরদিকে বাদশাহ মহম্মদ শাহের নিকট

হইতে চৌথ আদায়ের চিঠি পাইয়া বালাজী রাও সসৈন্যে বাংলায় আগমন করেন। বালাজীর আগমনে শঙ্কিত হইয়া রঘুজী সসৈন্যে পলায়ন করেন। নবাব ও বালাজীর সৈন্যদল তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং বালাজী এক যুদ্ধে তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও পরাজিত করেন। রঘুজী কোনক্রমে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন।[১৪] ইহার নয় মাস পরে অর্থাৎ ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে পুনরায় বর্গীর আক্রমণ আরম্ভ হয়। রঘুজী এইবার বিশ হাজার অশ্বারোহী এবং আলিভাই কুরাওয়ালের সহিত ভাস্করকে বাংলা অভিযানে প্রেরণ করেন। এই সময়ে ভাস্করের আর বালাজীর নিকট হইতে পাল্টা আক্রমণের কোনরূপ আশঙ্কা ছিল না কারণ শাহু তাঁহাদের মধ্যে এক আপোষরফা অনুযায়ী উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর পারস্পরিক অধিকারের সীমানা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন।[১৫]

ভাস্কর পণ্ডিতের এই তৃতীয়বার আক্রমণে নবাব অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করিতে থাকেন। আর্থিক দুরবস্থা এবং শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি ক্রমশঃই মারাঠা প্রতিরোধের আশা হারাইতেছিলেন। সেজন্য এই সময়ে তিনি ছলে বলে কৌশলে ভাস্কর দমনে কৃতসঙ্কল্প হন।[১৬] ইহার পর হইতে ভাস্করের হত্যার কাহিনী পর্যন্ত গঙ্গারামের বর্ণনা ইতিহাস-সম্মত। ভাস্করের আগমন সংবাদ পাইয়া নবাব এই সময় মোনকরাতে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। মারাঠাদের বারংবার আক্রমণ এবং লুণ্ঠনে জনগণ যে অতিষ্ঠ হইয়া বর্গী দমনে নবাবের অনুগামী হইয়াছিল গঙ্গারামের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে কি তাহা সমর্থিত হয় ?

> পাল চাই ধুম পইল সহরেতে।
> মুদি বানিঞা চলে নবাবের সাথে।।

কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জনগণের এই সহযোগিতা প্রথমে ভাস্কর পণ্ডিত লাভ করেন। গঙ্গারাম ভাস্করের মাতৃপূজার বোধনে স্থানীয় জমিদার হইতে সাধারণ ব্যক্তি সকলের সহযোগিতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু যে পাপভার লাঘবের দৈবী প্রেরণা মারাঠারা লাভ করিয়াছিল শিবের

---

১৪ Alivardi and His Times—K. K. Dutta. p 86
বাংলার ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী)—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১৫৯

১৫ Alivardi and His Times—K. K. Dutta. p 88

১৬ The History of Bengal (Dacca Univercity)
Vol II Ch XXIV p 460-67

অনুগ্রহে, সেই মারাঠাগণই যখন নির্বিকার চিত্তে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব এবং গো-হত্যা করিতে আরম্ভ করিল তখন পার্বতী রুষ্টা হইয়া বলিলেন—

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হিংসা দেখিবারে নারি।
এতেক কহিয়া তবে রূসিলা শঙ্করী ॥
ভৈরবি জোগনী জত নিকটে ছিল।
জোড়হস্ত কৈরা তারা ছমুতে ডাডাইল।
তবে দুর্গা কহে সুন জতেক ভৈরবী।
ভাস্করকে বাম হইয়া নবাবকে সদয় হবি ॥

নবাব ও মারাঠাদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণ সূত্রে গঙ্গারাম এইভাবে দেবতাদের প্রভাব বিজড়িত করিয়া পৌরাণিক কাব্যের সুর অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

বর্গীর আক্রমণের বিভিন্ন ছড়া

মহারাষ্ট্রপুরাণ ব্যতীত মারাঠাদের বিষ্ণুপুর আক্রমণ এবং তথা হইতে পশ্চাদপসরণের বিবরণ দুইটি ছোট-বড় ছড়ার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে সঙ্কলিত হইয়াছিল।[১৭] ছড়ার রচয়িতা অথবা রচনাকাল কিছুরই উল্লেখ নাই। ছড়াটি আক্রমণ-উদ্যত মারাঠাদের বিষ্ণুপুর হইতে ব্যর্থমনোরথে প্রস্থানবিষয়ক। কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনাসূত্র ছড়াটির মূল্যবৃদ্ধি করিয়াছে। ছড়ার রচয়িতা লিখিয়াছেন যে, মারাঠাদের গড়ে প্রবেশ করিবার কথা শুনিয়াও বনবিষ্ণুপুরের রাজা নিশ্চিন্ত মনে মদনমোহনদেবের উপর রাজ্য রক্ষার দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া সকলকে উচ্চৈঃস্বরে নামসঙ্কীর্তন করিতে আদেশ দেন।

রাজা বলে শুন গোলন্দাজ বলিরে বচন।
আমাদের কিছু আর নাই আছেন মদনমোহন।
সহরেতে ঢেডঁরা দিল রাজা প্রজার ঘরে ঘরে ॥
ঘরে ঘরে নামসঙ্কীর্তন তোমরা করগে উচ্চৈঃস্বরে ॥

এই বর্ণনা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সেই সময় বিষ্ণুপুর বৈষ্ণব ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠে—নচেৎ শত্রু সৈন্য রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে শুনিয়াও বনবিষ্ণুপুরের ন্যায় দুর্ধর্ষ মল্লভূমের রাজা প্রতিরোধের কথা ভুলিয়া সকলকে মদনমোহনদেবের শরণাপন্ন হইতে বলিতেন না।

রতন কবিরাজ লিখিত 'মদনমোহনের বন্দনা' নামক ১২২৯ সালের একটি অসম্পূর্ণ পুঁথির[১৮] মধ্যেও মল্লভূমের রাজা গোপালসিংহের রাজ্যকালে বর্গীর আক্রমণ এবং রাজার মদনমোহন

১৭ বঙ্গদর্শন, নবম খণ্ড
১৮ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ৩৫৬৬

দেবের উপর নির্ভর করিয়া হরিণামের মালা জপ করিবার কথা আছে। ছড়ার রচয়িতা লিখিয়াছেন যে, ভাস্করের আগমনে বিভিন্ন রাজ্যের রাজা এবং প্রজাগণ পলাইতে লাগিলেন কিন্তু মল্লবর গোপাল-সিংহ জপমালা হস্তে ধ্যানে বসিয়া রহিলেন—

সকল পলায় রাজা দেসান্তরি হল প্রজা কেবল অটল মল্লবর।
হরিনামের মালা হাতে সদাই মগন তাথে বসি আছে পাটের উপর॥

গোপালসিংহের রাজত্বকাল ১৭১২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দেই বাংলা দেশে বর্গীর হাঙ্গামা ঘটে। ছড়া বচয়িতার বর্ণনানুযায়ী মারাঠা আক্রমণের সংবাদ শুনিযা রাজা যেমন সকলকে সঙ্কীর্ত্তনেব আদেশ দিলেন অমনি—

বাবু ভেযে চাকর নফর তাবা হেতের ফেলিল।
জয় জয় মদনমোহন বলে নাচিতে লাগিল॥
অন্তর্যামী মদনমোহনলাল জানিলেন অন্তবে।
রাজায প্রজায ভাব দিযেছে বর্গী তাড়াবার তবে॥

রাজায প্রজায এই ভাবে বর্গী বিতাড়নেব ভাব তাঁহাকে অর্পণ কবিলে—

দুইপ্রহর বেলা যথন ভাই গগনে লাগিল।
নীল জামাযোড়া পরিধান প্রভু ঘোড়ায় সওয়ার হোল॥

তারপর শ্বেত অশ্বে আবোহণ করিযা প্রভু সকলেব অলক্ষ্যে শাঁখারি বাজারেব মধ্য দিযা অশ্বধাবন কবিলেন। লোকে প্রভুকে দেখিতে না পাইলেও প্রভুব ঘোড়াকে যাইতে দেখিযা তাহা ধরিবাব জন্য পশ্চাদ্ধাবন করিল কিন্তু 'কার সাধ্য ঘোড়া ধরে প্রভু আছেন উপবে।' মারাঠাগণ কিন্তু প্রভুর দর্শন লাভ করিল। ছড়া রচয়িতা এইখানে শ্রীমদ্ভাগবতের 'মল্লানামশিনৃর্ণাং নরবর' শ্লোকের অনুসরণে প্রভুর মায়ার বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর প্রভু স্বহস্তে কামানে অগ্নি সংযোগ করিলেন এবং মারাঠাগণ ধানগড়ার মাঠে গোলার আঘাতে মারা পড়িতে লাগিল। এই অবিশ্বাস্য ঘটনা শুনিয়া রাজা স্তম্ভিত। তিনি 'চার ঘাটের সাতশত গোলন্দাজকে' ডাকিয়া কে এই কামান ছুঁড়িয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ভাল-বোরজের গোলন্দাজ আসিয়া সাক্ষী দিল—

যখন বর্গী এসে খানা কাটে রাজা হলাম নিরানন্দ।
ভাবতে ভাবতে মুচ্চার পাড়ে পেলাম কৃষ্ণ-অঙ্গের গন্ধ॥

তেমনি সময় ছুটি নয়ন অন্ধ হইল শুন হে রাজন।
এমন সময় শব্দ পেলাম রাজা করি নিবেদন ॥

কবি রাজার প্রশস্তি সহকারে লিখিয়াছেন, বিষ্ণুপুরের মহারাজার দেব অংশে জন্ম, তাই তিনি এই অলৌকিক ঘটনার মর্ম বুঝিতে পারিয়া খোল সম্প্রদায়ের সহিত কীর্তন করিতে করিতে প্রভুর মন্দিরে গমন করিলেন। মন্দিরের কপাট উন্মোচনে দেখা গেল প্রভুর অঙ্গে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম, হস্তে বারুদ এবং পদযুগলে ধুলার চিহ্ন। পরিশেষে কবি খেদ করিয়াছেন যে—

আর কি আসিবে এমন দিন কি হবে মদনমোহনলাল।
তোমার গড়ের ভিতর দিয়ে ইংরেজ বেন্ধেছে জাঙ্গাল ॥

কবির এই খেদোক্তি হইতে অনুমান করা যায় যে, বিষ্ণুপুরে ইংরেজ-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ছড়াটি রচিত হয়। রতন কবিরাজের এই পুঁথিটিতে আরও কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। বর্গীর আক্রমণ ব্যতীতও রতন কবিরাজ আরও কয়েকদলের বিষ্ণুপুর আক্রমণ এবং মদনমোহনের মহিমায় পরাজয়বরণের বিবরণ দিয়াছেন।

আর এক মহিমা শুন কীর্তিচন্দ্র আইল পুন।
হাজার পাঁচ ছয় ঘোড়া সঙ্গে কর‍্যা।
লইয়া সকল ফৌজে মাস দুই তিন যুঝে
নিরবধি গড়-কোট ঘের‍্যা ॥
করিয়া গমন ফন্দি রসদ করিয়া বন্দি
তুলে কামান গাছের উপরে।
খানাতে সুলুঙ্গ কাটে কড়াকাড় নাই আটে
তবু কিছু করিতে না পারে ॥ ......

জাফরখাঁ জমাদার মার-গেল ভাগিনা তার
তথাপি ফিরিয়া নাহি চায়।
নিশিতে শয়নে থাকি প্রভুক স্বপনে দেখি
হাঁসা ঘোড়া নীল জামা গায় ॥
প্রভুর কৃপায় জানি গড় পরাজয় মানি
নিশি শেষে পলায় সত্বরি। ......

সুজাদি আইল চড়ি সঙ্গে ফোজ হাজার কুড়ি
আইল ফোজ বিলাত লুটিআ।
প্রভুর মহিমা পায়্যা রাজার সিরপা দিয়া
ফিরিয়া গেলেন তিনি ঘরে ॥

ছড়ার উল্লিখিত নামগুলির ঐতিহাসিকত্ব নির্ণয়সূত্রে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ পালিত লিখিয়াছেন—কীর্তিচন্দ্র সম্ভবতঃ বর্ধমানের রাজা হইবেন। বর্ধমান-রাজ পূর্বেই মুসলমানদের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুররাজ প্রথম রঘুনাথের মুসলমানগণ কর্তৃক কৌশলে বন্দী হওয়ার কথা শুনিয়াছি। এখানে দেখি শাসুজা বিষ্ণুপুররাজকে 'শিরপাও' দিয়াছিলেন।[১৯] ছড়াটির মধ্যে একস্থানে গোপালসিংহের অনুচর হিসাবে গণিতবিদ্ শুভঙ্করের উল্লেখ পাওয়া যায়। শুভঙ্করেব বিষ্ণুপুর রাজসভায় উপস্থিতি সম্পর্কে নানা মত আছে। কাহারও মতে শুভঙ্কর গোপাল সিংহের অমাত্য ছিলেন, কাহারও মতে চৈতন্যসিংহেব। বিষ্ণুপুর রাজ্যের ইতিহাস প্রণেতা অভয়পদ মল্লিক এই উভয মত খণ্ডন না করিলেও মল্লরাজসভায কোন এক সময শুভঙ্কর রাজ্যের শাসনপরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিযাছেন—Shuvankara (there is a dara i.e, a canal in Mallabhum named Shuvankara's Dara) the arithmatecian whose Mathematical devices are still memorised by pathsala boys was an administrator in the court of the Malla kings.[২০]

'কলন্দর', 'তারাচাঁদ' প্রভৃতি কয়েকটি নামের ঐতিহাসিকত্ব নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। রতন কবিরাজ প্রসঙ্গক্রমে মদনমোহন সম্বন্ধেও কিছু নূতন বিবরণ প্রদান করিয়াছেন এবং মদনমোহন কিজন্য বাঁকা-মদনমোহন হইলেন তাহার কারণও ব্যক্ত করিয়াছেন।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন গোপালসিংহের পরবর্তী রাজা চৈতন্যসিংহের সময়েই (১৭৪৮-১৮০২ খৃঃ) বর্গীর হাঙ্গামা ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।[২১] কিন্তু বিষ্ণুপুরে প্রথম বর্গীর আক্রমণ যে অত পরবর্তী

---

১৯ 'বিষ্ণুপুরের ইতিহাসের কয়েকটি নূতন অধ্যায়'
—প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৪১

২০ History of Bishnupur Raj—A. B. Mullick, p. 115

২১ বৃহৎবঙ্গ—২য় খণ্ড পৃ ১১১৭

কালে হয় নাই মহারাষ্ট্রপুরাণের আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা তাহা ব্যক্ত করিয়াছি। এই ছড়াটিতেও মল্লরাজার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহার সহিত গোপালসিংহেরই সাদৃশ্য বেশি বলিয়া মনে হয়। শত্রুর আক্রমণের সংবাদে গোপালসিংহই নির্বিকার চিত্তে প্রজাদের নাম সঙ্কীর্তনের আদেশ দিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই বৈষ্ণবপ্রীতির আধিক্যবশেই প্রজাসাধারণকে 'গোপালসিংহের বেগার' খাটিতে হইত।

অপর একটি খণ্ডিত ছড়ার [২২] মধ্যে বাংলা দেশে মারাঠাদের আগমনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ছড়াটিতে বর্গী-ভীতি এবং পলায়নের বর্ণনার মধ্যেও অনেক নূতন কথা আছে। ছড়াটির অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল।

বিরভম থাক্যা আইল বরগি বদ্ধমানে থানা
বৰ্দ্ধমান ছাড়িয়া হুগলি আইল কথো জনা।
ফজতুর সে ছমান পলায় আর পলায় ফরাস
এনেসাল ওলোন্দাজ পলায় পাইয়া তরাস।
কলিকাতায় ডিঙিরাজ পলায় আর পলায় খাস ?
বরগিরে দেখিয়া তারা না করে বিশ্বাস।
হুগলীর কোঠে আস্তার·· অছা কামানি
মির হবিব সনে বর্গি করিছে মেলানি।
কেহ বলে নৈতন ফজুদর আসিছে মোর দেসে
মিলন করিতে কেহ জায় তার পাসে।
কানানৈ দিয়া হুগলির ফৌজে আস্তে বর্গির পাল
বর্গি দেখ্যা লোকে জত কাপে হালেহাল।
বর্গি সকল জখন আস্যা হবে এগস্তর
কাঙ্গাল গরিব মার্য্যা ঘুচাবে লুটিবে সহর।

ছড়াটি এইটুকুই পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে মির হবিবের সহিত বর্গীদের যোগাযোগের উল্লেখ রহিয়াছে। এসম্পর্কে আমরা পূর্বে মহারাষ্ট্রপুরাণপ্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি।

বাংলা দেশে বর্গীর আক্রমণের নৃশংসতা মানুষের মনে এত বেশি আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল যে, দুষ্ট ছোট শিশুও বর্গীর নামে চক্ষু বুজিত। সেই

২২ বিশ্বভারতী পুথি ৪৫৩৯ (শ্রীপঞ্চানন মণ্ডলের সৌজন্যে)

সময় হইতে সুষ্ট শিশুর নিদ্রাকর্ষণের বহুশ্রুত ছড়াটি আজিও বাংলার ঘরে ঘরে মাতৃকণ্ঠে শোনা যায়—

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে।
চড়াই পাখীতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।
নাড়া কেটে ভাড়া দেব থাক্‌গে জমিদার বসে॥

এই ছড়াটির স্বল্প পরিসরের মধ্যে কবিত্বের কোন অবকাশ নাই কিন্তু দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, রাজস্ববিপ্লব এবং আর্থিক দুরবস্থার ইহা এক সমুজ্জ্বল চিত্র। বর্গীর কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জমিদারের অত্যধিক খাজনার দাবী, প্রজার দুর্গতি, শস্য-বিপর্যয় প্রভৃতি দেশব্যাপী উপপ্লবের সকল আভাসই এই ছোট ছড়াটির মধ্যে রহিয়াছে।

অন্নদামঙ্গল

মহারাষ্ট্রপুরাণ ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। পরবর্তীকালে বাংলা দেশে মারাঠা আক্রমণের পুনরায় উল্লেখ পাই আমরা ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" কাব্যে। বলাবাহুল্য ভারতচন্দ্র মহারাষ্ট্রমঙ্গল রচনা করিতে মনঃস্থ করেন নাই, অন্নদামঙ্গল গান তথা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বংশ-মহিমা কীর্তনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তথাপি গ্রন্থসূচনায় কার্যকারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কবি আলীবর্দী-মারাঠা বিসংবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। কাব্যের রচনাসমাপ্তিকাল [২৩] হইতে জানা যায় যে, তিনি ১৬৭৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে কাব্য রচনা করেন। সমসাময়িক ঘটনার বিবরণ হিসাবে কবি মোগল-মারাঠা সংঘাতক্ষুব্ধ দেশের যে রাজনৈতিক পরিবেশের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা তৎকালীন অরাজকতার পরিচায়ক।

রাজনৈতিক পরিবেশ

সুজা খাঁ নবাব সুত সরফরাজ খাঁ।
দেওয়ান আলমচন্দ্র রায় রায়রাঁয়া॥
ছিল আলিবর্দি খাঁ নবাব পাটনায়।
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায়॥
তদবধি আলিবর্দি হইলা নবাব।
মহাবদজঙ্গ দিলা পাতসা খেতাব॥
কটকে মুরসীদ কুলি খাঁ নবাব ছিল।
তারে গিয়া আলিবর্দি খেদাইয়া দিল॥

২৩ বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্মা নিরূপিলা। সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা।
—অন্নদামঙ্গল

কটকে হইল আলিবর্দ্দির আমল।
ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল॥
নবাব সৌলদজঙ্গ রহিলা কটকে।
মুরাদবাখর তারে ফেলিল আটকে॥
লুঠি নিল নারী গারী দিল বেড়ি তোক।
শুনি মহাবদজঙ্গ চলে পেয়ে শোক॥
উত্তরিল কটকে হইয়া ত্বরাপর।
যুদ্ধে হারি পলাইল মুরাদবাখর॥
ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুঠিয়া পুড়িয়া॥

ভারতচন্দ্র প্রদত্ত এই বিবরণ প্রায়শই ইতিহাসানুগ। কবি নবাব আলীবর্দীর মহাবৎজঙ্গ খেতাব লাভের কথা লিখিয়াছেন। মারাঠা ইতিহাসেও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৪] কিন্তু ইহার পর ভারতচন্দ্র গ্রন্থোৎপত্তির কারণস্বরূপ উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর প্রদেশে মোগল সৈন্যের অত্যাচারের বিশদ বর্ণনা দিয়া লিখিয়াছেন যে, ইহার ফলে আলীবর্দীর উপর শিব ও নন্দী ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য নন্দী ত্রিশূল ক্ষেপণে উদ্যত হইলে শিব তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া বর্গীর রাজাকে স্বপ্নে যবননিধনের আদেশ দিলেন। আলীবর্দী কর্তৃক উড়িষ্যায় অত্যাচারের যে বর্ণনা ভারতচন্দ্র এখানে দিয়াছেন তাহার সত্যতা সম্বন্ধে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন।[২৫] মহারাষ্ট্রপুরাণের আলোচনা সূত্রে

---

২৪ · Aliwardi was a Turk who had come to India and accepted service in Bengal in 1726. He earned the good opinion of the court of Delhi by his work and the emperor conferred on him the title of Mahabat Jang, by which name he is known in the Marathi papers.
New History of the Marahatas—G.S. Sardesai. p 211.

২৫ Bharatchandra was a Brahman court-poet of the orthodox Brahman zamindar Krisnachandra of Nadia, who had been made a captive by Alivardi on his failure to pay him 12 lacks of rupees demanded as nazarana. So his statements may have been coloured by a narrow kind of patriotism.
Alivardi and His Times—K.K. Dutta. p 58

ভারতচন্দ্রের এই অভিযোগ সম্বন্ধে আমরা প্রাসঙ্গিক আলোচনা করিয়াছি। অবশ্য স্বয়ং আলীবর্দী কর্তৃক এই অত্যাচার না হইলেও ইহা আদৌ কাল্পনিক নাও হইতে পারে। আলীবর্দী প্রথমবার কটকে আসিয়া মুর্শিদকুলি খাঁকে স্থানচ্যুত করিয়া স্বীয় জামাতা সইদ আহম্মদকে কটকের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া যান। এই সইদ আহম্মদের অসদাচরণই জনগণকে অসন্তুষ্ট এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বাকর খাঁর সমর্থক করিয়া তোলে। ভারতচন্দ্রের বর্ণনানুযায়ী উড়িষ্যা লুণ্ঠন না করিলেও তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র ও জামাতা সইদ আহম্মদ এবং তাঁহার অনুচরবর্গ কম অত্যাচার করেন নাই। 'তারিখ ইউসুফী'র ব্যাখ্যাতা গোলাম হোসেনও অনুরূপ অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন।

উড়িষ্যায় যবন

মারাঠা সৈন্যের বাংলা দেশ অভিযানের বর্ণনায় ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতিআকৃতি॥

বর্গী অভিযান

এই বর্গী ও মহারাষ্ট্র সমার্থবোধক, কিন্তু সৌরাষ্ট্র হইতেও কি সৈন্য আসিয়াছিল? অতঃপর ভাবতচন্দ্র বর্গীর অত্যাচারের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার সহিত মহারাষ্ট্রপুরাণ এবং সমসাময়িক কালে সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'চিত্রচম্পূ' কাব্যের বর্ণনাগত সাদৃশ্য আছে।

লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী॥

বর্গীর অত্যাচারের এই বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হইলেও বেশ উজ্জ্বল এবং ইতিহাস-সম্মত। আলীবর্দীর পাপের ফল বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন—

লুঠিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী।
সেই পাপে তিন সুবা হইল নারকী॥
নগর পুড়িলে কি দেবালয় এড়ায়।
বিস্তর ধার্মিক লোক ঠেকে গেল দায়॥

ভারতচন্দ্রের ভাষায় ধার্মিক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকেও এই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কারাবাস করিতে হইয়াছিল—

দেবীপুত্র বলি লোক যার গুণ গায়।
এই পাপে সেহ রাজা ঠেকিলেন দায়॥

মহাবদজজ তারে ধরে লয়ে যায়।
নজরানা বলে বার লক্ষ টাকা চায়॥
লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ।
সাজোয়াল হইল সুজন সর্ব্বভক্ষ॥

নবাব আলীবর্দী খাঁ বর্গীর আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহার্থে নজরাণা স্বরূপ সময়ে সময়ে রাজশাহী, দিনাজপুর ও নবদ্বীপের জমিদারগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেন। 'নদীয়া কাহিনী' এবং 'বাংলার ইতিহাসে'ও ইহার উল্লেখ আছে। জানা যায়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৈতৃক বাকী রাজস্ব দশ লক্ষ টাকা এবং নজরাণার দুই লক্ষ টাকা প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় তৎকাল প্রচলিত নিয়মে তিনি মুর্শিদাবাদে নিজ বাটীতে নজরবন্দী থাকেন।[২৬] রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নজববন্দী থাকিবার কারণ হিসাবে ভারতচন্দ্র পাপের প্রায়শ্চিত্তের অজুহাত দিলেও তাহার প্রকৃত কারণ ইহাই। তদ্ব্যতীত পাপীর পাপে পুণ্যবান ধার্মিক ব্যক্তি পাপীর হস্তেই দুর্ভোগ সহ্য করিবেন—ভারতচন্দ্রের এই যুক্তিও অভিনব! ইহার পরবর্তী ছত্রেই আছে যে, রাজার প্রতিশ্রুত অর্থ সর্বভক্ষ সুজন সাজোয়াল আত্মসাৎ করিয়াছিল। এই সুজন সাজোয়াল শুধু রাজার অর্থই নহে, বর্গীদের ন্যায় প্রজার বিত্তও যে সমভাবে লুণ্ঠন করিয়াছিল ভারতচন্দ্র তাহাও উল্লেখ করিযাছেন—

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র

বর্গিতে লুঠিল কত কত বা সুজন।
নানা মতে রাজার প্রজার গেল ধন॥

তৎকালীন দেশব্যাপী অরাজকতার সুযোগে সাজোয়ালদের অর্থ গৃধ্নুতার ফলে প্রজার দুর্গতির সীমা ছিল না। 'সাজোয়াল' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী লিখিযাছেন—সাজোয়াল শব্দের অর্থ সেই সরকারী কর্মচারী, যে সরকারেব তরফ থেকে খাজনা আদায় করে। এই সুজন সাজোয়ালটি যে কে, তা জানিনে, কিন্তু সেকালে অমন সুজন দেদার মিলিত এবং এই সব সুজনের হাত থেকে প্রজাকে রক্ষা করা জমিদারের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার অন্যতম কারণ।[২৭]

সাজোয়াল

২৬ কৃষ্ণচন্দ্র পৈতৃক রাজস্ব বাকী দশলক্ষ ও এই নজরাণার জন্য কিয়ৎকাল তৎকাল প্রচলিত নিয়মে কারারুদ্ধ অর্থাৎ নজরবন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে নিজ বাটীতে থাকিতে বাধ্য হন।
বাংলারইতিহাস—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।
নদীয়া কাহিনী—কুমুদনাথ মল্লিক পৃ ৪৫

২৭ রায়তের কথা—প্রমথ গ্রন্থাবলী পৃ ৩০৫

পাঠান রাজত্বকালে ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে দেশত্যাগ করিতে হইয়াছিল। প্রায় দুই শত বৎসর পরে ভারতচন্দ্রও অনুরূপ এক অরাজক যুগের চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন। রামচন্দ্র নাগের অত্যাচারে অতিষ্ঠ কবি সংস্কৃত ভাষায় শিখরিণী ছন্দে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট 'নাগাষ্টক' লিপি প্রেরণ করেন।

কবি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার এক বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে পণ্ডিত ব্যক্তি, সঙ্গীতজ্ঞ, নর্তক, কবি, ধর্মবেত্তা, জ্যোর্তিবিদ্, হাস্যরসিক, রাজ-পার্শ্বচর, অস্ত্রশিক্ষক প্রভৃতির এক দীর্ঘ তালিকা প্রদান করিয়াছেন। 'ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত' এবং 'নদীয়া কাহিনীর' মধ্যেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, তিনি কালিদাস সিদ্ধান্ত নামক এক পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র, কালোয়াৎ বিশ্রাম খাঁর নিকট সঙ্গীত শাস্ত্র এবং মুজাফর হুসেনের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।[২৮]

বিদ্যাসুন্দর কাব্য

"অন্নদামঙ্গলের"র 'বিদ্যাসুন্দর' অংশে কবি সংক্ষেপে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের সৈন্যবল, পরাক্রম, বিভিন্ন সামন্ত রাজা কর্তৃক প্রতাপাদিত্যের অধীনতা স্বীকার এবং প্রতাপাদিত্য কর্তৃক পিতৃব্য বসন্তরায়ের হত্যা ও বাদশাহের আদেশে তৎপুত্র কচুরায়ের সহিত রাজা মানসিংহের প্রতাপাদিত্য দমনে বাংলায় আগমনের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতাপাদিত্য দমনে মানসিংহ বাংলায় আগমন করেন—ভারতচন্দ্রের এই উক্তি অনৈতিহাসিক। অবশ্য প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের অন্যান্য সকল উক্তিই ইতিহাসবিরুদ্ধ বলা যায় না। প্রতাপাদিত্যের সৈন্যবলের বর্ণনায় ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাতি
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।

প্রতাপাদিত্য

আসফ খাঁ ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া আগ্রা হইতে আগমন করেন। আবদুল লতিফ তাঁহার অনুচর ও সঙ্গী ছিলেন। লতিফের ভ্রমণ বৃত্তান্তে সমসাময়িক বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—এই প্রতাপাদিত্যের মত সৈন্য ও অর্থবলে বলী রাজা আর বঙ্গদেশে নাই। তাঁহার যুদ্ধ সামগ্রীতে পূর্ণ প্রায় সাত শত নৌকা, বিশ

২৮ নদীয়া কাহিনী—কুমুদনাথ মল্লিক পৃ ২৯৩

হাজার পাইক (পদাতিক সৈন্য) এবং ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের রাজস্ব আছে।[২৯] একেবারে বাহান্ন হাজার ঢালী না থাকিলেও তাঁহার সৈন্য সংখ্যা বড় কম ছিল না। প্রতাপের পরাক্রমের উল্লেখ অন্যত্রও পাওয়া যায়।

Raja Pratapaditya of Jessore was known to all as one of the most powerful zamindars of Bengal of this age. The Baharistan and the travel-diary of Abdul Latif and the contemporary European writers, particularly the Jesuits, all testify to his personal ability, political pre-eminence, material resources and martial strength particularly in war-boats.[৩০]

ভারতচন্দ্রের কাব্যে আছে যে, মানসিংহ বাংলায় আসিলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধে মানসিংহকে তথ্য ও রসদাদি সরবরাহ করিয়া সাহায্য করেন।

মানসিংহ বাঙ্গালার যত যত সমাচার
মজুন্দারে জিজ্ঞাসিয়া জানে।

মানসিংহের বাংলা অভিযানকালে ভবানন্দ মোগল সম্রাটের অধীনে দুই তিনটি পরগণার জমিদার এবং হুগলীর কানুনগো ছিলেন। সুতরাং ভারতচন্দ্রের বর্ণনানুযায়ী মানসিংহকে অভ্যর্থনা করিয়া ভবানন্দ সময়োচিত কার্যই করিয়া থাকিবেন। তদ্ব্যতীত ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির অভিলাষও যে তাঁহার ছিল না তাহাও বলা শক্ত, কারণ শুধু ভবানন্দই নহেন, সেই সময় বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার এবং বাঁশবেড়িয়ার রাজাদের পূর্বপুরুষ জয়ানন্দ মজুমদারও মানসিংহের সহায়তা করিয়া এরূপ পুরস্কৃত হইয়াছিলেন যে, এই তিন মজুমদার বাংলাদেশকে ভাগবাটরা করিয়া লন বলিয়া এক প্রবাদ সৃষ্টি হয়।[৩১]

মানসিংহ কাব্য

অন্নদামঙ্গলের তৃতীয়াংশ "মানসিংহ" কাব্যে মানসিংহের যশোহর যাত্রা, দেবীমাহাত্ম্যে ভবানন্দের সহায়তায় প্রতাপাদিত্যের পরাজয় সাধন, ভবানন্দের দিল্লী যাত্রা, দিল্লীর পাতশার হিন্দু দেবদেবীর নিন্দা, মজুমদারকে কারাগারে প্রেরণ এবং পরিশেষে দেবীর দয়ায় মুক্তি ও রাজ

২৯ আবদুল লতিফের ভ্রমণ বৃত্তান্ত—প্রবাসী আশ্বিন ১৩২৬
৩০ The History of Bengal (D. U.) Vol II p 237
৩১ বৃহৎবঙ্গ—দীনেশচন্দ্র সেন, ২য় খণ্ড পৃ ৭৯৫

উপাধি প্রদান প্রভৃতি ঘটনার বর্ণনায় প্রচলিত জনশ্রুতি ও ভারতচন্দ্রের কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। তৎকাল প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী ভারতচন্দ্রও লিখিয়াছেন যে, রাজা মানসিংহ যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন এবং লৌহ-পিঞ্জরে করিয়া দিল্লী লইয়া যান। পথিমধ্যে কাশীধামে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হয়। কিন্তু অধুনা নানা তথ্য আহরণে স্থির হইয়াছে যে, বহু প্রচলিত এই প্রবাদ ভিত্তিহীন। ইতিহাস হইতে জানা যায়, মানসিংহ আকবরের রাজত্বকালে ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন এবং ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যু পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। জাহাঙ্গীর সম্রাট হইবার পর তাঁহাকে (১৬০৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর) ঐ পদে বহাল রাখিয়া রাজধানী হইতে বাংলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই (১৬০৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই-আগষ্ট মাসে) তাঁহাকে অপসারণ করিয়া কুতবদ্দীন খাঁকে তৎস্থলে নিযুক্ত করেন। অথচ প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ পাওয়া যায় ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পর হইতে। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ফার্সী ভাষায় লিখিত দুইটি মূল্যবান পুস্তক হইতে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন। আবদুল লতিফের ভ্রমণকাহিনীর মধ্যেও প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ আছে। লতিফ ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খাঁর সহিত গুজরাট হইতে বাংলায় উপস্থিত হন। তাঁহার ভ্রমণকাহিনীর উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পে লিখিয়াছেন যে, এই প্রচলিত কথা সত্য নহে এবং প্রতাপাদিত্য সশরীরে ১৬শে এপ্রিল ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার নূতন সুবাদার ইসলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং কয়েকদিন পরে নিজ দেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি লাভ করেন।[৩২] তিনি আরো লিখিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে "বহার-স্তান-ইঘাইবী" নামক যে হস্তলিখিত পুঁথিটি তিনি পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যেও প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে অনুরূপ উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ হইতে জানা যায়, "প্রতাপাদিত্যের দূত শেখ বদী ঐ রাজার কনিষ্ঠপুত্র সংগ্রাম-আদিত্যকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া [রাজমহলে] নবাব ইসলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করাইল" (১৬০৮খৃষ্টাব্দের শেষাংশে)। প্রতাপাদিত্য

৩২ প্রবাসী কার্ত্তিক-১৩২৭

স্বয়ং ১৬০৯খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নাটোর শহর হইতে ১৫ মাইল উত্তরে বজ্রপুরে "ইসলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন ॥"৩৩

ইতিহাস হইতে আরো জানা যায়, প্রতাপাদিত্য প্রথমবার 'সন্ধা' যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জয়লাভের আশায় আর একবার যুদ্ধ করেন কিন্তু এই যুদ্ধেও পরাজিত হইয়া মোগল সেনাপতি খিযাস খাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। খিযাস খাঁ প্রতাপাদিত্যকে ঢাকায় সেনাপতি ইসলাম খাঁর নিকট লইয়া যান কিন্তু সেনাপতি ইসলাম খাঁ তাঁহাকে শৃঙ্খলা-বদ্ধ করিয়া রাখেন এবং যশোহর রাজ্য বাদশাহের অধিকারভুক্ত করিয়া লন। ইসলাম খাঁ কর্তৃক প্রতাপাদিত্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা এবং কাশীতে তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কে শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার লিখিয়াছেন—প্রতাপকে কি লোহার খাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল? অসম্ভব নয়, কারণ ঠিক এই সময় ঢাকা দুর্গের দুইজন বন্দী পাঠান জমিদার রক্ষীকে ধুতুরা মিশ্রিত রুটী ও হালুয়া খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া কারাগার খুলিয়া রাত্রে বাহির হইয়া, নদীতে প্রস্তুত নৌকায় চড়িয়া পলাইয়া যায়। তাহার পর ইসলাম খাঁ নিশ্চয়ই কারাগারের বন্ধন কঠিনতর করেন। এইসব ঘটনার বৎসর পরে ইসলাম খাঁর পুত্র হুশঙ্গ পরাজিত আফ্গান (ওসমান্ খাঁ), বঙ্গীয় জমিদারগণ. ও মগরাজা হইতে গৃহীত মূল্যবান লুটের সামগ্রী হাতী এবং কয়েকজন মগ সঙ্গে লইয়া আগ্রা গিয়া (১৬১৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে) পিতার এইসব বিজয় উপঢৌকন বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সম্মুখে স্থাপন করেন। প্রতাপ তাহাদের মধ্যে ছিলেন না। (ইকবলনামা, ৬৯ পৃঃ) সুতরাং তিনি কাশীতে যে মারা যান এ প্রবাদ সত্য হইতে পারে। বাঙ্গালায় তাঁহার স্থান ছিল না।৩৪

প্রতাপাদিত্য-বিজয়কাহিনী বর্ণনা করিয়া ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, মানসিংহ ভবানন্দকে তাঁহার সহিত দিল্লী যাত্রা করিতে বলেন—

পাতশার হুজুরে আমার সঙ্গে চল।
পাতশার সহিত সাক্ষাৎ মিলাইব।
রাজ্য দিয়া ফরমানী রাজা করাইব॥

---

৩৩ প্রবাসী আশ্বিন ১৩২৬
৩৪ প্রবাসী কার্ত্তিক ১৩২৭

এখানে ফরমান সম্বন্ধে এর বেশি আর কিছু না বলিলেও ভারতচন্দ্র মজুমদারের রাজ্যসীমার উল্লেখ করিয়াছেন—

বরপুত্র অন্নদার ভবানন্দ মজুন্দার
রাজা হৈল বাগুয়ান মাঝেরে।

মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক স্বাক্ষরিত যে দুইটি ফরমান কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে আছে তন্মধ্যে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দ তারিখ সম্বলিত প্রথম ফরমানটিতে মানসিংহ কর্তৃক ভবানন্দকে মাহ্‌মুদপুর নামক পরগণা প্রদানের উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় নলিনীকান্ত ভট্টশালী এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভবানন্দ তাঁহার জমিদারী সংলগ্ন এই সাধারণ জনবিরল পরগণাটি স্বাভাবিক ভাবেই পাইয়াছিলেন এবং এইজন্য প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন সাহায্যদানের কথার আবশ্যক হইতে পারে না।[৩৫] কিন্তু প্রতাপাদিত্য দমনে সহায়তা (ভারতচন্দ্রের বর্ণনানুযায়ী) করার জন্য না হইলেও সাধারণ এবং জনবিরল স্থান বলিয়াই বা ভবানন্দ বিনা কারণে জমিদারী সংলগ্ন পরগণা লাভ করিবেন কেন? মানসিংহ প্রত্যুপকারবশত যদি ভবানন্দকে পরগণা দান করিয়া থাকেন তাহা অকারণ বলা যায় কি? ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় ফরমানটির তারিখ ১৬১৩খৃষ্টাব্দ, সুতরাং তাহা মানসিংহের সময়ে নহে, ইসলাম খাঁর সময়ে। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, প্রতাপাদিত্য দমনে ভবানন্দের রাজ্য বাগুয়ানের উপর দিয়া ইসলাম খাঁ বাহিনী চালনা করেন। তিনি ভবানন্দের নিকট হইতে কোনরূপ বিরোধিতা পাইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না, বরং তাঁহার পক্ষে ভবানন্দের সাহায্যলাভই স্বাভাবিক এবং এই সাহায্যের প্রত্যুপকার স্বরূপ ফরমানদানের ব্যবস্থাও অসম্ভব নহে।

ভবানন্দ

যশোহর আক্রমণ করিবার পূর্বে মানসিংহ কর্তৃক প্রতাপাদিত্যের নিকট শৃঙ্খল ও তরবারী প্রেরণ (রাজপুত যোদ্ধাদের রীতির অনুসরণে) প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র মানসিংহের উদ্দেশে প্রতাপাদিত্যের যে বীরত্বব্যঞ্জক প্রত্যাখানের কাহিনী লিখিয়াছেন ইতিহাসের ঘটনার সহিত তাহার কোন সাদৃশ্য নাই। ইতিহাসে মোগল-শক্তিভীত প্রতাপাদিত্যের

অমূলক জনশ্রুতি

৩৫ প্রতাপাদিত্য—নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ভারতবর্ষ ফাল্গুন ১৩৩৮

মোগলের প্রতি একাধিকবার আনুগত্য প্রকাশেরই স্বীকৃতি আছে।[৩৬] প্রতাপাদিত্য মোগলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন অনন্যোপায় হইয়া এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইয়া তিনি আত্মসমর্পণও করেন। ইহাও রাজপুত বীরধর্মের বিরোধী।

মানসিংহকাব্যের শেষভাগে ভারতচন্দ্র দেবী অন্নদার মুখ দিয়া কৃষ্ণনগরের রাজবংশাবলী বর্ণনা করাইয়াছেন। ইহার মধ্যে ভবানন্দের পরবর্তী কৃষ্ণনগরের রাজাদের ধাবাবাহিক নাম পাওয়া যায়। ভবানন্দের পর যথাক্রমে গোপাল, রাঘব, এবং রুদ্র রায় রাজা হন। রুদ্ররায়ের তিনপুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণকে তিনি রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ভারতচন্দ্রের ভাষায়—

রাজবংশাবলী

মোর প্রিয় গোপাল ভূপাল হবে অই।

*   *   *

গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর।
রাঘব হইবে নাম বাষব সোসব॥
দেগাঁয়ে আছিল বাজা দেপাল কুমার।
পরশ পাইযাছিল বিখ্যাত সংসার॥
আমার কপটে তার হয়েছে নিধন।
রাঘবেরে দিব আমি রাজ্যধন॥
গ্রাম দীঘি নগর সে করিবে পত্তন।
দীঘি কেটে করিবেক শঙ্কর স্থাপন॥ ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন—দেবগ্রামের রাজা দেবপাল তন্তুবায় বংশজাত ছিলেন।[৩৭] 'নদীয়াকাহিনী' প্রণেতা কিন্তু দেবপালকে

৩৬ Pratapaditya never once defeated any Mughal army in pitched battle, his son and general Udayaditya took to flight at the first sign of a losing naval battle (at Salka) and Pratapaditya himself tamely submitted to the Mughal general without holding out till he was assured of safety to life and honour.

The History of Bengal (D.U.) vol ii p 225.

৩৭ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস পৃ ১৪৩

নদীয়ার অন্যতম বিখ্যাত ভূস্বামী এবং দেবগ্রামস্থ কুম্ভকারবংশীয় রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৩৮] ভারতচন্দ্রের বর্ণনা হইতে অনুমিত হয় যে, দেবপালের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য ভবানন্দ মজুমদারের পৌত্র রাজা রাঘবের অধিকারভুক্ত হয়। রাজা দেবপাল সম্বন্ধে একাধিক কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। 'নদীয়া কাহিনী' প্রণেতা এইরূপ একটি কিংবদন্তী হইতে দেবপালের সহিত বাংলার নবাবের শত্রুতা এবং চক্রান্তের সাহায্যে দেবপালের ধ্বংস সাধনের উল্লেখ করিয়াছেন। দেবপালের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষের কথাপ্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন— কালের কঠোর নিষ্পেষণে এই কুবের-সদৃশ ধনশালী শক্তিমান ভূস্বামীর বিস্তীর্ণ প্রাসাদ, বিপুলা পুরী ও সুগভীর পরিখাদি ধ্বংস হইয়া সাধারণতঃ "দে গার ঢীবী" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা এক্ষণে বেঙ্গল সেন্ট্রাল রেলওয়ের মাঝেরগ্রাম নামক ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।[৩৯] কিন্তু তাঁহার এই আলোচনার মধ্যে যে ইংরেজী বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে যে রাজার নাম আছে তাহা ভিন্নার্থক—

"This is said to be the fort of a Mohjan Raja"...[৪০]

প্রকৃতপক্ষে এই সকল কিংবদন্তী হইতে ঐতিহাসিক সত্যের পৃথক্‌করণ একরূপ অসাধ্য। ভবানন্দ-পরবর্তী রাজাদের বিবরণ ভারতচন্দ্র সংক্ষিপ্ত তালিকাকারে প্রদান করায় তাঁহার কাব্য হইতে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া সম্ভব নহে। 'নদীয়া কাহিনী'র লেখক বলিয়াছেন যে, গোপালের মৃত্যুর পর রাঘব মাটিয়ারী হইতে রেউই নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সংস্কৃত "ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত" এবং W. W. Hunter এর 'Statistical Account of Nadia' প্রভৃতি গ্রন্থেও তদানীন্তন কৃষ্ণনগরাধিপতি হিসাবে রাঘবের পুত্র রুদ্ররায়ের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তৎকালীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি (Agent and Governor of their affairs in Bay of Bengal and of the British factories). ডক্টর হেজেস (Hedges) তাঁহার দৈনিক রোজনামচায় ১৬৮২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাঁহাদের যাত্রা-

৩৮ নদীয়া কাহিনী—কুমুদনাথ মল্লিক পৃ ২৬
৩৯ ঐ পৃ ২৬
৪০ ঐ পৃ ২৭

ভারতচন্দ্র এদেশে বর্গীর হাঙ্গামার সূত্রপাতের সময় নির্দেশ করিয়াছেন নিম্নোদ্ধৃত ছত্রে —

শকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে।
বরগীর বিভ্রাট হইবে এইদেশে ॥

মাতৃকা অর্থে ষোড়শ ও যোগিনী অর্থে চৌষট্টি ধরিলে ১৬৬৪শকে অর্থাৎ ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে বর্গীর হাঙ্গামার সূত্রপাত। ভারতচন্দ্রের এই সময়নির্দেশ অতিশয় মূল্যবান। মহারাষ্ট্রপুরাণ রচয়িতা গঙ্গারাম দত্ত বর্ধমানে বর্গীর আগমনপ্রসঙ্গে ১৯শে বৈশাখের উল্লেখ করিয়াছেন বটে কিন্তু কোন্ সাল তাহা সঠিক বলেন নাই। ইতিপূর্বে মহারাষ্ট্রপুরাণের আলোচনার সময় আমরা দেখিয়াছি যে, আলীবর্দী খাঁ কটক হইতে প্রত্যাবর্তন পথে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল বর্ধমানে রাণীদীঘির পাড়ে শিবির সংস্থাপন করেন কিন্তু পরদিন প্রভাতে স্বীয় শিবির মারাঠা সৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ দেখিতে পান।[৪৬] কবি পুনরায় নবাব আলীবর্দী কর্তৃক কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে নজরাণা দাবীর কথা লিখিয়াছেন। গ্রন্থসূচনার আলোচনাকালে ইহার সত্যতা নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছি।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের ঐতিহাসিকত্ব

ভারতচন্দ্রের কাব্যের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে যে, কোন কোন স্থলে ইতিহাসবিরুদ্ধ জনশ্রুতি যেমন তাঁহার কাব্যে স্থান পাইয়াছে অন্যত্র আবার প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় বিবরণ প্রদান করিয়া তিনি ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠারও পরিচয় দিয়াছেন। প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের বিবরণ জনশ্রুতি আশ্রিত এবং ভবানন্দ-বংশের প্রশস্তি রাজানুগ্রহের প্রতি দৃষ্টিবশতঃ সজ্ঞানকৃত বলিয়া অনুমান করা যায়। বলা বাহুল্য যে, ইতিহাস অথবা ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করা ভারতচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল না। বিশেষতঃ ইতিহাসকে অধুনা আমরা যে অর্থে গ্রহণ করি ভারতচন্দ্র ইতিহাসকে ঠিক সেই অর্থে গ্রহণও করেন নাই। তিনি 'ইতিহাস' বলিতে সোজাসুজি গল্প-কাহিনীই বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাই বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর শেষে স্বচ্ছন্দে লিখিয়া গিয়াছেন—

ইতিহাস হৈল সায় ভারত ব্রাহ্মণ গায়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশিলা।

প্রকৃতপক্ষে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের আধারে

৪৬ New History of the Marhatas—G.S. Serdesai p 211

কৃষ্ণনগরের রাজবংশের তথা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রশস্তি রচনা এবং সেই সূত্রে অন্নপূর্ণা-মাহাত্ম্য জ্ঞাপনই তাঁহার এই কাব্যরচনার উদ্দেশ্য।

যে মঙ্গলকাব্যের আধারে ভারতচন্দ্রের এই কাব্য বিরচিত মঙ্গল কাব্যের সেইরূপ নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেও তাঁহার পূর্বগামী মুকুন্দরামের রচনায় মানবীয় রসের যতখানি স্ফুরণ হইয়াছে ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাহার অর্দ্ধেকও হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই কাব্যে রচয়িতা হিসাবে ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব অন্যত্র -শব্দচয়ন, ছন্দচাতুর্য এবং প্রয়োগকৌশলেই শব্দকুশলী কবি ভারতচন্দ্রের প্রতিভা নিঃশেষিত হইয়াছে। কবি হিসাবে ভারতচন্দ্র অবশ্য গঙ্গারাম অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন কিন্তু তথ্যনিষ্ঠায় ভারতচন্দ্র অপেক্ষা গঙ্গারামের আগ্রহ যে সমধিক উভয়ের গ্রন্থালোচনায় তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে। এই উভয় কবির তুলনামূলক আলোচনায় শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন—ভারতচন্দ্র ছিলেন কবি, গঙ্গারাম ছিলেন বর্ণনাদাতা (narrator)। অতএব ভারতচন্দ্রের নিকট তথ্য যে বহুলাংশ পল্লবিত হইবে, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। মানসিংহকাব্য ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া রচিত হইলেও তাহাতে দেবতার একটা স্থান আছে, কিন্তু গঙ্গারামের মহারাষ্ট্রপুরাণে তাহা নাই।[৪৭] ভারতচন্দ্র মূলতঃ কবি এবং গঙ্গারাম বর্ণনাদাতা হইলেও গঙ্গারামের বর্ণনা যে একেবারে রসবর্জিত নহে মহারাষ্ট্র-পুরাণের আলোচনাকালে আমরা তাহা দেখিয়াছি এবং ভারতচন্দ্রও সর্বত্র তথ্যকে কল্পনাভারাক্রান্ত করেন নাই। দীর্ঘ ঐতিহাসিক তথ্যকে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি ছত্রের মধ্যে সীমায়িত করিবার কৌশলে ভারতচন্দ্র যে দক্ষ ছিলেন তাহার নিদর্শনও তাঁহার কাব্যের মধ্যে দুর্লভ নহে। দেবী অন্নদার মুখে কৃষ্ণনগরের রাজবংশাবলীর পরিচয় এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শ্রীযুত ভট্টাচার্যের উদ্ধৃত মন্তব্যের শেষাংশও যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করা শক্ত। মহারাষ্ট্রপুরাণের মধ্যে যে দেবতার একটা স্থান আছে মহারাষ্ট্রপুরাণের গ্রন্থসূচনা হইতে ভাস্করের পরাজয়ের কারণ উল্লেখ পর্যন্ত গঙ্গারাম তাহা পাঠকবর্গকে বিস্মৃত হইতে দেন নাই এবং এই দেবতার প্রসঙ্গে কবি নবাব-ভাস্করের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে প্রথমে শিবের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উল্লেখ করিলেও পরিশেষে চূড়ান্তভাবে ভাস্করের ভাগ্যনির্ধারণে পার্বতীর হস্তক্ষেপের কথা বলিয়া শক্তিরই প্রাধান্য ঘোষণা করিয়াছেন। অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্রও শক্তির এই প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের রচনাকৌশল

ভারতচন্দ্র ও গঙ্গারাম

---

৪৭ বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস পৃ ৭৩৭

তীর্থমঙ্গল কাব্য

অষ্টাদশ শতকের ইতিহাসাশ্রিত আর একটি ভিন্ন শ্রেণীর কাব্যগ্রন্থের বিষয় আমরা এখানে উল্লেখ করিতেছি। এই কাব্যগ্রন্থের নাম "তীর্থমঙ্গল"। ইছামতী তীরবর্তী ভাজনঘাট নিবাসী বিজয়রাম সেন বিশারদ এই কাব্যের রচয়িতা। ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণের পিতা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল আনুমানিক ১৭৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে বহু লোকজন সমভিব্যাহারে স্বীয় বাটী খিদিরপুর হইতে গঙ্গাপথে তীর্থযাত্রা করেন। তাঁহার নৌকা পুটিমারীতে পৌঁছাইলে কবিরাজ বিজয়রাম আসিয়া ঘোষাল মহাশয়ের সহযাত্রী হন। তথা হইতে বিজয়রাম বরাবর ঘোষাল মহাশয়ের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহারই আদেশে তীর্থযাত্রার বিস্তৃত বিবরণ কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার আগমনের পূর্ববর্তী স্থানসমূহের অর্থাৎ খিদিরপুর হইতে পুটিমারী পর্যন্ত পথের বিবরণ তিনি ঘোষাল মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন।

কাব্যের পরিশেষে বিজয়রাম কাব্যরচনার তারিখ ও স্বীয় বাসভূমির পরিচয় দিযাছেন এবং তিনি যে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন,—

> সাতাত্তরি সনেতে আর ভাদ্র মাসে।
> বিশারদে কহে পুথি কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে॥
> শিবনিবাস সন্নিধানে ভাজনঘাট নাম।
> কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে কহে সেন বিজয়রাম॥

রচনাকাল

ইহা হইতে জানা যায় যে, কাব্যটি সম্পূর্ণ হয় ১১৭৭ সালে অর্থাৎ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে। কাব্যটি নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়। কাব্যের ভূমিকায় বসু মহাশয় লিখিয়াছেন "সাধারণে যে উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করিয়া থাকেন, আমাদের কবি কেবল সেই উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রী হন নাই, তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য তাঁহার তীর্থযাত্রার একমাত্র সহায় কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের গুণকীর্তন প্রসঙ্গে তীর্থমাহাত্ম্য কীর্তন এবং পথে যাত্রাকালে যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমুদয় প্রকাশ।" 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' প্রণেতা এই কাব্যগ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—ইহা পৌরাণিক, বৈষ্ণব কিংবা লৌকিক কোন মঙ্গলকাব্যেরই অন্তর্গত নহে। ইহার বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র। কাব্যখানির নাম তীর্থমঙ্গল। ক্রমে 'মঙ্গল' শব্দটি এত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল যে, যে কোন বিষয়ক মাহাত্ম্যপূর্ণ কাব্য হইলেই তাহা মঙ্গল নামে অভিহিত হইত। তীর্থমঙ্গলও

প্রকৃতপক্ষে একখানি তীর্থ ভ্রমণ কাহিনী এবং এই প্রসঙ্গেই ইহাতে তীর্থের মাহাত্ম্যাদিও বর্ণনা করা হইয়াছে।[৪৮]

মঙ্গল শব্দের অর্থসম্প্রসারণ কারণে তীর্থভ্রমণকাহিনীও মঙ্গল নামে অভিহিত এবং 'তীর্থমঙ্গল' কাব্যে তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে সত্য কিন্তু ইতিহাসাশ্রিত কাব্য হিসাবে ইহা আমরা পর্যালোচনা করিতেছি এই কারণে যে, শুধু তীর্থ মাহাত্ম্যের বর্ণনাই নহে, তৎকালীন দেশের অবস্থা, সামাজিক চিত্র, জনগণের মনোভাব এবং ইংরেজ অধিকারকালের প্রথম-দিকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও অন্য প্রকারের নানা চিত্র ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। বাংলা দেশের সমসাময়িক বহু ঐতিহাসিক তথ্যও তীর্থমঙ্গল হইতে সংগ্রহ করা যায়। লর্ড ক্লাইব ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমদিকে স্বদেশ যাত্রা করেন এবং সেই সময় হ্যারী ভেরেলষ্ট (Harry Verelst) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া তিন বৎসর গভর্ণর হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের জ্যেষ্ঠভ্রাতা গোকুলচন্দ্র ঘোষাল তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন।[৪৯] বিজয়রাম তাঁহার কাব্যের একাধিক স্থানে গোকুলচন্দ্রের অপ্রতিহত প্রতিপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন—

তীর্থমঙ্গলের ঐতিহাসিকত্ব

ভগবতীর কৃপা তারে সর্বলোকে বলে।
বাঙ্গালার কর্তা করি রাখিলা ভূতলে॥···
দেওয়ান গোকুল ঘোষাল বাঙ্গালাকা থামেদ।

দেওয়ানজীর বদান্যতা, সহৃদয়তা এবং উপচিকীর্ষার যথেষ্ট পরিচয় এই কাব্যে আছে। তাঁহার বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায় একটি ঘটনা হইতে— তীর্থযাত্রার কারণ উল্লেখকালে কবি লিখিয়াছেন যে, কাশীপতি বিশ্বনাথ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালকে কাশীদর্শনের জন্য স্বপ্ন দেন। স্বপ্নাদেশের কথা সহোদরকে জানাইলে তিনি ইহাতে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে তীর্থযাত্রার অনুমতি দিয়া বলেন—

একে কাজে তিন কাজ করহ নৌকার সাজ
পূজ গিয়া কাশীর ঠাকুর।

দেওয়ানজী এই 'একে কাজে তিনকাজ' বলিতে যে কি কি কার্যের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন এখানে তাহা স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও এই

---

৪৮ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ ৭৪৮

৪৯ 'গোকুল ঘোষাল সাহেবের দেওয়ান।'—কৃষ্ণমালা পৃ ৭৪৯

তীর্থযাত্রার ফলে যে কোন পরোক্ষ রাজনৈতিক প্রয়োজনও সাধিত হইয়াছিল তাহা অনুমান করা যায়। তখন ইংরেজাধিকারের প্রথম অবস্থা, দেশের প্রত্যেক অংশের জনসাধারণের মনোভাব সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দেওয়ানজী তথা ইংরেজ সরকারের পক্ষে সেই সময় বিশেষ প্রয়োজন ছিল।[৫০] দেওয়ানজী ভ্রাতাকে ইহাও বলিয়া দিয়াছিলেন—

জত যাত্রী জায় সঙ্গে লয়্যা জাবা নানা রঙ্গে
সভাকারে করি দিবে গয়া।
জত জায় তত নিবা পথের খরচ দিবা
সভাকারে করিতে হবে দয়া॥

এই লোকসংগ্রহেরও পরোক্ষ ফলের কথা তিনি চিন্তা করিয়া থাকিবেন। ইহাদের নিকট হইতেও স্থানীয় অবস্থার সমুদয় সংবাদ সংগ্রহ সুবিধাজনক ছিল। অবশ্য কৃষ্ণচন্দ্র শুধু তাঁহার সহযাত্রীদের কথার উপরেই নির্ভর করেন নাই। যে সকল প্রসিদ্ধ জনপদে তাঁহার

৫০ যদিও কবির বর্ণনায় স্বপ্নদর্শনই ঘোষাল মহাশয়ের তীর্থযাত্রার কারণ বলিয়া প্রথমে প্রদর্শিত হইয়াছে—কিন্তু 'একে কাজে তিনকাজ' ইত্যাদি দেওয়ান গোকুলচন্দ্রের উক্তি হইতে এই তীর্থযাত্রার অপর কারণও জানা যাইতেছে। কবি সেই অন্য কারণ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু দেওয়ান গোকুলচন্দ্রের তখনকার রাজনৈতিক প্রভাব হইতে মনে হয় যে, কৃষ্ণচন্দ্রের তীর্থযাত্রা তাঁহার ধর্মজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও তখনকার দিনে কষ্টসাধ্য ও বিপদসঙ্কুল দূর প্রবাসে যাইবার অপর উদ্দেশ্যও ছিল। সে সময়ের ইতিহাসপাঠকমাত্রই অবগত আছেন—১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন ও পলাশী বিজেতা লর্ড ক্লাইভ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে ঐ কয় প্রদেশের গবর্ণর হইয়াছিলেন। এই সময়ে সুদূর আলাহাবাদ পর্যন্ত ধীরে ধীরে ইংরেজ আধিপত্য প্রসারিত হইয়াছিল। এ সময়ে হিন্দুস্থানের আভ্যন্তরীণ গতিবিধি ও দেশের অবস্থা লক্ষ্য রাখা ইংরেজ রাজপুরুষগণের প্রয়োজন হইয়াছিল। পূর্বেই লিখিয়াছি দেওয়ান গোকুলচন্দ্র তৎকালে ইংরাজ সরকারের দক্ষিণহস্ত ও সর্বময় কর্তা ছিলেন। বঙ্গ বেহার উৎকলাধিপ লাট সাহেব তাঁহার নিকট হইতেই দেশের ভিতরকার খবর লইতেন। সুতরাং সমস্ত হিন্দুস্থানে সম্রান্ত ব্যক্তিগণের মনের ভাব ও গতিবিধি পরিদর্শন করিবার জন্য দেওয়ানজী ঘোষাল মহাশয় আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদরকে পাঠাইবেন তাহা কিছু অসম্ভব নহে।

—তীর্থমঙ্গলের ভূমিকা

নৌকা লাগিয়াছে, সেই সকল স্থানে নৌকা বাঁধিয়া তিনি সেস্থানের বিশিষ্ট ধনী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিয়া স্থানীয় সমস্যা ও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছেন। এই সূত্রেই আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ হইতে আমরা গঙ্গাতীরাশ্রিত বাংলা ও বিহার প্রদেশের কলিকাতা হুগলী, রাজস্থান, সূর্যগড়া, বাড়, পাটনা, টিকারী প্রয়াগ, কাশী প্রভৃতি স্থানের সমসাময়িক খ্যাতনামা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের উল্লেখ পাই। বিজয়রাম তাঁহার কাব্যে যাত্রাপথের ইতিহাস এবং লোকপ্রসিদ্ধ সকল স্থানেরই বিবরণ দিয়াছেন।

তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনার অনুষঙ্গ হিসাবে মাঝে মাঝে তিনি স্থান-বিশেষের মাহাত্ম্য পৌরাণিক কাহিনীর সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যাত্রার সাজ-সজ্জাদির পরিচয় প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন—'একবিংশতি নৌকা সাজে আর পলোআর।' এই একবিংশতি নৌকার মধ্যে বজরা ছিল, ময়ূরপঙ্ক্ষী ছিল, তোষাখানও ছিল। এই নৌ-বিবরণ বাংলা দেশের অধুনালুপ্ত নৌ-শিল্পের শুধু অস্তিত্বই নহে, প্রসারের কথাও স্মরণ করাইয়া দেয়। বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন জাতি এবং বর্ণের যাত্রী কর্তার সহগামী হইয়াছিলেন। কবি তাঁহাদের সকলের জাতি ও বর্ণগত মর্যাদার উল্লেখ করিয়াছেন। ঘোষাল মহাশয়ের সহযাত্রী বৈষ্ণবীর প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন,—

চলিল বৈষ্ণবী দুই শ্যামপ্রিয়া নাম।
সর্বদা গায়ন করে মুখে কৃষ্ণ নাম॥
আর আর যাত্রীগণ দেবে অনুরতা।
শ্যামপ্রিয়া বৈষ্ণবীর সদা কেলী-কথা॥

দুই বৈষ্ণবী সম্পর্কে কবির এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যমূলক। কৃষ্ণচন্দ্রের তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে কবি নবদ্বীপের বর্ণনাপ্রদানকালেও চৈতন্য-দেবের কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই। তৎকালে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যে নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছিল কবি শ্যামপ্রিয়া বৈষ্ণবীর আচরণে তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছেন। পরিশেষে শ্যামপ্রিয়ার পরিণতিও তিনি ব্যঙ্গ সহকারে বর্ণনা করিতে ভোলেন নাই।[৫১]

শ্যামপ্রিয়া আদি করি জন জনে।
* * দিয়া সভারে পাঠাল্যা বৃন্দাবনে॥
তার সঙ্গে জত জনের রতি-প্রীত ছিল।
তাহার বিচ্ছেদে সবে কান্দিতে লাগিল॥
পঞ্চমাস গর্ভ প্রিয়া করিলা গমন।
বালক হইলে নাম হবে বৃন্দাবন॥ —'তীর্থ মঙ্গল'

পূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে, এই পরিক্রমা-বিবরণীর মধ্যে অতীতের বহু সমৃদ্ধ জনপদের উল্লেখ এবং দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। যেমন হুগলী জেলার একটি গণ্ডগ্রাম গুপ্তিপাড়ায় ঘোষাল মহাশয়ের আগমনে কবি লিখিতেছেন,—

গুপ্তিপাড়ার ব্রাহ্মণের কি কহিব নীত।
মহাতেজ ধরে তারা বিচারে পণ্ডিত ॥
মহাশয়ের আগমন সকলে শুনিয়া।
আশীর্ব্বাদ করিলেন বেদ উচ্চারিয়া ॥

গুপ্তিপাড়ার বেদ-বিদগ্ধ ব্রাহ্মণসমাজের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির ইহা অন্যতম নিদর্শন।

জানপদচিত্র

অধুনালুপ্ত জানপদচিত্রে তীর্থমঙ্গল সমৃদ্ধ। সে সময়ে প্রত্যেক বড় শহর অথবা বর্ধিষ্ণু গ্রামের সীমানার মধ্যে যে প্রায়ই হাটবাজার থাকিত তীর্থমঙ্গল হইতে তাহা অনুমান করা যায়। কবি প্রায়ই এই সকল শহর অথবা গ্রামসন্নিহিত গঞ্জ-হাটের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। এই হাটের বর্ণনা সে-যুগের গ্রামগুলির পূর্বসমৃদ্ধির স্মৃতিবাহক। ভগবান-গোলার সমৃদ্ধ হাট বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন,—

চারিক্রোশ গোলাহাট দেখিতে সুন্দর।
শাখারি কাঁসারি তাঁতি আছয়ে বিস্তর ॥
সড়কে সড়কে মুদী বহুত দোকান।
হাটবাজার দেখি সবে করয়ে বাথান ॥

তৎকালে বাংলাদেশে আগমন-নির্গমনের একাধিক পথের উল্লেখও এই গ্রন্থে আছে। এই যাতায়াতের সুবিধার জন্যই দেশের ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক অবস্থাও বোধ হয় ভাল ছিল।[৫২] কৃষ্ণচন্দ্রের তীর্থ-পরিক্রমা হইতে জানা যায় যে, সে সময় পাটনা হইতে ফতোয়ার মধ্য দিয়া গয়া যাইবার পথে ইছলামপুর, বুলাদিগঞ্জ, মানপুর এবং মুরাদগঞ্জের মধ্য দিয়া যাইতে হইত এবং এই

---

৫২ The state of communications within a country greatly iufluence its economic condition.
Studies in the History of Bengal Subah 1740-70 A. D.
—K. K. Dutta p 396

পথে গমন করিলে তীর্থযাত্রীদের মোট ছাব্বিশটি স্থানে করপ্রদান করিতে হইত।

এইমত পাটনা হইতে গয়াতে আসিতে।
ছাব্বিশ স্থানে কড়ি লাগে আইসে দিতে দিতে॥

বিজয়রাম লিখিয়াছেন যে, মানপুরের চৌকীদার কড়া বলিয়া প্রত্যেককে বার পয়সা করিয়া বেশি কর দিতে হইয়াছিল এবং মুরাদগঞ্জে সর্বসাকুল্যে ঘোষাল মহাশয়কে আট-নয় টাকা দিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত কর মাধবরাম পাইতেন। সম্ভবত এই মাধবরাম সেই সময় রাস্তার পত্তনী লইয়াছিল।[৫৩]

বিজয়রামের এই বিবরণ হইতে তৎকালীন বাংলা দেশের ছোটখাটো যন্ত্র ও হস্তশিল্প সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তিনি একাধিক স্থানে তৎকালীন শিল্পজাত সতরঞ্চি, দুলিচা, গালিচা প্রভৃতি নানা প্রকারের কার্পেটের কথা লিখিযাছেন। বাংলাদেশের কোন কোন স্থানে এই শিল্পের যে বেশ প্রচলন ছিল ইহা হইতে তাহা অনুমিত হয।

বিজযরামের প্রত্যেকটি তীর্থস্থানের বর্ণনা অতি নিখুঁত। নবদ্বীপের উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বেই করিয়াছি। নদীয়ায আসিযা তিনি নদীয়ার তৎকালীন বিদ্যাখ্যাতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিযাছেন। কবির নিকট নদীযার সবই সুন্দর। নদীয়ার ঘাটে ঘাটে যে স্ত্রীলোকগণ স্নান করেন কবির চোখে তাঁহারাও সৌন্দর্যের আকর কিন্তু বিস্ময়ের কথা যে, চৈতন্যদেবের উল্লেখ তিনি একবারও করেন নাই। নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বৈষ্ণবধর্ম বিমুখতার সহিত কি ইহার কোন যোগ ছিল?

ত্রিপুরা জেলার অন্যতম প্রধান পরগণা বরদাখাতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীবরদেশ্বরীর মাহাত্ম্যসূচক 'বরদামঙ্গল' নামক (কবির স্বহস্তলিখিত) একটি পুথি পাওয়া গিয়াছে।[৫৪] ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এই কাব্যটির দ্বাদশ অধ্যায় শেষের ভণিতা হইতে কবির নাম, বংশপরিচয় এবং বাসস্থানের সন্ধান পাওয়া যায়।

বরদামঙ্গল কাব্য

সান্তিরাম দ্বিজসুত নন্দকিশোর নাম।
বরদাখাত দেষ মধ্যে রোয়াচালা গ্রাম॥

৫৩ Studies in the History of Bengal Subah 1740-70 A. D.—K. K. Dutta P 391 fn.

৫৪ 'বরদামঙ্গল'—সা-প-প ১৩৫৯

সেই দ্বিজে লিখীলেক বরদামঙ্গল পোতা।
কলিতে কালিকা পরে আর যত মিত্যা ॥

গ্রন্থশেষ হইতে পুঁথির প্রতিলিপির তারিখও পাওয়া যায়—"ইতি সন ১২২৬ সন তারিখ ২৬ মাহে ভাদ্র রোজ ভৃগুবাশরে শায়ং সময়ে পুস্তকং শমপ্তঞ্চেতি পোস্তকং স্বাক্ষরং [হস্তা] শ্রীনন্দকিশোর শর্ম্মণ ॥ সাকীং পরগণে বরদাখাত মৌরোয়াচালা গ্রামে ভাসিন্দা।" উদ্ধৃতাংশগুলি হইতে জানা যায় যে, কবির বাসস্থান ছিল বরদাখাত পরগণান্তর্গত রোয়াচালা গ্রামে এবং তিনি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এই মঙ্গলকাব্য রচনা করেন। মঙ্গলকাব্য রচনার ধারানুসরণে নন্দকিশোরও লিখিয়াছেন যে, দেবীর স্বপ্নাদেশেই তিনি এই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। গ্রন্থারম্ভে নন্দকিশোর এই বলিয়া ভণিতা করিয়াছেন, 'সমস্কৃতং ন জানামি মুর্খং ভবতি নিশ্চয়। তবানুগ্রহণৈঞ্চব ভাসিতং বরদামঙ্গল।' মন্তব্যপ্রসঙ্গে শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন, "গ্রন্থের ভাষা ও বর্ণাশুদ্ধি দেখিলে গ্রন্থকারের উক্তি বিনয়মাত্র মনে হয় না। সুতরাং সাহিত্য হিসাবে ইহার মূল্য অতি নগণ্য পক্ষান্তরে ইহা একটি অমূল্য ইতিবৃত্তমূলক দুর্লভ গ্রন্থরূপে বঙ্গ সাহিত্যে স্থান লাভ করিবার যোগ্য।"[৫৫] এই ইতিহাস বরদাখাত পরগণার।

পৌরাণিক সুর ও তিহাস

কাব্যের প্রথম অধ্যায়টি পৌরাণিক সুরে বাঁধা—মহাবলশালী অসুর ত্রিপুরের সহিত যুদ্ধে পরাজিত দেবতাগণের শিবের নিকট গমন এবং শিবের পরামর্শে কালিকার স্তবন। দ্বিতীয় অধ্যায় হইতেই আমরা প্রথম ইতিহাসের ক্ষেত্রে আসি। দেবীর প্রধান ভৈরব কীর্ত্তিবাস ব্রহ্মচারীর আদি নিবাস ছিল রাঢ়ের অন্তর্গত কালিপুরে—

রাহাড় মুলুক ছিল গঙ্গার পশ্চিম ধারে।
কালিপুব নাম গ্রাম অতি মনুহবে ॥
* * *
সেই গ্রামেতে ছিল কির্ত্তিভাস ব্রহ্মচারী।
পরম সাধক সেই শাস্ত্র অনুযায়ী ॥

কীর্ত্তিবাসের তপস্যায় দেবীর কৃপা হয় এবং দেবী তাঁহাকে আশু বিপদের সম্ভাবনা জানাইয়া দেশত্যাগের আদেশ দেন,—

রাঢ় দেস হবে ভঙ্গ, লোক জাবে তোমা সঙ্গ, পূর্ব্ব দেসে জাইবা চলিয়া ॥
বরদা আমার নাম, তোমাতে কহি অনুপাম, বরদাখাত পরগণা মধ্যে।
বিসারা গ্রামের নাম, তাহাতে চলিয়া জাম, কাননের মধ্যেত থাকিব ॥

৫৫ বরদামঙ্গল—সা-প-প ১৩৫৯

অতঃপর কবি এই রাঢ় দেশে যবনাধিপত্য বিস্তার এবং অত্যাচারের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

ক্ষেত্রি হৈল নিপাত যবন অধিকারি।
বাদসাহি আমল হৈল রাজা সব মারি॥
বলৎকার করি লোকের জাতি নষ্ট করে।
বাদসাই নিসান উড়ে নগরে নগরে॥

*　　*　　*

রাহাড় দেশের কথা করহ শ্রবণ॥
রায় শ্রীপ্রতাপ রাজা দুই ভাই ছিল।
বাদসাই হাঙ্গামা দেখি কাতর হইল॥

উক্ত রায় ভ্রাতৃদ্বয়ের কাতরতায় দেবী বরদেশ্বরীর কৃপায় রাজার উদ্দেশে দৈববাণী হয়। দৈববাণী অনুসারে রাজা প্রতাপ রায় কীর্ত্তিবাসের নিকট গমন করিলে কীর্ত্তিবাস তাঁহাকে আশ্বস্ত করেন এই বলিয়া,—

পূর্বে আমা বর দিচ্ছে বরদাইশ্বরি।
রাহাড় দেশেতে ভঙ্গ হইব নিশ্চয়॥
বঙ্গ রাজ্য পূর্ব দেস অরণ্য মধ্যয়ে॥
সেই দেশে বরদাকালি প্রচার হইব।
পূর্ব রাজ্যে রাজা পুনি তোমাকে করিব॥

প্রতাপ রায় ইহাতে আশ্বস্ত হইয়া,—

নানা জাতি লোক সব পরিবার লইয়া
জাত্রা করে পূর্ব্বদেসে হরসিত হৈয়া॥

এই নৌ-যাত্রায় নানা দেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে নৌকা—

মেঘনাদ নদির পূর্ব্বপাড়ে গেল।
বরদাখাত নামে দেস তখনে মিলিল॥

ঐতিহাসিক উল্লেখ

রাঢ়ে এই মোগল-অত্যাচার কখন ঘটিয়াছিল তাহার কোন উল্লেখ বরদামঙ্গলে পাওয়া যায় না। ত্রিপুরার প্রাচীন রাজমালা হইতে জানা যায় যে, রাজা ধন্যমাণিক্য (রাজ্যকাল ১৪৯০-১৫২৬ খৃঃ) তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগে যখন বঙ্গদেশ জয় করিয়া বরদাখাত পরগণা অধিকার করেন তখন বরদাখাতের জমিদার ছিলেন প্রতাপ রায়।

গৌড়েশ্বরের আছিল বরদাখাত।
তাহারে কাড়িয়া লৈল করিয়া বিবাদ॥

তাহার জমিদার প্রতাপ রায় মিলে।
গৌড়ে না মিলিল যেয়ে আপনার বলে ॥

দুর্গামণির রাজমালায়ও ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।[৫৬] বরদাখাত পরগণা অধিকৃত হইলে প্রতাপ রায় মোগল পক্ষ ত্যাগ করিয়া ধন্যমাণিক্যের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষাংশে হুসেন শাহ রাজ্যাধিপতি হন। ইলিয়াস শাহী সুলতানগণের সময়ে দেশে কিছু শান্তি দেখা দিলেও হুসেন শাহের অব্যবহিত পূর্ববর্তী হাবসী-রাজা শামসুদ্দিন মুজফফর্ শাহের রাজ্যকালে অরাজকতা পুনরায় প্রবল আকার ধারণ করে। ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর বালক নাসিরুদ্দিন মামুদ সিংহাসনে আরোহণ করিলেও তাঁহার প্রতিভূস্বরূপ হাবস্ খাঁ রাজ্য পরিচালনা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজত্ব বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। মাত্র এক বৎসর পরে তাঁহাদেরই সমজাতীয় সিদি বদর (দিওয়ানা) নামক অপর একজন রাজপুরুষ নাসিরুদ্দিন এবং তাঁহার অভিভাবক দুইজনকেই হত্যা করিয়া ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার রাজ্যকালে দেশময় অত্যাচারের স্রোত বহিতে থাকে —হিন্দু-মুসলমান কেহই সেই সময় তাঁহার পীড়ন হইতে অব্যাহতি পায় নাই। …"his rule was a fitting climax to the infamous Abyssinian epoch in Bengal; for his was a perfect reign of terror. Anxious to root out all opposition he was not satisfied with mearely purging the government, but commenced a ruthless destruction of the noble and learned men of the capital. His sword fell equally heavily on the Hindu nobility and princes suspected of opposition to his soveriegnty. His tyranny soon reached the people for in his greed for money he made extortionate demands of revenue."[৫৭] ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট সাহেবের মতানুযায়ী ইঁহার রাজ্যারম্ভকাল ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দ।[৫৮] কিন্তু এই উক্তি যথার্থ নহে। ১৪৯১ খৃষ্টাব্দেই মুজফ্ফর শাহ সিংহাসন অধিকার করেন। বিভিন্ন চৈতন্যজীবনী হইতেও জানা যায় যে ঐ সময়ে নবদ্বীপেও রাজভয় দেখা দিয়াছিল। এই বিবরণ হইতে অনুমিত হয় যে ১৪৯১-৯৩ খৃষ্টাব্দের এই হাবসী অত্যাচারকালেই প্রতাপ রায় দেশত্যাগ করিয়া

---

৫৬ রাজমালা, দ্বিতীয় লহর
৫৭ The History of Bengal (D.U.) Vol II p 140
৫৮ The History of Bengal—C. Stewart. p. 70

বরদাখাতে উপস্থিত হন। বরদাখাতে আসিয়া দৈববাণী অনুসারে প্রতাপ রায় 'বিশারা' নগরী নির্মাণ এবং বরদেশ্বরীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বরদাখাতের চতুঃসীমার বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন,—

দক্ষিণে ফেনাই নদি উত্তরে খেয়আই।
এহি দেসের মহারাজা হৈল দুইভাই ॥
পূর্ব্ব সিমান পর্বত পশ্চিমে মেঘনাদ।
এহার মধ্যে রাজা দুই মনেত সার্ব্বাদ ॥

এই বরদাখাত পরগণা পূর্বে 'শিরচাইল' রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া কেহ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।[৫৯] পরবর্তী অংশে প্রতাপ রায়ের অধঃপতন এবং পরিশেষে মৃত্যুর কারণস্বরূপ কবি তাঁহার মতিভ্রমের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

কতদিন পরে তার গ হইল মত্ততা ॥
ব্রাহ্মোণ বৈষ্ণব হিংসা করছে সদায়ে।
চুরি পরদার কাজ্য সদায়ে করযে ॥

একদিন মদ্যপানের ফলে মত্ত প্রতাপরায় পূজারত কীর্ত্তিবাসকে আহত করিয়া সিংহাসন হইতে বরদেশ্বরীর মূর্তি তুলিয়া লইয়া নিজালয়ে গমন করেন এবং স্বয়ং পূজা করিতে বসেন। তারপর,—

ক্রোধ করি বলে কালি বলি না লইলা।
কালিকে পড়িব বলি আনল জ্বালিলা ॥

* * *

কতক্ষণে প্রজ্জ্বলিত হৈল হুতাসন।
রাজপুরি ভস্মরাশি অগ্নিতে দাহন ॥
গ্রামনগর পুড়ি কৈল ছাড়খাড়।
না দহিল অগ্নিয়ে কীর্ত্তিভাসের জে পুর ॥
তথাচয় দুই অসুর জ্ঞান নাহি মনে।
কালিকে সংহার আমি করিব এখনে ॥

৫৯ "বরদেশ্বরীর নামানুসারেই ফার্সি 'বলদাখাল' শব্দটি পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে সন্দেহ নাই। পাঠান অধিকারের পূর্ব্বে এই পরগণা সুপ্রাচীন 'শিরচাইল' রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।" সা-প-প ১৩৫৯

সেই অস্ত্র উলটিয়া পড়ে তার সিরে।
দেবকোপে আপনা অস্ত্রে মরিল অসুরে ॥

রায় ভ্রাতৃদ্বয় যে কারণেই হউক না কেন, নিহত হইলে রায়-বংশও অবলুপ্ত হয় এবং জমিদারী বরদাখাত দ্বাদশ খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া স্থানীয় মাতব্বরদের অধিকারভুক্ত হয়।

রায় শ্রীনির্ব্বংস হইল অরাজগ দেস।
এতদিনে রাজবংস হইলেক শেষ ॥
দেসে মাতব্বর লোক জতেক আছিল।
বাটরা করিয়া তারা জমিদার হৈল ॥
বরদাখাত দেস তবে বার জিলা হইল।
পোস্তক বাড়য়ে দেখি নাম না লিখিল ॥

অষ্টম অধ্যায়ে কীর্ত্তিবাসের পৌত্র মৃত্যুঞ্জয়ের জীবৎকালে পুনরায় বরদাখাত আক্রমণের বর্ণনা পাওয়া যায়। দিল্লীর বাদশাহ আকবর শাহের পুত্র জাহাঙ্গীর খাঁ পূর্বদেশে আসিয়া 'জাঙ্গেরনগর' প্রতিষ্ঠা করেন। দেশ-জয়কালে যে 'বার ওমরা আসিয়াছিল বাদশার সহিতে' তাঁহারা যুদ্ধযাত্রা করিলে খাঞ্জা খাঁ (খাঞ্জা বেগ ?) এবং কোড়র খাঁ (কোড়র বেগ?) নামক দুই মোগল রাজপুরুষ বরদাখাত পরগণা দখল করেন। বরদাখাতের চৌধুরী মজুমদার প্রভৃতি ছোট জমিদারগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করেন।

খাঞ্জা খাঁ কোড়র খাঁ দুই মোগল ছিল।
বহু সর্ন্য লইয়া তারা বরদাখাতে আইল ॥
বিশারার কাচারি তানা কোরক করিল।
চৌধুরী মজুমদার সব পলাইয়া গেল ॥

বরদাখাতে অবস্থানকালে তাঁহারা বরদেশ্বরীর পূজার কথা শুনিয়া পূজা নষ্ট করিতে আদেশ দেন।

তাথে এক ব্রাহ্মোণ আছিল অনুপাম।
ভাগরাতালি বাড়ি তার বানিরাম নাম ॥ (য় ?)
বানিরাম ছিল সেই দরবার ভিতর।
সুনিয়া ই সব কথা কাফে থরথর ॥
কালিভক্ত বানিরায়ে সমাই স্থানে কহে।
কালি এহিঃ স্থানে রাখন উচিত না হয়ে ॥

দেবীর মাহাত্ম্যে পূর্বোক্ত দুই মোগল রাজপুরুষ পরাভূত হইয়া দেবীর পূজার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া যান। "বিশারার সপ্তগ্রাম বিত্তি করি দিল।"

বরদামঙ্গলে উল্লিখিত খাজা খাঁ-কোড়র খাঁ প্রদত্ত বরদেশ্বরীর প্রথম দেবোত্তর সম্পত্তি —'বিশারার সপ্তগ্রামের' উল্লেখ কুমিল্লা কালেক্টরীর ৪৩৯ নং হকীকত লাখেরাজের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।[৬০] জানা যায় যে, শ্রীকাইলের ভৈরববংশীয় ত্রিশজন দখলকার এই দেবোত্তর সম্পত্তির পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু সনদের মধ্যে সম্পত্তির প্রদাতা হিসাবে এক 'মনুহর খাঁ'র নাম পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন যে, এই মনুহর খাঁ এবং ইশা খাঁ মশনদ-আলির প্রপৌত্র সুবিখ্যাত "Munawar Khan"—যিনি শায়েস্তা খাঁর চট্টগ্রাম অভিযানে (১৬৬৬খৃঃ) সাহায্য করেন, উভয়ে অভিন্ন।[৬১] কিন্তু সনদের তারিখ তাহার বহু পূর্বে ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে—সেই সময়ে মনুহর খাঁ-র অস্তিত্বই পাওয়া যায় না। 'বাহারই-স্তান ঘাইবী' গ্রন্থানুসারে মনুহর খাঁর পিতামহ মুসা খাঁর মৃত্যুকালে (১৬২৩-২৪খৃঃ) মনুহরের পিতা মাসুমেরই বয়স আঠার-উনিশ ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে।[৬২] সুতরাং উল্লিখিত তারিখের সহিত সনদ প্রদাতার সময়ের সঙ্গতি রক্ষা হয় না। সনদে প্রদত্ত তারিখের সহিত খাজা খাঁ-কোড়র খাঁর বরদাখাতে উপস্থিতিকালের সামঞ্জস্য বিধানে কিন্তু কোন গোল নাই। বাণী রায় ও তাঁহার অধঃস্তন বংশধরগণের বিবরণ সম্বলিত "শ্যামগ্রাম" নামক গ্রন্থ অনুসারে বাণী রায়ের আবির্ভাবকালও খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে ধরা যায়।[৬৩] পূর্বোল্লিখিত সনদের তারিখটি খাজা খাঁ এবং কোড়র খাঁ প্রদত্ত প্রথম দেবোত্তর সম্পত্তি প্রদানের হইতে পারে[৬৪] কিন্তু তাহা হইলেও লাখেরাজ পত্রে উল্লিখিত মনুহর খাঁর নাম সমস্যা থাকিয়া যায়।

নাম সমস্যা

৬০ "মনুহর খাঁ জমিদার অথন জে ম্রজা আলি ও ম্রজা বাখর আলি ও ম্রজা হুসেন আলি জমিদার এহানগ পীতামহ ম্রজা মাহাম্মদ বাকর জমিদারের পূর্ব্বের' কাগজে, অনূ্যন ৬০ খানা বিভিন্ন গ্রামে মোট ৩৩৷৵৯৷০ জমী "বরদেশ্বরী ঠাকুরাণী"র নামে দেবোত্তর করেন। সনদের তারিখ '১০২৩ সন পীতাপীতামহের ঠাই শুনিয়াছি কিছু কম ২০০ বৎসর হইব।"—সা-প-প-১৩৫৯ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কুমিল্লা কালেক্টরী হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন।

৬১ J. A. S. B.—1906 pp 405-17.

৬২ I· H. Q.—1935 p 671

৬৩ সা-প-প ১৩৫৯ ৬৪ সা-প-প ১৩৫৯

কীর্ত্তিবাসের প্রপৌত্র এবং মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র গঙ্গারামের সময়ে 'বিশারার বিসগ্রামের' নদীগর্ভে নিমজ্জনের সংবাদটি কবি রূপকের সাহায্যে দেবীর মুখে 'বচিকামৎস্তের সমুদ্রযাত্রা' কাহিনীর মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। কুলপ্লাবী নদী একে একে যে গ্রামগুলি বিধ্বস্ত করে কবি তাহার এক তালিকাও প্রদান করিয়াছেন।

প্রথমে ভাঙ্গিল গ্রাম নামে কালিপুর।
তারপরে ভাঙ্গিল রম্য পদ্ম সরোবর॥
তারপরে ভাঙ্গিল গ্রাম নামে ভাগরাতালি।
বদন ভরিয়া সবে বোল কালি ২॥
তারপরে ভাঙ্গিল বরদা অন্তপুর।
পাষাণের মন্দির প্রাচির হৈল চূড়॥
এহি মতে ভাঙ্গীল গ্রাম নগর সারি ২।
তারপরে ভাঙ্গিলেক বিসারা নগরি॥
দির্গে দুইদিন পথপাসে হাড়াই পর।
দুই দণ্ডে ভাঙ্গিল তাহা নদী খরতর॥
বিসারার বিসগ্রাম নদিয়ে ভাঙ্গিল।
অন্ত ২ দেসের কথা তাহা না লিখীল॥

দেবীর মন্দির নষ্ট হইলে তাঁহার আদেশে ছিকালির মধ্যগ্রামে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া নূতন মণ্ডপ নির্মিত হয়। গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের শেষ এই ছিকালির মাহাত্ম্য বর্ণনায়। পরবর্ত্তী দুই অধ্যায়েও মহাকালী এবং লিঙ্গ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং বরদামঙ্গলের ইতিহাসাংশ মোটামুটীভাবে গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের মধ্যেই শেষ হইয়াছে।

গোঁসানীমঙ্গল কাব্য

সাহিত্যবিশারদ আবদুল করিম সাহেব 'গোঁসানীমঙ্গল' নামে কোচবিহারের একটি কাব্যগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।[৭৫] এই কাব্যগ্রন্থের একাধিক প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে এবং সকল হস্তলিপির বিবরণও একরূপ নহে। গোসানীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা এবং ইহার লিপিকাল সম্বন্ধে 'কোচবিহারের ইতিহাস' প্রণেতা লিখিয়াছেন,—"গোঁসানীমঙ্গল' আধুনিক

লিপিকাল

পুঁথি, উহা কোচবিহারের মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে (ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে) রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী নামক জনৈক স্থানীয় ব্যক্তি

৭৫ বা-প্রা-পু-বি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত ১ম খণ্ড

কর্তৃক পদ্যচ্ছন্দে রচিত হইয়াছিল। গোঁসানীমারী মধ্যবঙ্গ স্কুলের শিক্ষক ব্রজচন্দ্র মজুমদার এই নামের একখানি পুঁথি ১৩০৬ সনে মুদ্রিত করিয়াছিলেন।"[৬৬] মঙ্গলাচরণে কবি গাহিয়াছেন,—

হরেন্দ্রনারায়ণ রাজা বেহারে পালেন প্রজা
যাঁর যশ ঘোষে সর্ব্বজন।
সেই রাজ্যে করে ঘর, সাধু সে করুণাকর,
পরম বৈষ্ণব গুণধান ॥
তাহার তনয় এক, পাইয়া চৈতন্য ভেক,
চিন্তে হরি-চরণ-কমল।
তাহে আদেশিলা দেবী কহে রাধাকৃষ্ণ কবি
সুমধুর গোঁসানী-মঙ্গল ॥

মঙ্গলাচরণ হইতেই জানা যায় যে, করুণাকরপুত্র রাধাকৃষ্ণদাস দেবী গোঁসানীর আদেশে এই গোঁসানীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

গ্রন্থারম্ভের বর্ণনাও বেশ কবিত্বপূর্ণ—

বেহারে দক্ষিণ গ্রাম নাম জামবাড়ী।
সেই গ্রামে জামবৃক্ষ আছে সারি সারি ॥
সুবর্ণ বরণ জাম ফলে বার মাস।
শ্রীফল বেলাদি তথা চির পরকাস ॥
পার্ব্বতী সহিতে শিব শ্রীফলের তলে।
একত্রে বসিয়া কথা কহে নানা ছলে ॥
শিব কহে শুন দুর্গা আমার বচন।
এই রাজ্যে যতলোক সুখী সর্ব্বজন ॥
সুবর্ণ বরণ ফল বেলাদি শ্রীফলে।
ঘরে ঘরে শিবদুর্গা পূজা কুতূহলে ॥
চণ্ডী কহে বর দাও ভোলা মহেশ্বর।
এই রাজ্যে রাজা হোক নাম কান্তেশ্বর ॥

প্রসাদগুণযুক্ত রচনা

পুঁথির বিবরণ অনুযায়ী প্রথমে শ্রীবৎস রাজা কামরূপ অঞ্চলের রাজা ছিলেন, তাহার পর ভগদত্ত রাজা হন। এই ভগদত্তের বংশ বিলুপ্ত হওয়ার পর কামতাপুরের নিকটবর্তী পূর্বোল্লিখিত জামবাড়ী গ্রামে,

---

৬৬ কোচবিহারের ইতিহাস—খাঁ চৌধুরী আমানত উল্যা আহমদ ১ম খণ্ড, পৃ ৪৪ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

মহাজনের ঘরে কান্তেশ্বর নামক একটি বালক জন্মগ্রহণ করে। কান্তেশ্বরের পিতার নাম ভক্তীশ্বর, মাতা অঙ্গনা। অঙ্গনা তন্ত্রমন্ত্র, রামায়ণ ইত্যাদি শুনিতে শুনিতে একদিন স্বামীর নিকট চণ্ডীর-মাহাত্ম্য শুনিয়া দেবীর পূজা করেন। চণ্ডী তাঁহার পূজায় প্রীত হইয়া দম্পতীকে বলেন,—

শুন শুন ভক্তিশ্বর শুনহ অঙ্গনা।
তোমাদের হতে প্রিয় জানি কোন জনা॥
করহ আমার পূজা লহ ইষ্টবর।
তোমার তনয় হবে রাজ্যের ঈশ্বর॥
সত্য করি কহি ব্যর্থ না হবে বচন।
মম বরে তব পুত্র হইবে রাজন॥
রাখিবা পুত্রের তুমি কান্তনাথ নাম।
একথা কহিয়া চণ্ডী হল অন্তর্দ্ধান॥

চণ্ডীপূজার ফলে অঙ্গনার গর্ভে সুলক্ষণাক্রান্ত কান্তেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। কান্তেশ্বর—

অল্পকাল গুরু স্থানে করি অধ্যয়ন।
বাঙ্গালা সংস্কৃত শিখে করিয়া যতন॥
ব্যাকরণ কাব্য শাস্ত্রে হইয়া পণ্ডিত।
তন্ত্রমন্ত্র আদি শিখে আর রাজনীতি॥

কান্তেশ্বর সম্পর্কে জনশ্রুতি

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, গোঁসানীমঙ্গলের সকল পুঁথির বিবরণ একরূপ নহে। 'কোচবিহারের ইতিহাস' প্রণেতা আর একটি পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন।[৬৭] এই পুঁথির বিবরণ অনুযায়ী দরিদ্রের সন্তান কান্তেশ্বর প্রথম জীবনে এক ব্রাহ্মণের রাখাল ছিলেন কিন্তু এই কার্যে তাঁহার কোন অনুরাগ ছিল না। একদিন তাঁহার অন্বেষণে গিয়া ব্রাহ্মণ এক বিচিত্র ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন—এক বিষধর সর্প নিদ্রিত কান্তেশ্বরের মস্তকের উপর ছায়াদান করিতেছে। এইরূপ জনশ্রুতিমূলক প্রবাদ-বাক্যের মূল অনুসন্ধান অনাবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে 'কান্তেশ্বর' নামে কোন রাজা ছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে সংশয় আছে। কাহারও মতে কান্তেশ্বর কোন বিশেষ রাজার নাম নহে, কামতাপুরের রাজাদের একটি উপাধি মাত্র।[৬৮] হোসেন

---

৬৭ কোচবিহারের ইতিহাস—খাঁ চৌধুরী আমানত উল্যা আহমদ; ১ম খণ্ড পৃ ৪৩—৪৪

৬৮ "কান্তেশ্বর একটি উপাধি, নাম নহে। লোকের মৌখিক উচ্চারণে কামতেশ্বর হইতে কাম্‌তেশ্বর এবং তাহা হইতে কান্তেশ্বর হইয়াছে।"
—কো-ই পৃ ৪৩

শাহ কর্তৃক কামতা রাজ্য (কুচবিহার) বিজিত হইবার পরে মহারাজ বিশ্বসিংহও 'কামতেশ্বর' উপাধি ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনারোহণ করেন। এই 'কামতেশ্বর' কথাটি লৌকিক উচ্চারণে কান্তেশ্বরে পরিণত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। 'কোচবিহারের ইতিহাস' লেখক 'শঙ্করচরিত্র' হইতে কামতেশ্বর ধর্মপালের পর তাঁহার "বেলগিয়া ভাই" (পৃথগান্ন ভ্রাতা) দুর্লভ-নারায়ণের রাজ্যকাল ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।[৬৯] বিশ্বকোষ-প্রণেতা কামতাপুরের রাজা নীলধ্বজকে দুর্লভ-নারায়ণ কর্তৃক কামতাপুরে আনীত ব্রাহ্মণ চণ্ডীবরের পুত্র রাজধরের সমসাময়িক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন (১৩২৮-৩৮ খৃঃ)। 'গৌড়ের ইতিহাস' লেখকও নীলধ্বজের রাজ্যারম্ভকালস্বরূপ ১৩২৮ খৃষ্টাব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। এই রাজা নীলধ্বজের বংশপরিচয় সম্বন্ধে কিন্তু বিভিন্ন অভিমত প্রচলিত। শঙ্করদেব-শিষ্য শ্রুতিধর রূপনারায়ণ প্রণীত 'কামতেশ্বর কুলকারিকা' অনুযায়ী কামতেশ্বরগণ রাজা বর্দ্ধনের বংশধর ছিলেন এবং "দ্বিতীয় পরশুরাম মহানন্দী সুত নন্দের" ভয়ে ক্ষত্রিয়াচার পরিত্যাগ করিয়া 'ভঙ্গক্ষত্রি' নামধারণ করিয়া রাজবংশীরূপে রত্নপীঠ (কামতায়) আশ্রয়গ্রহণ করেন। ইহার সমর্থনে অন্যত্র হইতেও কেহ কেহ প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন।[৭০]

গোসানীমঙ্গলে বর্ণিত রাজা কান্তেশ্বরের রাজ্যলাভ বিবরণের সহিত রাজা নীলধ্বজের রাজ্যলাভ সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদের সাদৃশ্য আছে; নীলধ্বজও নাকি প্রথম জীবনে এক ব্রাহ্মণের রাখাল ছিলেন এবং পরে তাঁহার শরীরে রাজলক্ষণ দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহাকে মুক্তি দান করেন। কিন্তু উভয়ের রাজ্যকালের মিল নাই। তাঁহার পর চক্রধ্বজ আনুমানিক পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে কামতাপুরের রাজা হন এবং চক্রধ্বজের পর নীলাম্বর কামতা রাজ্যের অধিকারী হন। প্রবাদ যে, তিনিই এই রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কামতেশ্বরীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিহাস হইতে পাওয়া যায় যে, হুসেন শাহ গৌড়েশ্বর হইবার অব্যবহিত পরেই কামতাপুর অধিকার করেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহার সৈন্য কর্তৃক কামতেশ্বরীর মন্দির বিনষ্ট

---

৬৯ কোচবিহারের ইতিহাস- খাঁ চৌধুরী আমানতউল্যা আহমদ, ১ম খণ্ড পৃ ৩৭

৭০ উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৪র্থ অধিবেশনের কার্যবিবরণ, পৃ ১৮৯-৯১

এবং প্রতিমা নিমজ্জিত হয়। মোগলের সহিত এই যুদ্ধকালে নীলাম্বর ছিলেন কান্তেশ্বর। যুদ্ধে বন্দী হইয়া গৌড়ে নীত হইবার সময়ে তিনি পথিমধ্যে পলায়ন করেন এবং সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পরে হুসেন শাহের পুত্র দানিয়েলের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন বলিয়া জানা যায়।

গোসানীমঙ্গলের কাহিনী অনুযায়ী মন্ত্রিপুত্র মনোহর রাজমহিষী বনমালার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় কান্তেশ্বর তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার পিতা শশিপাত্রকে সেই মাংস ভক্ষণ করিতে দেন। মন্ত্রী শশিপাত্র ইহা জানিতে পারিয়া প্রতিশোধ কামনায় 'দিল্লীর মোগলের' শরণাগত হইয়া তাহাদের সহায়তায় কান্তেশ্বরকে পরাজিত ও বন্দী করেন। কিন্তু দেবী চণ্ডীর কৃপায় রাজা 'কাজলীকুড়া' নামক জলাশয়ে স্নানকালে অদৃশ্য হন। শশিপাত্রের বৃত্তান্তও সকল পুঁথিতে একরূপ নহে।

"কোনও কোনও পুঁথিতে শশিপাত্রের দিল্লীর পরিবর্তে লক্ষ্ণৌ গমনের (!) উল্লেখ আছে। অনেকের মতে শশিপাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন।"[১১] শশিপাত্র কিরূপে মোগলের অনুগ্রহভাজন হন সে সম্পর্কেও গোসানীমঙ্গলের বিভিন্ন অংশে উল্লেখ আছে। শশিপাত্র নাকি মোগল সেনাপতিকে কান্তেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া বলেন, 'জাতিকুল তোমাকে করিনু সমর্পণ'। এইজন্য কামতাপুর অধিকৃত হইবার পর নগরবাসী তাহাকে 'জাতিকুল গেল তোর হইল যবন' ও 'ক্ষেত্রি না বলি তোকে এবেড়ি শৃগাল' ইত্যাদি সম্বোধনে বিদ্রূপ করিয়াছিল।[১২] কবি ক্ষত্রিয়োচিত কার্য নহে বলিয়া কান্তেশ্বরের পলায়নে অস্বীকার এবং বন্দীত্ব স্বীকারের কথা লিখিয়াছেন।

হোসেন শাহের কামতা-বিজয় সম্পর্কে ইতিহাস হইতে এই জানা যায়:

In 1498 Hussain launched a vigorous compaign with a view to recovering the lost territory and putting a permanent stop to khen aggression. This was popularly believed to have been instigated by Nilambar's Brahman minister whose licentious son had been brutally murdered by that Raja. The attack was opened with an overwhelming army led according to traditions by Ismail Ghaji who marched straight to besiege the khen capital. The city was strongly fortified and the siege dragged on according to one

১১ কোচবিহারের ইতিহাস—খাঁ চৌধুরী আমানতউল্যা আহম্মদ ১মভাগ পৃ ৩৮

১২ ঐ পৃ ২৮০

tradition for 12 years,··· The Bengali forces finally gained entrance into the fortress, it is said by means of treachury and captured Nilambar, who was taken to Gaur but subsequently escaped (B. Hamilton' ii 458-9) The city was eventually destroyed and the whole kingdom as Hajo was permanently annexed."[১৩]

এস্থলে লক্ষণীয় যে, দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যপী এই অবরোধের এবং মুসলমান-দের কামতাপুর অধিকারের জন্য স্ত্রী-বেশে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশের জনশ্রুতি-মূলক বৃত্তান্ত কিন্তু গোসানীমঙ্গলের মধ্যে পাওয়া যায় না। কান্তেশ্বরের মন্ত্রী শশিপাত্র মোগলদের কামতাপুব আক্রমণে প্ররোচিত করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে। শশিপাত্রের কাহিনী সত্য হইলেও ইহাই মোগলদের কামতাপুর অভিযানের একমাত্র কারণ নহে। ইতিপূর্বেও একাধিকবার কামতাপুর আক্রান্ত হইয়াছিল এবং খেন-আধিপত্য বিস্তারের মূলে কুঠারা-ঘাত করাই সুলতান হুসেন শাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বলা যায়।[১৪] গোসানীমঙ্গলে কান্তেশ্বরকে 'একপুরুষে রাজা' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইতিহাসপাঠে শুধু জানা যায যে, নীলাম্বরের পরাজয়ের পরে কোচবংশীয বিশ্বসিংহ কামতাপুরের রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার অথবা পূর্ববর্ত্তী রাজগণেব কোনও মুদ্রা এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।[১৫] গোসানীমঙ্গল হইতে কামতাপুরের ঐতিহাসিক তথ্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐতিহাসিক গুরুত্ব যৎকিঞ্চিৎ হইলেও গ্রন্থ-খানির মধ্যে কবিত্বের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ ঘটিয়াছে। আবদুল করিম সাহেবের কথায় সত্যই "ইহার ভাষা সবল, স্বাভাবিক, পরিস্ফুট।"

পূর্ববঙ্গগীতিকা

দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত পালাগানগুলি 'মৈমনসিংহ গীতিকা' এবং 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে চারিখণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই গীতগুলির অধিকাংশের রচয়িতা পল্লীর অশিক্ষিত কবি—ইহারা

---

১৩ The History of Bengal (D. U) Vol II p 496

১৪ ইতিহাস হইতে জানা যায় যে হুসেনশাহপূর্ববর্ত্তী গৌড়ের একাধিক সুলতান কামরূপ অভিযান করেন এবং কামতাপুরও একাধিকবার আক্রান্ত হয়। সুতরাং শশিপাত্রের আমন্ত্রণ অথবা প্ররোচনাই মোগল অভিযানের উল্লেখযোগ্য কারণ বলিয়া মনে হয় না।

১৫ কোচবিহারের ইতিহাস—আমানতউল্যা খাঁ ১ম ভাগ পৃ ৩৬

সহজ, সরল গ্রাম্য কবিত্ব সহযোগে এক একটি কাহিনী রচনা করিয়াছেন। বর্ণিত কোনো কাহিনীর সহিত হয়তো কোন ঐতিহাসিক ঘটনা যুক্ত হইয়াছে, কোনটির মধ্যে শুধু ঐতিহাসিক ব্যক্তিবিশেষের নামোল্লেখেই ইতিহাসের উপাদান পর্য্যবসিত, আবার অন্যত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনী লইয়া সুন্দর প্রেমকাহিনীও রূপায়িত হইয়াছে। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক পালাগানের মধ্যেই পূর্ববাংলার সমাজ জীবনের কোন না কোন চিত্র প্রতিভাত হইয়াছে। এই গীতিকাগুলির মধ্যে যেগুলি ইতিহাসাশ্রয়ী বলিয়া অভিহিত হয় আমরা এখানে মাত্র সেইগুলি সম্পর্কেই আলোচনা করিব। অনেক ক্ষেত্রেই রচয়িতার নাম পর্যন্ত গীতগুলিতে সংযুক্ত হয় নাই অথবা তাহাদের নাম মুখে মুখে বাদ পড়িয়াছে। এই সকল পালাগানের রচনাকালও দেওয়া নাই, গানের বিষয়বস্তু এবং ভাষা হইতে অনুমান করা শক্ত।[৭৬] মোটামুটীভাবে ঊনবিংশ শতকের রচনা হিসাবে এগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে। দীনেশচন্দ্র সেন দেওয়ান ঈশা খাঁ এবং তাঁহার বংশধরগণের কীর্তি-কাহিনী অবলম্বনে রচিত চারিটি পালাগান পূর্ববঙ্গ গীতিকায় সঙ্কলন করেন।[৭৭] ঈশা খাঁ সংক্রান্ত এই পালাগুলি বিভিন্ন কবির রচনা এবং কাহিনী-বর্ণনায়ও পরস্পরের মধ্যে ঐক্য নাই। এইরূপ মিল অবশ্য প্রত্যাশাও করা যায় না। পালাগান রচয়িতাগণের অনেকেই নিরক্ষর ছিলেন এবং জনশ্রুতিই অনেকক্ষেত্রে তাহাদের গানের উপকরণ হইয়াছে। এই সকল পালাগানে যেমন তুমুল যুদ্ধের বর্ণনা আছে, তেমনি প্রেমের কাহিনীও আছে—গীতোক্ত সকল ঘটনাই ইতিহাসের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে নাই। দীনেশচন্দ্র সেন এই গানগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা নির্ধারণ প্রসঙ্গে দেওয়ান বংশের বিভিন্ন ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—ঈশা খাঁর দিল্লীর সেনাপতিগণের সহিত যুদ্ধ এবং

পূর্ববঙ্গগীতিকা বৈশিষ্ট্য

রচনাকাল

৭৬ 'মুদ্রিত গাথাগুলিতে স্থানীয় উপভাষার রূপ বজায় রাখিবার চেষ্টা সত্ত্বেও বাঙ্গালা সর্বজনীন সাধুভাষার এবং কলিকাতা অঞ্চলের চলিত ভাষার প্রভাব ঢাকা পড়ে নাই। মধ্যে মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার (এবং সাধুভাষার) শব্দগুলিকে পূর্ববঙ্গীয় রূপ দিবার চেষ্টা উৎকট হইয়া দেখা দিয়াছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন পৃ ৯৪৮

৭৭ পূর্ববঙ্গ গীতিকা ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা

তৎকর্তৃক সোনামণি (সুভদ্রা) হরণের কাহিনী পালাগানসমূহে একটু অতিরঞ্জিতভাবে প্রদত্ত হইলেও এই সমস্ত বিবরণ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইশা খাঁর বংশাবলী ও পূর্বপরিচয় লইয়া অনেকটা মতদ্বৈধ আছে।[৭৮] দেওয়ান পরিবারের কাহিনী রচনা করিতে গিয়া দেওয়ান বংশীয়দের অনুগৃহীত কবিগণ স্বভাবতই দেওয়ান বংশের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে কল্পনাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। পালাগানগুলির অন্তর্গত বংশলতিকার সত্যাসত্য লইয়াই যত গোল বাঁধিয়াছে। বিভিন্ন পালাকার দেওয়ান-বংশীয়দের সহিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের সম্পর্ক-সূত্র যুক্ত করিয়া বংশলতিকার গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন। বংশলতিকা সম্বন্ধে বিভিন্ন পালাগানের মধ্যে গরমিল যাহাই থাকুক না কেন, ইশা খাঁর পূর্বপুরুষগণ পূর্বে যে হিন্দু ছিলেন এবং কোন এক সময় তাঁহাদের একজন বঙ্গদেশে আসিয়া বসবাস করেন সে সম্বন্ধে সংশয়পোষণ অহেতুক। জঙ্গলবাড়ীর এই মুসলমান দেওয়ানেরা পূর্ববঙ্গে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলেও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশাগত গোঁড়া এবং অভিজাত মুসলমানেরা যে তাঁহাদের সমশ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য করিতেন না, বরং অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন দেওয়ান ফিরোজ খাঁর পালায় তাহার এক উদাহরণ আছে। কেল্লা তাজপুরের রাজকন্যাকে দেখিয়া দেওয়ান ফিরোজ খাঁ মুগ্ধ হইয়া বিবাহ প্রস্তাব প্রেরণ করেন। কিন্তু কেল্লা তাজপুরের অধিপতি ওমর খাঁ, ফিরোজ খাঁকে কাফের ও হিন্দুভাবাপন্ন বলিয়া অবজ্ঞা সহকারে সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।

ইশা খাঁ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেদার রায়ের ভগিনী মতান্তরে কন্যাকে চুরি করিয়া স্বীয় জমিদারীতে আনিয়া নাকি বিবাহ করেন। তাঁহার নাম লইয়া আর এক বিভ্রাট আছে। পালাগানে নাম কোথাও সুভদ্রা, কোথাও সোনামণি আবার কোথাও সোনাই ইত্যাদি। পালাগানসমূহে নামের এই হেরফের নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর। বিবাহের পর তাঁহার নাম হয় নিয়ামৎজান। কেদাররায় এই অপমানের প্রতিশোধ কামনায় ইশা খাঁর মৃত্যুর পর ভগ্নীর দুই পুত্রকে স্বীয় রাজ্যে ছলে ভুলাইয়া আনিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হন। প্রথম পালাগানে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। মানসিংহের সহিত যুদ্ধে ইশা খাঁর কারাবরণ এবং পরিশেষে সম্মানসহ

---

৭৮ পূর্ববঙ্গ গীতিকা ২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য

মুক্তিলাভ সম্পর্কে দেওয়ান পরিবারের মধ্যে বহু গল্প (ইতিহাস ?) প্রচলিত ছিল কিন্তু প্রথম পালাটিতে এইরূপ অসম্ভাব্য গল্পের পরিবর্তে দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর যুদ্ধ এবং পরিশেষে কৌশলী মানসিংহের কৌশলে জয়লাভের বর্ণনা আছে। ইতিহাসে ইশাখাঁর মোগল সুবাদারের সহিত কয়েকবার যুদ্ধের পর তাঁহার নিকট মূল্যবান উপহারাদি প্রেরণ করিয়া স্বাধীনতা উপভোগ ও প্রীতি অর্জনের উল্লেখ আছে। জানা যায় যে, মানসিংহ ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ইশাখাঁর পুত্র এবং উত্তরাধিকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহার স্বাধীনতাহরণ করেন।[৭৯]

উক্ত গানটিতে সম্রাট আকবর কর্তৃক ইশা খাঁকে মসনদআলী খিতাব এবং 'বাইশ' পরগণার মালিকীদানের উল্লেখ রহিয়াছে। আবুল ফজল এই খিতাব প্রদানের কোন কথা বলেন নাই। ত্রিপুরার রাজমালায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজা অমরমানিক্য তাঁহার রাজ্ঞীর অনুরোধে ইশা খাঁকে মসনদ আলি উপাধি এবং ৫০,০০০ সৈন্য দান করেন।[৮০] এই দেওয়ান পরিবারের আদি নিবাস অযোধ্যা জেলার বাইসওয়ারী নামক স্থানে বলিয়া কেহ মনে করেন।[৮১] রাজপুতাধিকৃত বাইশটি পরগণার সহিত বাইশওয়ারা নামের সম্বন্ধ আছে? ইশা খাঁ যে পূর্ববঙ্গে বাইশটি পরগণার আধিপত্য লাভ করেন, এই কথাটি কি বাইশওয়ারা রাজপুতবংশের পূর্ববৈভবের চিরাগত সংস্কারের আভাস প্রদান করিতেছে? এই পালাটিতে কেদাররায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে তাহা যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না। ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, মান-

---

৭৯ Behind the impenetrable shield of Brahmaputra, Ishakhan had built up a great power by practising unfailing tact, suppleness of diplomacy and purchase of the Mughul Viceroy's forberance with freindly offers and costly presents as long as possible. It was only in 1602 that the spirited Mansingh, with a well equipped flotila at his command, crushed the independence of this deceitful rebel leader's son and successor, by attacking his river home. The History of Bengal (D. U)vol II p 201

৮০ রাজমালা—কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত, তৃতীয় লহর

৮১ পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য

সিংহের সহিত যুদ্ধে কেদার রায় আহত হন এবং তাহার ফলেই তাঁহার মৃত্যু হয়।[৮২] ফিরোজ খাঁ শীর্ষক পালাগানটিতে তৎকালীন ভূঞাদের সকলেই যে মোগল বশ্যতা স্বীকারে ব্যগ্র হইয়া উঠেন নাই, তাহার এক ইঙ্গিত আছে। ঈশাখাঁ প্রথমে মানসিংহের বিরোধিতা করিলেও পরিশেষে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সখ্য অর্জন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার বংশধর ফিরোজ খাঁ যে এই বশ্যতাস্বীকারে আদৌ প্রীত ছিলেন না পালাগানটিতে তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। একাধিক পল্লীগীতিকায় মুসলমান রমণীর অসাধারণ রণপাণ্ডিত্য এবং শৌর্যের উল্লেখ দেখা যায়। ফিরোজ খাঁ শীর্ষক পালাটিতে উমর খাঁ এবং ফিরোজ খাঁর মধ্যে যুদ্ধের তিনদিন পরে জঙ্গলপুরে যখন সংবাদ আসিল যে, ফিরোজ খাঁ কেল্লা তাজপুরে বন্দী হইয়াছেন তখন তাঁহার বিবি সখিনা মাতৃস্বসার নিকট অনুমতি লইয়া যুদ্ধযাত্রা করেন এবং একাকী যুদ্ধ করিয়া অপূর্ব শৌর্যের পরিচয় প্রদান করেন। 'মানিকতারা'[৮৩] নামক একটি পালা হইতে সমসাময়িক সমাজ সম্পর্কে অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই পালাটিতে কড়ির বিনিময়ে ব্যবসাবাণিজ্যের আদান-প্রদান, নৌকার পারানি, নদীপথসমূহে জলদস্যুর উপদ্রব এবং স্ত্রীলোকের শস্ত্রবিদ্যাচর্চার নিদর্শন আছে। অধিকাংশ পালার ন্যায় এই পালারও রচনাকাল অজ্ঞাত। পূর্ববঙ্গ গীতিকার তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় 'সুজা-তনয়ার বিলাপ' এবং 'পরীবানুর হাঁহলা' নামক দুইটি পালা গান পাওয়া যায়। কোনটিতেই রচয়িতার নাম নাই। প্রথম পালাটির বিষয়—আরাকানরাজ কর্তৃক কারারুদ্ধ শাহ শুজার কন্যার স্বীয় দুর্ভাগ্য ও দুর্ভোগের জন্য বিলাপ। পালাটি হইতে জানা যায় যে, প্রথমে আরাকানরাজ সুধর্মের সহিত শাহ শুজার বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল এবং এই সখ্যসূত্রেই শাহ শুজা তাঁহার এক কন্যাকে আরাকানরাজের বাড়ীতে 'নাইয়র' করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ আরাকানরাজ তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আটক করেন এবং সুজা-পরিবারকে হত্যা করেন। সুজা-তনয়া তাই পিতাকে স্মরণ করিয়া এই বলিয়া বিলাপ করিয়াছে—'কি নাইয়র করালি বাপ ঠেইকলাম মঘ্যার হাতে।' বিলাপের শেষাংশে সুজা-তনয়া

সমাজ-চিত্র

৮২ The History of Bengal (D. U.) p 215
বিক্রমপুরের ইতিহাস—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত পৃ ১০১
৮৩ পূর্ববঙ্গ গীতিকা ২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা

তাঁহার বন্দিনী জীবনের দুর্ভোগ-বর্ণনাসূত্রে অনন্যোপায় হইয়া অখাদ্য নাপ্‌পী গ্রহণ, কৃষ্ণবর্ণ থামী পরিধান ও কর্ণে স্বর্ণের নাধং দিবার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়াছে। 'পরীবানুর হাঁহলা' পালাটির মধ্যে কিছু ভিন্ন কাহিনী পাওয়া যায়। 'সুজাতনয়ার বিলাপে' আছে যে, আরাকান-রাজ শুজার উক্ত তনয়া ব্যতীত অপর সকলকেই সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করেন কিন্তু এই পালাটিতে তাহার পরিবর্তে পরীবানুর প্রতি রাজার দৃষ্টি পড়ায় সুজা ও তাঁহার পত্নীব সমুদ্রগর্ভে আত্মোৎসর্গের বর্ণনা আছে। গানটিতে শাহ শুজার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রথমে চট্টগ্রাম এবং পরে আরাকান যাত্রার কথা আছে। উপরোক্ত পালা দুইটি ইতিহাসাশ্রিত। ভাগ্যবিড়ম্বিত পর্যুদস্ত শাহ শুজা যে শত্রু-অনুসৃত হইয়া প্রথমে চট্টগ্রাম ও পরে আরাকান যাত্রা করিযা আরাকান রাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন ইতিহাসেও তাহাব সমর্থন পাওয়া যায়। বার্ণিয়ার তাঁহার ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে শাহসুজার এই বিড়ম্বিত আরাকান যাত্রার উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য বার্ণিয়ারের মতে শাহসুজা পর্তুগীজ পরিচালিত জাহাজে চড়িয়া ঢাকা হইতে আরাকান যাত্রা করেন। আরাকানবাজ প্রথমে সুজাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া তাঁহার বসবাসেব সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন কিন্তু কিছুকাল পরে হঠাৎ সুজার প্রতি সকল সৌজন্য পরিহারপূর্বক তিনি সুজাকে কন্যাদান অথবা আশ্রয় পরিত্যাগের নির্দেশ দেন। প্রথম পালাটিতে আরাকানরাজ কর্তৃক সুজাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করার যে বিবরণ আছে ঐতিহাসিক চার্লস ষ্টুয়ার্ট তাহা সমর্থন করিলেও তাঁহার স্ত্রী-কন্যা সম্পর্কে কিছু ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন।[৮৪] যে আরাকানরাজ শাহ সুজাকে বঙ্গোপসাগরে

---

৮৪ The wife and daughter of Shuja, in a fit of despair threw themselves into the river, they were not however permitted to escape so easily, they were seized, carried with all the other females to the Raja's palace. When the Raja had the insolence to wait upon Pieree Banu (the beloved Princess) who was celebrated in Bengal for her wit and beauty, she drew a dagger and attempted to stab the wretch , but failing in her design, she turned it against herself and fell by her own hand. Of the three daughters, two are said to have put an end to their misfortunes by poison, the third was forcibly married to the Raja but did not long survive her disgrace. The History of Bengal. —C. Stewart p 277

ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন ত্রিপুরার রাজমালায় তাঁহার নাম "সদ্ধ-সু-ধর্ম" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই দুই ঐতিহাসিক বিবরণেই শাহসুজা ও আরাকানরাজের মধ্যে প্রথমে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব এবং পরে কঠোর শত্রুতার উল্লেখ পাই। আরাকানরাজের এই কর্তব্য-বিস্মৃতি ও শত্রুতাসাধন আকস্মিক ঘটনা নহে। ষ্টুয়ার্ট সুজাকে বিতাড়নের পশ্চাতে বাংলার শাসনকর্তার হস্তক্ষেপের ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই পালা দুইটির বিবরণ অনুযায়ী শাহসুজার পত্নী ও কন্যার অপরূপ রূপলাবণ্য, সুজা কর্তৃক রূপোন্মত্ত আরাকানরাজের বিবাহপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি ঘটনা সুজা পরিবারের প্রতি আরাকানরাজের শত্রুতা সাধনের যে ইন্ধন জোগায় নাই তাহা বলা যায় না। আরাকানরাজের রূপোন্মত্ততার জন্য শাহসুজা এবং তাঁহার পরিবারবর্গের যে পরিণতি ঘটে তাহার করুণ প্রতিধ্বনি যেন এই পালা গান দুইটির সুরের সহিত মিশিয়া আছে। শাহাজাদা সুজা জীবনের বিনিময়েও স্বীয় বংশমর্যাদা রক্ষার জন্য যে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন দুইটি পালা গানেই তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সুজা-পরিবারের পূর্বোক্ত মৃত্যু কাহিনী সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ থাকিলেও এই দুইটি পালার রচয়িতা ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী অবলম্বনে যে করুণরস সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা পালা দুইটিকে কাব্যপর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। এই আরাকানরাজ ও শাহ শুজার উল্লেখ সমসাময়িক মুসলমান কবি দৌলত কাজী ও আলাওলের কাব্যে পাওয়া যায়। আলাওলের 'ছয়ফলমুলুক বদিউজমাল' নামক কাব্যে আরাকানরাজ সুধর্মের প্রশংসা এবং শাহ শুজার আরাকান-বাসের উল্লেখ আছে। সুধর্মের প্রশস্তি গাহিয়া কবি তাঁহার রাজ্যসীমা বর্ণনা করিয়াছেন নিম্নোদ্ধৃত ছত্রে —

করুণ রস

পশ্চিমে মুল্লুকভার চিন না পায় তার
ভুবনে নাইক সম বীর।
দক্ষিণে সাগর সীমা উত্তরে পর্বত হিমা
মধ্যে যত পর্বত কানন॥

শাহ সুজার আরাকানে আগমনে আরাকানরাজের সহর্ষ অভ্যর্থনারও কবি উল্লেখ করিয়াছেন —

পরদেশী আইসে শুনি হরষিত নৃপমণি
স্নেহ করি সাদরে অনন্ত।

পর্তুগীজ ও ফিরিঙ্গী দস্যুদের জলপথে লুণ্ঠনের উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে

করিয়াছি। এই পর্তুগীজ ও ফিরিঙ্গী দস্যুরা আরাকান-রাজার সাহায্য-পুষ্ট হইয়া বাংলাদেশের উপর প্রায় বাৎসরিক লুণ্ঠনকার্য্য চালাইত। জানা যায় যে, সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল হইতে শায়েস্তা খাঁ কর্তৃক চট্টগ্রাম অধিকারের সময় পর্যন্ত (১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ) ক্রমাগত জলপথে বাংলা দেশে প্রবেশ করিয়া ইহারা অবাধ লুণ্ঠন, অপহরণ ও অত্যাচার করিত। শুধু জলপথেই নহে, দেশের মধ্যেও প্রবেশ করিয়া ইহারা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষ হরণ এবং ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিতে অভ্যস্ত ছিল। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ফার্সি ভাষায় লিখিত প্রামাণিক ইতিহাস হইতে চাটিগ্রাম বিজয় ও চাটিগ্রামে ফিরিঙ্গি-মগ জলদস্যুদের অত্যাচারের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।[৮৫] "নসরমালুম"[৮৬] নামক পালাগানটির মধ্যে নসর-মালুমের নৌযাত্রাকালে এই হার্মাদের আকস্মিক আগমনের উল্লেখ করিয়া কবি তাহাদের বেশভূষা চালচলন ও অস্ত্রশস্ত্রের এক বর্ণনা দিয়াছেন,—

ফিরিঙ্গী ও মগ হার্ম্মাদ

দূরে থাকি ডাকুর দল তুরমি ধরি চায়।
দেখিয়া নছরমালুম করে হায়রে হায়॥
দশবার জন আইলো তারা কালো জঙ্গি পরি।
কারো গায়ে লালকোর্ত্তা মাথাতে পাগড়ি॥
কোমরেতে তলোয়ার হাতেতে বন্দুক।
ছরদ হইয়া গেল নছরের বুক॥
দাড়িমাল্লা ছিল যত ছুয়ানি টেণ্ডল।
হাত পা লাড়িতে তারার গায়ৎ নাইরে বল॥

পরবর্তী কয়েক ছত্রে যুদ্ধে পরাজিত মগ দস্যুদের চট্টগ্রাম পরিত্যাগের সময় লুণ্ঠিত ধনরত্ন মাটীতে পুঁতিয়া রাখিয়া পলায়নের কথা আছে। এই লুক্কায়িত ধনরত্নের লোভে পরে তাহারা মধ্যে মধ্যে আসিয়া মাটী খুড়িয়া ধনরত্ন লইয়া যাইত। মগদের এইভাবে সর্বস্ব ফেলিয়া পলায়ন-কাহিনী হইতে চট্টগ্রামে 'মগধাওনি' কথার প্রচলন হয়। বাংলার শাসনকর্তা শায়েস্তা খাঁ ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মগদের পরাজিত করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করেন। চট্টগ্রাম শব্দটি আধুনিক। চাটিগ্রামই চট্টগ্রামের প্রাচীন ঐতিহাসিক রূপ। চট্টগ্রাম শব্দটি প্রচলিত হয় প্রায় ঊনবিংশ শতক

৮৫ J.A.S.B. June 1907, pp 405-425
৮৬ পূর্ববঙ্গ গীতিকা ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা

হইতেই।[৮৭] আরাকানরাজ এই যুদ্ধে পর্তুগীজদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু শায়েস্তা খাঁ কৌশলে অনেক পর্তুগীজকে হস্তগত করেন। তাঁহার নিকট ভীষণভাবে পরাজিত হইয়া মগেরা তীরবেগে চট্টগ্রামের পার্বত্যপ্রদেশে পলাইয়া আত্মরক্ষা করে। এইভাবে হঠাৎ দ্রুত পলায়নের জন্য তাহাদের পক্ষে লুণ্ঠিত ধনরত্ন মাটীর নীচে পুঁতিয়া রাখিয়া যাওয়া এবং সেইসূত্রে পুনরায় সুবিধামত সময়ে আসিয়া গুপ্তরত্নোদ্ধারের চেষ্টা অস্বাভাবিক নহে। 'নূরন্নেহা ও কবরের কথা' [৮৮] নামক পালা হইতে হার্মাদ সম্বন্ধে আরো কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই দস্যুদল দেশীয় সুন্দরী রমণীদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বলপূর্বক গ্রহণ করিত। এইভাবে চট্টগ্রামের নিকটস্থ বঙ্গোপাসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলের পর্ত্তুগীজ দস্যুদের সহিত দেশীয় স্ত্রীলোকদের সংশ্রবের ফলে তথায় একটি বর্ণসঙ্কর জাতিরও উদ্ভব হয়। শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায বাঙ্গালীর জাতি সমন্বয়েব ধারা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বাঙ্গালীর সহিত বিভিন্ন জাতির রক্তের সংমিশ্রণ সম্পর্কে আলোচনার মধ্যে বাঙ্গালীর রক্তে আরাকান-মগপ্রভাবের যে উল্লেখ করিয়াছেন এস্থলে তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে। "ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে পর্ত্তুগীজ ও মগ জলদস্যুর উৎপাতে বাংলার সমুদ্র উপকূলশাযী জেলাগুলি পর্যুদস্ত হইয়াছিল; ইহারা চুরি, ডাকাতি করিয়া মেযে ধরিযা লইযা আসিত আরাকান প্রভৃতি অঞ্চল হইতে এবং এদেশ হইতে বাহিরে লইযা যাইত। এই সব মেয়ে বিক্রয় করাই ছিল ইহাদের ব্যবসা। বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থান ছিল এই ব্যবসার কেন্দ্র। এইভাবে কিছু কিছু মগ রক্তও বাঙালীর রক্তপ্রবাহে সঞ্চারিত হইয়াছে। 'ভরার মেয়ে'র যে গীত ও প্রবাদ কাহিনী আমাদের দেশে প্রচলিত তাহাও নিরর্থক স্বপ্নকল্পনা মাত্র নয়। এইভাবেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাংলা দেশে জাতিসমন্বয় চলিয়াছে, চলিতেছে এবং সমগ্র জীবনপ্রবাহকে সমন্বিত গতি ও রূপদান করিতেছে।"[৮৯] বাঙ্গালীর সম্ভ্রান্ত পরিবারসমূহের মধ্যেও এই সমস্যা দেখা দিয়াছিল। এই সূত্রে তৎকালে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে "মগদোষে"র উল্লেখ আছে বিভিন্ন কুলপঞ্জিকার মধ্যে। ঘটকের এই ছড়াগুলি বহু করুণ ঘটনার

মগ প্রভাব

মগদোষ

---

৮৭ Independent Sultans of Bengal—N .K. Bhattasali Vol IV p 119

৮৮ পূর্ববঙ্গ গীতিকা ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা

৮৯ বাঙালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায় পৃ ৫৫

ঐতিহাসিক উপকরণ হইয়া আছে।[১০] এই মগ দস্যুদের কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য বাণিজ্য-নৌকাগুলি সমুদ্রপথে একা যাইত না, বহু ডিঙা একত্র হইয়া যাত্রা করিত। আলোচ্য পালাটিতে জেলেদের সহিত দস্যুদের সংঘর্ষের এক চমকপ্রদ বর্ণনা আছে। এই বর্ণনা হইতে জানা যায় যে দস্যুরা ইহাদের নৌকা আক্রমণ করিলে ইহারা কখনো শক্তিবলে, কখনো কৌশলে সুবিধামত এই দস্যুদের জব্দ করিতে চেষ্টা করিত। হার্মাদদের প্রতিরোধী হিসাবে অন্যত্র চাষীর উল্লেখও আছে। এখানে জেলেদের তৎপরতার বর্ণনায়—

কয়েকজন জাইল্যা তথায় সাইগরে মাছ ধরে।
…জাইল্যার লুকায় ডাকুরা সব উড়িল দলে বলে॥
…কেহ নৈল পালর বাঁশ, কেহ নৈল পই।
কেহ কেহ উজাইল ধামাদাও লই॥
ডাঙ্গার সুরু হৈলরে সেই ধু ধু বালুর চরে।
কারো মাথা ফাড়ি গেলগে, কেহ গেল মরে॥
হাইল্যার মধ্যে একজন বয়সে সেই বুড়া।
তড়াতড়ি আইল্ লগই মরিচের গুড়া॥
মরিচের গুড়া আনি কি কাম করিল।
মুট করি ডাকাইতের চোগে মেলা দিল॥
ভোম খাইয়া পড়ে ডাকাইত বালুর উপর। ইত্যাদি।

যেন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সাঁওতাল, গারো এবং কুকী প্রভৃতি অসভ্য বন্যজাতির লোকেরা মাঝে মাঝে দলবদ্ধভাবে পাহাড় হইতে নামিয়া নিম্ন সমতলভূমির অধিবাসীদের আক্রমণ করিত। এইরূপ উল্লেখ কয়েকটি পালা গানে পাওয়া যায়। 'শীলাদেবী'[১১] নামক পালায় ব্রাহ্মণ রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়া মুণ্ডা দস্যুর দলবলসহ আক্রমণ এবং পরিশেষে ত্রিপুরার রাজার নিকট পরাজয় স্বীকারের বর্ণনা আছে। 'রাজা রঘুর পালা'[১২] 'রাণী কমলা'[১৩] পালার শেষাংশ। রাজা জানকীনাথের মৃত্যুর পর জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান ঈশা খাঁ দুর্গাপুর অবরোধ,

১০. বাঙ্গালায় মঘ দৌরাত্ম্যের বিবরণ—প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫৩
১১ পূর্ববঙ্গ গীতিকা—৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা
১২ ঐ
১৩ ঐ

অধিকার এবং পঞ্চমবর্ষীয় রাজা রঘুনাথকে বন্দী করিলে সেই সংবাদ রাষ্ট্র হইবার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র গারো সৈন্য শিশুরাজার জন্য ব্যাকুল হয় এবং তাঁহার উদ্ধার সাধনের জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠে। রাজভক্ত পাহাড়ী প্রজাদের ব্যাকুলতার এই চিত্র উল্লেখযোগ্য।

রাজারে বান্ধিয়া নিছেরে আরে যত
পরজা লুডায় কাঁদিয়া।
থমরম লাগ্যা গেছে সুসুঙ্গ মুলুক জুড়িয়া।
গারুলীর যত গাড় আইল নামিয়া।
মুলুক ভাঙ্গিয়া তারা পাগল হইয়া ফিরে।
কেমুন হিম্মতি বেটার রাজারে নিছে ধইরে॥

দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন যে, 'রাজা রঘুনাথ সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমকালবর্তী এবং পালা গানটিও সম্ভবতঃ তাঁহার সময়ে কিংবা অব্যবহিত পরে রচিত হইয়া থাকিবে।[৯৪] 'বীরনারায়ণের পালায়' [৯৫] রাজা-প্রজার সম্বন্ধ, প্রজার স্বাধিকার অর্জন এবং স্বমত প্রতিষ্ঠার দার্ঢ্য লক্ষণীয়। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গবাসীর ন্যায় পূর্ববাংলার প্রজাগণ রাজার দুঃশাসনকে প্রজার পাপের ফল বলিয়া নীরবে সহ্য করিতে অভ্যস্ত ছিল না। এই পালায় দেখা যায়, ক্রোধবশে প্রজারা অত্যাচারী রাজাকে হত্যা করার ইচ্ছাও ব্যক্ত করিতেছে। দশম শতকের পাল বংশীয় নরপতি মহীপালের গীত সম্বন্ধে নানা প্রবাদ চালু থাকিলেও এযাবৎ কোন গীত আবিষ্কৃত হয় নাই। পূর্ববঙ্গ গীতিকার মধ্যে 'মহীপালের গান [৯৬] নামক একটি পালা রহিয়াছে। এই পালায় রাজা মহীপাল কর্তৃক দীঘি খননের উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়। "মহীপাল রাজা কেটেছে দীঘী আমি সেই দীঘিতে যাব।' পালবংশীয় বিখ্যাত নৃপতি প্রথম মহীপাল (রাজত্বকাল আঃ ৯৮৮-১০৩৭ খৃঃ) পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন। তাঁহার রাজত্বকালে সকল দিক দিয়াই বাঙালী তাহার লুপ্ত গৌরব ও মহিমায় যেন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নানাবিধ সংস্কারের মাধ্যমে দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া মহীপাল বাঙালীর মনে এতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হন যে, নৃপতি মহীপালের কথা তখন গৃহস্থের কুটীরে কুটীরে নরনারীর মুখে মুখে

৯৪ পূর্ববঙ্গ গীতিকা ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা ভূমিকাংশ
৯৫ ঐ " "
৯৬ ঐ " "

ফিরিত। এমন কি ধান ভাঙ্গিতেও বহুকাল প্রচলিত শিবের গীতের পরিবর্তে বঙ্গললনাগণ মহীপালের গান করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।[৯৭] মহীপাল বিভিন্ন জেলায় বড় বড় দীর্ঘিকা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই পালাটিতে রাজা মহীপাল কর্তৃক খনিত অনুরূপ এক দীঘির উল্লেখ শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করিয়া আজিও পাল বংশীয় নৃপতি মহীপালের বদান্যতার পরিচয় বহন করিতেছে। 'চাঁদরায় সোনারায়'[৯৮] নামক পালায় ঐতিহাসিক পুরুষ চাঁদরায়ের পিতা কৃষ্ণ চৌধুরী এবং পুত্র সোনারায়কে আশ্রয় করিয়া কবি কল্পনার জাল বোনা হইয়াছে। এই জাতীয় পালাগুলিতে ইতিহাসের উপকরণ এবং কল্পনার সংমিশ্রণে এক অভিনব রসসৃষ্টি করা হইয়াছে। এই পালায় রাজনৈতিক ঘটনারও বিবরণ আছে, কিন্তু নৈসর্গিক দুর্বিপাকগ্রস্ত প্রজাদের খাজনা সংস্থানের ব্যর্থ প্রয়াসের চিত্রটি সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বাসুদেবে ডাক দিয়া কয় ভগমানের ঝি।
খেতের বাইগন যে ফুরাইল খাজনার উপায কি ?
ঝারে আছে বরাক বাঁশ গুড়িখানা দড়।
এক টক্কার বাঁশ বেচিয়া খাজনার জোগাড় কর॥
দারুণ বৈশাখের ঝড়ে ঝাড় পইরাছে মারা।
আইল ময়না ফকির গলায় বানল ডুরা॥
গলায় বান্ধিয়া ডুর টাঙ্গায় গাছের ডালে।
মচ্চির না ধূয়া দিয়া সামল সামাল বলে॥

এতক্ষণ আমরা যে পালাগানগুলির আলোচনা করিয়াছি তন্মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনা সূত্রের সহিত নরনারীর প্রেম কাহিনীও কোথাও কোথাও যুক্ত আছে কিন্তু এই গানগুলির মধ্যে নায়ক-নায়িকার চারিত্রিক অমর্যাদাকর কোন চিত্রই আমরা পাই নাই। কিন্তু এখন আমরা 'চৌধুরীর লড়াই'[৯৯] নামক যে পালাটির আলোচনা করিতেছি তাহা হইতে জানা যায় নোয়াখালির প্রসিদ্ধ চৌধুরী পরিবারের অযোগ্য সন্তান রামচন্দ্র চৌধুরী এই পালার নায়ক। হীন তন্তুবায়ের স্ত্রীলোক হইতে স্বীয় গুরুবংশীয় রমণী পর্যন্ত কেহই তাহার লালসা-বহ্নি হইতে

৯৭ বাঙালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায়, পৃ ৪৮৫
৯৮ পূর্ববঙ্গ গীতিকা ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা
৯৯ বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, সন ১৩১২ অতিরিক্ত সংখ্যা

পরিত্রাণ পায় নাই। পালাটি সম্পর্কে নোয়াখালির ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে লিখিত হইয়াছে যে, এই পরগণার সত্বাধিকারীদের মধ্যে রাজচন্দ্র নামক এক ব্যক্তি রঙ্গমালা নামক কোন নর্ত্তকীর প্রেমে পড়িয়া ভয়ানক জ্ঞাতিবিরোধের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই ঘটনা 'চৌধুরীর লড়াই' নামক প্রচলিত মানে পাওয়া যায়। নটজাতীয় (নর) আস্মানরের কন্যা রঙ্গমালার অপরূপ রূপলাবণ্যমুগ্ধ রাজচন্দ্র তাহার মনতুষ্টির জন্য তাহার কথায় আস্মানরের নামে এক দীঘি খনন করান এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকেও নরের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। স্বীয় খুল্লতাত রাজেন্দ্রনারায়ণও নিমন্ত্রিত হন। অপমানিত খুল্লতাত সেনাপতি চাঁদভাণ্ডারীকে আস্মানরের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগের আদেশ দেন। চাঁদভাণ্ডারী ক্রোধের আতিশয্যে রঙ্গমালার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া আনেন। রাজচন্দ্র প্রতিশোধ স্পৃহায় নিকটবর্ত্তী বড় জমিদার ইঙ্গা চৌধুরীর শরণাপন্ন হন। এদিকে চাঁদ ভাণ্ডারী কৌশলে বৃদ্ধ চৌধুরীকে হত্যা করিলে তাঁহার একটি পুত্র পলাইয়া মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাহার মাতুল মনোহর গাজী বহু সৈন্য সহ রাজেন্দ্রনারায়ণের বাড়ী আক্রমণ করে। বৃদ্ধ রাজেন্দ্রনারাযণ পলায়ন করেন এবং রাজচন্দ্র পুনরায় বাবুপুরের গদীতে অধিষ্ঠিত হন। অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক দুরবস্থার ইহা একটি প্রতিচ্ছবি।

বাখরগঞ্জ জেলার কীর্ত্তিপাশা গ্রামের জমিদার রাজকুমারবাবু তাঁহার দেওয়ান কিশোরী মহলানবিশের নিকট হিসাব দেখিতে চাওয়ায় কিভাবে বিষ মিশ্রিত মিশ্রী জল খাইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন 'রাজকুমার বাবুর পরিণাম' নামক একটি ছড়ায় তাহার উল্লেখ আছে। ছড়াটির বিবরণ "বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণে" ১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যায় আছে।[১০০] ভণিতা হইতে জানা যায় কবির নাম গঙ্গারাম। কবিতাটির শেষাংশ হইতে জানা যায় ক্ষমতার লোভে রাজকুমারবাবুকে হত্যার যে ষড়যন্ত্র হয় সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ইংরেজদেরও যোগসাজস ছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্র সার্থক হইলেও পাপের বিধিদণ্ড শাস্তিস্বরূপ চক্রী মহলানবিশ পলায়নকালে সুন্দরবনের ব্যাঘ্র কবলিত হয় বলিয়া জানা যায়।[১০১]

---

১০০ বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ'—সাহিত্যবিশারদ আবদুল করিম সাহেব সঙ্কলিত। এইছড়াটির নাম সম্পাদক প্রদত্ত। পদসংখ্যা ৩৯

১০১ Folk Literature of Bengal—D. C. Sen p 157

'ছুরতজমাল ও অধুয়া সুন্দরী'[১০২] নামক পালাটি বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ান বংশের আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত হইলেও এই পালায় বর্ণিত চরিত্রের নামের সহিত দেওয়ান বংশের বংশলতার কোন সাদৃশ্য নাই। এই পালায় বর্ণিত অধুয়াসুন্দরী এবং জামালখাঁর প্রেমকাহিনীর সম্ভাব্য কারণের আলোচনা প্রসঙ্গে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন যে দুইটি কথা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। প্রথম কারণ হিসাবে তিনি মুসলমান শাসকগোষ্ঠির সুন্দরী হিন্দু মহিলাদের প্রতি আকর্ষণের কথা বলিয়াছেন। দ্বিতীয়ত তিনি বলেন যে, মুসলমান দেওয়ানগণের অনেকেই পূর্বে হিন্দু ছিলেন কিন্তু যে কোন কারণেই হউক মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করায় হিন্দুরা তাঁহাদের ধর্মত্যাগী ও অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করিতেন। ক্ষমতাশালী মুসলমান দেওয়ানেরা হিন্দুদের এই অপমানমূলক আচরণের প্রতিশোধ লইতেন হিন্দু রমণীদের বলপূর্বক অপহরণ ও বিবাহ করিয়া। বহু পল্লীগীতিকায় আমরা অনুরূপ কাহিনী পাইয়াছি সুতরাং এই সকল কাহিনীর মধ্যে উক্ত সমস্যা যে মাথা তোলে নাই তাহা বলা যায় না। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের উক্তির পরবর্তী অংশ—"এই সমস্ত মুসলমান যদি পারস্য অথবা অন্য কোন পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে আসিয়া এদেশে হিন্দুদের প্রতিবেশীরূপে বসবাস না করিতেন তাহা হইলে হিন্দু মহিলাদিগের প্রতিও হয়ত তাঁহাদের এরূপ লুব্ধ দৃষ্টি পড়িত না"—ঠিক সমর্থন করা যায় না। মুসলমান শাসনকর্তা কর্তৃক হিন্দুনারী অপহরণের উল্লেখ অন্যত্রও বিরল নহে। 'পদ্মপুরাণের' রচয়িতা বিজয়গুপ্ত কাজী কর্তৃক হিন্দুনারী অপহরণ ও নিকা করার কথা লিখিয়াছেন।[১০৩] এই কাজী পূর্বে যে হিন্দু ছিলেন না বিজয় গুপ্ত 'হাসান-হোসেন সংবাদে' তাহা উল্লেখ করিয়াছেন এই বলিয়া—

> পঞ্চছন্দে নানা বাদ্য বাজেত তথায়।
> আওয়াজে বার্তা পাইল হোসেনের মায়॥
> সেই ছিল হিন্দুর কন্যা তার কর্ম ফলে।
> বিবাহ করিল কাজী ধরি আনি বলে॥
> হিন্দুর দেবতা বুড়ী ভালমতে জানে।
> আবাসে রহিয়া মোল্লা হিন্দুয়ানি না জানে।
> আসিল হিন্দুর বেটি বড় দৈবফলে॥

---

১০২ পূর্ববঙ্গ গীতিকা ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা

১০৩ পদ্মাপুরাণ—বিজয়গুপ্ত পৃ ৫৬

শুধু মুসলমান শাসনকর্তারাই নহে, পর্তুগীজ দস্যুরাও যে সুন্দরী হিন্দু নারীদের অপহরণ করিয়া লইয়া যাইত তাহার বিবরণ আমরা ইতিপূর্বেই পাইয়াছি। অবশ্য কোন সময়েই যে কোন মুসলমান শাসক হিন্দুবিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া হিন্দু কন্যা অপহরণ করেন নাই তাহা নহে, কিন্তু বলা বাহুল্য হিন্দু নারীর প্রতি তাহাদের আকর্ষণের প্রধান উদ্দীপনা ছিল রূপজ মোহ। এই সকল পালা গানের অধিকাংশই মুসলমান কবি বিরচিত। কিন্তু তাই বলিয়া এই সকল গায়ক হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন এবং বিদ্বেষবশতঃই তাঁহারা হিন্দু কন্যার প্রতি মুসলমান শাসনকর্তাদের প্রেমকাহিনী ফাঁদিয়া ছিলেন এমন কথাও বলা যায় না। বরং দেখা যায় এই কবিদের মনে ধর্ম সম্পর্কে কোনরূপ গোঁড়ামী বা সংস্কার ছিল না। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকেই তাঁহারা সমান জ্ঞানে গ্রহণ করিযাছেন। এই সকল ধর্মভীরু সরল গ্রাম্য কবি উভয় সম্প্রদায়ের দেবতার উদ্দেশেই সমান শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্ম সম্বন্ধে ইহাদেব উদার মনোভাব এবং সহৃদয় চিত্তের অনুভূতি গানগুলিকে যেন আরো মধুর করিয়া তুলিয়াছে।

গিরিয়া, পলাশী প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানের যুদ্ধবিষয়ক কয়েকটি গ্রাম্য ছড়া পাওয়া গিয়াছে। বাংলা দেশের নিরক্ষর অথবা অর্ধ-শিক্ষিত গ্রাম্য-কবিগণ সমসাময়িক ঘটনা লইয়া এইরূপ বহু ছড়া রচনা করিতেন। লোকমুখে ছড়াগুলি গীত হইত—কখনো বা জনগণ কোন স্থানে সমবেত হইয়া বাংলার শেষ যুদ্ধক্ষেত্রের বীরত্ব কাহিনী শুনিতেন, আবার ভিক্ষাজীবীদের মুখেও এই সব গান শোনা যাইত। সেজন্য ছড়াগুলির রচয়িতার কোন পরিচয় জানা যায় না।

গ্রাম্য ছড়া

মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ গিরিয়া প্রান্তরে দুইটি যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম যুদ্ধ হয় বাংলার নবাব সরফরাজ খাঁর সহিত পাটনার শাসনকর্তা আলীবর্দী খাঁর। এই যুদ্ধের ফলে সরফরাজ খাঁ পরাজিত ও নিহত হন এবং আলীবর্দী বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হন। দ্বিতীয় যুদ্ধ ঘটে নবাব মীরকাসেমের সহিত ইংরাজ সৈন্যের। মীরকাসেমের ইংরেজ দমন প্রচেষ্টায় ইহাই শেষ যুদ্ধ। ইহার পর প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সহিত ইংরেজদের আর কোন যুদ্ধ হয় নাই। এই যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশে ইংরেজ প্রভুত্ব এবং মীরকাসেমের বিদায়গ্রহণ সুনিশ্চিত হইয়া যায়।

গিরিয়া যুদ্ধ

গিরিয়ার নবাব সরফরাজ খাঁর সহিত আলীবর্দী খাঁর যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি গ্রাম্য ছড়া নিখিলনাথ রায় রচিত 'মুর্শিদাবাদ কাহিনীর' মধ্যে

সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।[১০৪] ছড়াটি যে স্থানে শেষ হইয়াছে তাহাতে ইহা অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। এই জাতীয় গ্রাম্য ছড়াগুলি কাব্যাংশে খুব উৎকৃষ্ট না হইলেও অনেকক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুর ঐতিহাসিকত্ব ইহাদের মূল্যবৃদ্ধি করিয়াছে। আলোচ্য ছড়াটিও ইতিহাসাশ্রয়ী। প্রভুভক্ত বীর সেনানীর প্রতি কবির সহানুভূতিও একান্ত অকৃত্রিম এবং প্রগাঢ়।

নবাব সরফরাজ খাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আলীবর্দীকে বাংলা-বিহার উড়িষ্যার একেশ্বর করিবার জন্য সরফরাজ খাঁর মন্ত্রী হাজি আহম্মদ এবং জগৎশেঠ, ফতেচাঁদ, রায়রাঁয়ান আলমচাঁদ প্রমুখ ক্ষমতাশালী রাজপুরুষগণ যে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করিতেছিলেন সেই ষড়যন্ত্র সার্থক করিবার জন্যই হাজী আহম্মদ আলীবর্দী খাঁকে তাঁহার পারিবারিক বিপদের ছলে ডাকিয়া পাঠান। আলীবর্দী সসৈন্যে পাটনা হইতে যাত্রা করেন এবং জগৎশেঠকে গোপনে এক পত্র পাঠাইয়া প্রকাশ্যে নবাব সরফরাজ খাঁর নিকটও একটি পত্র দেন। কিন্তু আলীবর্দীর এই ধূর্ততাপূর্ণ পত্রে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া সরফরাজ খাঁ যুদ্ধসজ্জা করিতে আদেশ দেন। এই গ্রাম্য ছড়াটির প্রারম্ভেই উভয় পক্ষের এই যুদ্ধযাত্রা ও সৈন্যসজ্জার কথা বর্ণিত হইয়াছে,—

নবাবের তাম্বু পড়িল ব্রাহ্মণের স্থলে,
আলিবর্দীর তাম্বু তখন পড়িল রাজমহালে॥
নবাবের তাম্বু যখন পড়িল দেয়ান সরাই,
আলিবর্দীর তাম্বু তখন আইল ফরক্কায়।
নবাবের তাম্বু আইল থামরা সরাইতে,
আলিবর্দীর তাম্বু তখন সুতীর দরগাতে।
নবাবের তাম্বু পড়িল গিরিয়ার মাঠেতে॥
আলিবর্দীর তাম্বু তখন পড়িল পিপিলাতে॥

ছড়ার বর্ণনার সহিত ঐতিহাসিক তথ্যের কোন প্রভেদ নাই।[১০৫] 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' প্রণেতাও লিখিয়াছেন—আলীবর্দী খাঁ পাটনা হইতে মুর্শিদাবাদাভিমুখে ধাবিত হইয়া রাজমহল, ফরক্কা ও পরে সুতীর নিকট ভাগীরথীর মোহানার নিকটস্থ শাহ মোর্ত্তাজা হিন্দীর সমাধিস্থল হইতে জঙ্গীপুরের নিকট বালিঘাটা পর্যন্ত শিবির সন্নিবেশ করিয়া পিপিলা

১০৪ মুর্শিদাবাদ কাহিনী—পরিশিষ্ট পৃ ৬১১ দ্রষ্টব্য

১০৫ Riyaz-us-Salatin—English tr. by Abdus Salam pp 310-314

পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। নবাব সরফরাজ খাঁ মুর্শিদাবাদ হইতে যাত্রা করিয়া প্রথম দিনে বামনিয়া, দ্বিতীয় দিনে দেওয়ান সরাই ও তৃতীয় দিনে খামরায় উপস্থিত হন।[১০৬]

ছড়ার কিয়দংশ কথোপকথনমূলক। আলীবর্দী খাঁ যখন পিপিলাতে তাঁবু ফেলিলেন সরফরাজের বিশ্বস্ত সেনাপতি,—

গোয়াস খাঁ বলিল তখন শুন নবাব তুমি
আলিবর্দীর শির এনে দিব আমি॥

তদুত্তরে যেন নবাব সরফরাজ খাঁ বলিতেছেন,—

শুন শুন ওরে গোয়াস খাঁ বলি যে তোমাকে।
ভাই জান মিলিতে আসে লড়াই দিব কাকে॥

নবাবের মুখে এই উক্তি সম্ভবতঃ আলীবর্দী খাঁর নবাবকে লিখিত পূর্বোক্ত পত্রের উপর ভিত্তি করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে। ছড়াটির স্বল্প পরিসরের মধ্যেই রচয়িতা সেনাপতি গওস খাঁর চিত্রটি যেন বীরত্বের প্রতিমূর্তিরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন।

জলদী কবে হুকুম দে রে নবাব জলদী কবে,
ঘোড়া চড়ে যাব আমি সুতীর দরগাতে।
সওয়া সের আটার মোয়া পোওয়া ভর ঘী,
একা লবে গোযাস খাঁ সকলের জী॥

জানা যায় যে, নবাব গিরিয়ায় উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রধান সেনাপতি গওস খাঁ ভাগীরথী পার হইয়া প্রায় সুতী পর্যন্ত অগ্রসর হন। সুতীতে মর্তুজা নামক এক প্রসিদ্ধ ফকীরের সমাধি ছিল। সে সময়ে দরগা মুসলমানদের বিশেষ পবিত্র স্থান ছিল, সেই সূত্রেই কবি এখানে সুতীর দরগায় জয়লাভ মানসে সিন্নি মানতের কথা লিখিয়াছেন। এই যুদ্ধে সরফরাজ খাঁর ভাগ্য বিপর্যয় যে কিরূপ ষড়যন্ত্রের ফলে সাধিত হইয়াছিল তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি এই ছড়াটিতে?

ভাল ভাল কামান সাজায়ে কামান করিল বিলি,
নবাবের কামানে ভরে ইট আর বালি॥

কোন কোন ইতিহাসে এই প্রতারণার অনুরূপ বিবরণ আছে। জানা যায়, সরফরাজের তোপখানায় গোলা-বারুদের পরিবর্তে ধূলা-বালি, প্রস্তর

---

১০৬ মুর্শিদাবাদ কাহিনী—নিখিলনাথ রায় পৃ ১১১

আবিষ্কৃত হইলে তোপখানার দারোগা সারিয়ারকে পদচ্যুত করিয়া ফিরিঙ্গী আণ্টনীর দেশজপুত্র পাঁচুকে নিযুক্ত করা হয়।[১০৭]

ছড়াটির পরিশেষ এইরূপ—

হাজার হাজার পণ্টন কেটে ময়দান করিল,
ভাল ঘোড়ায় চড়াইয়া নবাবকে বিদায় দিল।
হাতী পড়িল ঢুলঢুলিতে. ঘোড়া পড়িল রণে
পাঞ্জাদার ডুবাইল সাহস বিলের ঘোনে॥

গওস খাঁ কর্তৃক নবাবকে ভালো ঘোড়ায় চড়াইয়া বিদায় দেওয়ার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ গওস খাঁ নন্দলালের সহিত নদীর অপর পারে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, দ্বিতীয়তঃ নবাব সরফরাজ খাঁ রণক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করেন নাই। তিনি হস্তিপৃষ্ঠে (অশ্বপৃষ্ঠে নয়) যুদ্ধস্থলে প্রবেশ করেন এবং হস্তিপৃষ্ঠেই অবশেষে শায়িত হন। মুর্শিদাবাদের নবাবদের মধ্যে একমাত্র তিনিই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করেন।

গিরিয়ার এই যুদ্ধ সংক্রান্ত আর একটি কবিতা আছে। অজ্ঞাতনামা কোন কবির লেখা এই কবিতাটি আধুনিক কালের কোন শিক্ষিত ব্যক্তির রচনা বলিয়া মনে হয়। পূর্বোল্লিখিত গ্রাম্য ছড়াটির ন্যায় ইহাও ইতিহাসাশ্রিত উপরন্তু কিছু কাব্যগুণ থাকায় এই ছড়াটি আরো মনোরম। গিরিয়ার এই যুদ্ধে গওস খাঁর ন্যায় আর একজন বীর সেনাপতি নবাবের পক্ষাবলম্বনে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার নাম বিজয়সিংহ। তিনি নবাব সৈন্যের পশ্চাদভাগ রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। নবাবের পতন সংবাদ পাইয়া তিনি অল্পসংখ্যক অনুচরের সহিত আলীবর্দীর দিকে ধাবিত হন এবং এক ভীষণাকার বল্লম গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় এক গোলন্দাজের অব্যর্থ

---

১০৭ The Commander of the ordnance named Sharior Khan, a connection of the Hazy's is accused of having treacherously neglected to take to camp any short for the guns, but previous to the commencement of hostilities, the plot was discovered and a Portuguse named Panchoo, was appointed to command the artillery.
The History of Bengal—C. Stewart p 440
বাঙ্গালার ইতিহাস—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ১৩৯

গুলিতে এই রাজপুতবীর ধরাশায়ী হন—এই যুদ্ধে তাঁহার শিশুপুত্র সঙ্গে ছিল। পিতার মৃত্যু হইলে সেই নবমবর্ষ বয়স্ক বালক নিষ্কাশিত তরবারী হস্তে পিতার মৃতদেহ রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়ায়। বালকের এই অদ্ভুত সাহসের পরিচয় পাইয়া আলীবর্দী মুগ্ধ চিত্তে সৈন্যগণকে তাহার গাত্রস্পর্শ করিতে নিষেধ করেন এবং স্বীয় হিন্দু সৈন্যদিগকে বিজয়সিংহের মৃতদেহের যথারীতি সংকার করিতে আদেশ দেন। ছড়াশ্রিত এই ঘটনাটির কথা শুধু 'তারিখ-ই বাঙ্গালা' এবং 'রিয়াজ-উল্-সলাতীন' গ্রন্থে আছে।[১০৮] 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' প্রণেতা লিখিয়াছেন—যে স্থলে সেই রাজপুত বালক অলৌকিক বীরত্ব দেখাইয়াছিল, তাহাকে অদ্যাপি জালিমসিংহের মাঠ কহিয়া থাকে। গিরিয়া হইতে অর্দ্ধক্রোশের কিছু অধিক দক্ষিণপূর্বে মিঠিপুর নামে এক গ্রাম আছে। মিঠিপুর হইতে খামরা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রান্তরের নামই জালিমসিংহের মাঠ।[১০৯] ছড়াটির প্রথম কয়েক ছত্রের মধ্যেই নবাবের হস্তিপৃষ্ঠে যুদ্ধযাত্রা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর উল্লেখ আছে। পরবর্তী ছত্রসমূহে কবি মুক্তকণ্ঠে জালিমসিংহের বীরত্ব কাহিনী গাহিয়াছেন। পিতার দেহ ভস্মীভূত হইলে বালকের শোকাশ্রু বিসর্জনের বর্ণনা বাস্তবিকই করুণ এবং মর্মস্পর্শী—

বালকের অশ্রুধার যেন মুকুতার হার।
সাদরে জাহ্নবী দেবী গলায় পরিল।
হৃদয়ের আশাঙ্কুর হৃদয়ে হইল চুর
আঁধার ভবিষ্যগর্ভে শিশু ঝাঁপ দিল,
জীবনের যবনিকা অকালে পড়িল।

পরিশেষে কবি স্বদেশ এবং বিদেশের পিতৃভক্ত বালক বাদল, অভিমন্যু ক্যাসাবিয়াঙ্কার সহিত জালিমকে সমান মর্যাদা দান করিয়া তাহাদের জয়গানে কবিতা শেষ করিয়াছেন।

পলাশীর যুদ্ধ

পলাশী যুদ্ধের একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছড়া মুর্শিদাবাদ কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা কাব্যগুণ বর্জিত। ছড়ার রচয়িতা নবাবের

---

১০৮ Riyaz-us-Salatin—English tr. by Abdus Salam. p. 322.
Trrik-i-Bangala—Salimullah English tr. by Gladwin.

১০৯ মুর্শিদাবাদ কাহিনী—নিখিলনাথ রায় পৃ ১১৬

অন্যতম সেনাপতি মীরমদনের আপ্রাণ যুদ্ধ করার কথা স্মরণ করিয়া এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন যে,—

তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে রয়ে,
একলা মীরমদন বল কত নেবে সয়ে ॥'

ইহার মধ্যে মীরজাফর খাঁর নবাবের সহিত বিশ্বাসঘাতকতার যেমন ইঙ্গিত আছে তেমনি ছড়ারচয়িতা ইহাও বলিয়াছেন যে,—

'নবাব বড় শোহদা ছিল আর লম্পটে।'

ছড়ার দুই স্থলে নবাব পলাশীর ময়দানে সসৈন্যে নিহত হন এইরূপ ভ্রান্ত উক্তি দেখা যায়। পরিশেষে আছে,—

ফুলবাগে মল নবাব খোশবাগে মাটী।
চাঁদোয়া টানায়ে কাঁদে মোহনলালের বেটী ॥

কোন কোন ঐতিহাসিকের অভিমত এই যে, সিরাজ ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হইলে মীরজাফর-পুত্র মীরণের আদেশে জাফরগঞ্জের বাড়ীতে অবরুদ্ধ এবং নিহত হন। অতঃপর তাঁহার মৃতদেহ নদীর অপর পারে খোশবাগে আলীবর্দীর পার্শে সমাধিস্থ করা হয়। 'মোহনলালের বেটী' এই কথাটি সম্বন্ধে মন্তব্যপ্রসঙ্গে 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' প্রণেতা লিখিয়াছেন—মোহনলালের ভগিনীকে সিরাজ স্বীয় অন্তঃপুর-বাসিনী করিয়াছিলেন। সাধারণ লোক সেই ভগিনীকে বেটী করিয়া লইয়াছে। অনেকে ভ্রমক্রমে সিরাজের অন্যতম বেগম লুৎফন্নিসাকে মোহনলালের ভগিনী বলিয়া থাকেন। যখন তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস, তখন অশিক্ষিত লোক যে ভ্রম করিবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? সম্ভবতঃ এখানে লুৎফাকেই মোহনলালের বেটী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[১১০]

মীরকাসেমের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধবিষয়ক দুইটি গ্রাম্য ছড়াও 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'র মধ্যে পাওয়া যায়।[১১১] ছড়া দুইটির মূল বিষয়-বস্তু একই অর্থাৎ কাটোয়া এবং পলাশীর নিকট ইংরেজ এবং মীরকাসেম-সৈন্যের যুদ্ধবর্ণনা, কিন্তু দুইটি ছড়ার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। প্রথম ছড়াটিতে মীরকাসেমের বীর সেনাপতি তকীখাঁকে কাপুরুষ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয়টির মধ্যে তকী খাঁর বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ এবং সায়ান খাঁ নামক এক ব্যক্তির দাঁতে ঘাস

---

১১০ মুর্শিদাবাদ কাহিনী—পরিশিষ্ট পৃ ৬২২ দ্রষ্টব্য
১১১ ঐ পৃ ৬২২-২৩

কাটিয়া ইংরেজের বশ্যতা স্বীকারের বর্ণনা আছে। ছড়া দুইটির সংগ্রহকর্তাও ভিন্ন ব্যক্তি। প্রথম ছড়াটির রচনাকাল যে অন্ততঃ এই যুদ্ধের চার-পাঁচ বৎসর পরে তাহা জানিতে পারা যায় ছড়ার একস্থানে বহরমপুর-গড়ের উল্লেখ হইতে। মীরকাসেমের সহিত ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই ইংরেজদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ছড়াটিতে আছে—

দিবানিশি বহরমপুর গড়ে,

সাত সাহেব মুখোমুখি কিচিরমিচির করে।

বলা বাহুল্য যে এই যুদ্ধের সময় বহরমপুরের গড় নির্মিত হয় নাই। বহরমপুর ক্যান্টনমেন্ট ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়। এই যুদ্ধ কাটোয়ার যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ হইয়াছিল পলাশীর নিকটে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে। এই স্থান কাটোয়া হইতে অল্প দূরে অবস্থিত।[১১২] কাব্যরসের কথা শুনাইতে গিয়া কবি প্রথমেই একটি ভুল করিয়াছেন এই মত ব্যক্ত করিয়া—'নবাবে লুটিল কুঠী সহর কলিকাতা।' এই নবাব বলিতে ছড়ার রচয়িতা মীরকাসেমের কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মীরকাসেম কলিকাতা লুণ্ঠন করে নাই, করিয়াছেন নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা।[১১৩] প্রথম ছড়ায় মহম্মদ তকীর চিত্র ;—

ঘেরলে মামুদ তকী

ঘেরলে মামুদ তকী, তা দেখি দাঁতে কাটলে ঘাস ..

কিন্তু দ্বিতীয়টিতে অন্যরূপ ;—

পড়িল মামুদ তকী,

পড়িল মামুদ তকী, দোনের আঁখি ছুড়ছে মনের আশ

তা দেখে সয়ান খাঁ দাঁতে কাটে ঘাস।

মহম্মদ তকী খাঁ সম্বন্ধে শেষোক্ত ছড়ার বর্ণনাই সঠিক বলিয়া মনে হয় কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে তকী খাঁ যে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া মৃত্যুবরণ করেন ইতিহাস হইতে তাহা সপ্রমাণিত হয়।[১১৪] একমাত্র বঙ্কিম-চন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসে তকী খাঁকে বিশ্বাসঘাতকরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা ইতিহাস নহে, উপন্যাস

১১২ মীরকাসিম—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পৃ ১৫২

১১৩ "কৃষ্ণমালা" কাব্যগ্রন্থ হইতে জানা যায় মীরকাসেমের দেওয়ান বৃন্দাবন ঢাকার ইংরেজ কুঠী লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।

১১৪ মীরকাসিম—পৃ ১৫২

উপন্যাস মাত্র। প্রথম ছড়াটির প্রারম্ভে পলাশী যুদ্ধের বর্ণনাকালে কবি একস্থানে সূতীর বাজার দখল করার কথা লিখিয়াছেন। মনে হয় এখানে গিরিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধ বা সূতীর যুদ্ধের উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, গ্রাম্য-রচয়িতা স্থানে স্থানে নবাব মীরকাসেমের সহিত নবাব সিরাজের গোল করিয়া ফেলিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত ছত্রটি হইতে তাহা অনুমিত হয়,—

"হায় হায় বিধির ফেরে, বলবো কিরে কাঁদছে নবাবআলি।
বাইশ শ ফৌজ থাকতে আমার, জবরে লুটালি॥
কিন্তু বুঝবো তোরে।
কিন্তু বুঝবো তোরে তারাকপুরে করবো গুলিখাড়া।
বাম হোল বিধাতা বুঝি নবাব গেল মারা।

এই তারাকপুব বহরমপুরের পূর্বে এবং আমানিগঞ্জ লালবাগের দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানে সিরাজের সৈন্যাবাস ছিল। সহর রক্ষার জন্য সৈন্যদল তারাকপুব ও আমানিগঞ্জে অবস্থান করিত। "টাকাকড়ি নেয়না তারা, মানুষ মেরে ফেলে"....এই ছত্রটি তৎকালীন কোম্পানীর অত্যাচার সম্বন্ধে সাধারণ লোকের আতঙ্কের পরিচাযক। গ্রাম্য ছড়াটির অধিকাংশ স্থানের অর্থই দুর্বোধ্য।

পলাশী যুদ্ধের পরবর্তীকাল

পলাশীর যুদ্ধে ইংবেজেব ভাগ্য সুনির্ধারিত হইয়া গেলেও দেশে শাসন এবং শৃঙ্খলা স্থাপনে বহু সময় লাগিযাছিল। তাহার কারণ মোগল রাজশক্তি অস্তমিত এবং দেশে ইংরেজাধিকাব সান্যস্ত হইলেও ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে বেশ সময় লাগিযাছিল। তখনও পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য এবং অর্থ সংগ্রহের মনোবৃত্তি প্রবল থাকায় দেশে যে কি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল সমসামযিক কালের কোম্পানীর কাগজ-পত্রাদি হইতে তাহা উপলব্ধি হয়।[১১৫] এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার লিখিয়াছেন,—"সেই আঠাবো বৎসর—পলাশীর যুদ্ধ হইতে হেষ্টিংস্ কর্তৃক শাসন সংস্কার আরম্ভ পর্যন্ত বাংলার পক্ষে যে কি ভীষণ কাল ছিল, তাহা সকল সাহেব লেখকই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।"[১১৬]

দুইটি ঐতিহাসিক কবিতায় ইংরেজ শাসনের প্রথমভাগের বিচার-ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

১১৫ Fifth Report from the Select Committee on the Affairs of the East Indian Compani—Introduction.
১১৬ 'আনন্দমঠ' (সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ) ভূমিকা।

কবির নাম রামপ্রসাদ মৈত্রেয়। নিবাস পাবনা জিলার নাকালিয়া গ্রামে। প্রথম কবিতাটিতে রচনাকাল হিসাবে শুধু মাসের উল্লেখ থাকিলেও দ্বিতীয়টিতে রচনাকাল দেওয়া আছে "কার্তিক ১২২০ সাল।" সুতরাং এই প্রদত্ত তারিখটি রচনাকাল হইলে দুইটি কবিতাই ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের অন্তর্বর্তী রচনা বলা যায়।

কবিতা দুইটির মধ্যে অবশ্য ইংরেজ আমলের সুবিচার সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে তথাপি কবি চিরাচরিত সংস্কারানুযায়ী কবিতার প্রারম্ভেই ইংরেজ সওদাগর-শাসকদের ঈশ্বরের অবতাররূপে বর্ণনা করিয়া পূর্বতন অদৃষ্টবাদের উপরই আস্থা স্থাপন করিযাছেন।

প্রথম কবিতাটির প্রারম্ভ এইরূপ :

অপূর্ব্ব শুনহ সবে স্বর্গের যতেক দেবে
বিলাতে হইলা সাহেবরূপী।
ছাড়িলা আহ্নিকপূজা পরিধান কুর্ত্তি মোজা
হাতে বেত শিরে দিলা টুপী॥
বাঙ্গালার অভিলাষে আইলা সদাগর বেশে
কৈলকাতা পুরাণা কুঠি আদি॥
গতামল সুভেদারী শুভ সন বাহাত্তরী
আংরেজ আমল তদবধি॥

এই কবিতাটির নাম 'দ্বারসায়রের কবিতা' অর্থাৎ দায়রা সেসনের বিচার ব্যবস্থা এই কবিতাটির বিষয়বস্তু। দ্বিতীয় 'নাটোরের কবিতা'র প্রারম্ভেও একইরূপে 'সাহেবরূপে দেবতার অধিষ্ঠানে'র কৌতুক উদ্দীপক বর্ণনা আছে।

ইংরেজ আমলের বিচার-চিত্র

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নবাবের নিকট হইতে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী সনদ গ্রহণকালে ফৌজদারী বিচারের ভার লাভ না করিলেও কার্যত তাঁহারা সেই ক্ষমতাই পরিচালনা করিতেন।[১১৭] কবি রামপ্রসাদ আলোচ্য কবিতা দুইটিতে ইংরেজ শাসন ও বিচার ব্যবস্থার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা আদৌ অনৈতিকহাসিক নহে কিন্তু যে সকল

১১৭ "The grant of Diwani was a bestowal of a civil department well understood to be dependent on an executive authority which still remain vested

বিধিব্যবস্থার পর পর উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলি ঠিক সেইরূপ ক্রম অনু-যায়ী পর পর অবলম্বন করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। যেমন প্রথম দিকের একটি ব্যবস্থার উল্লেখ পরবর্তী সময়ের অন্য একটি ব্যবস্থার সহিত একই সঙ্গে করিলেও মধ্যবর্তী সময়ের সংস্কারের কথা তিনি উল্লেখ করেন নাই। ফলে কবির বর্ণনা হইতে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে যে, উল্লিখিত সকল ব্যবস্থাই একই সময়ে অবলম্বন করা হইয়াছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, নবাব প্রদত্ত দেওয়ানী পত্তনীর মধ্যে মোট চব্বিশটি জেলা ছিল এবং এই পত্তনীর বর্হিভূত চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর এবং বর্ধমান এই তিনটি (ceded land) জেলার রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার সম্রাট শাহ আলম কর্তৃক পৃথক ফরমানে প্রদত্ত হয়।[১১৮] কবিতা দুইটি হইতে তৎকালীন শাসন ও বিচার বিভাগের যে বিবরণ আমরা দেখিতে পাই, তাহা ঐতিহাসিক তথ্যাদি সমৃদ্ধ হইলেও তেমন সুসংবদ্ধ নহে—এজন্য গ্রাম্য কবিকেও ঠিক দায়ী করা চলে না, কারণ সে যুগে তাহা বড় সহজসাধ্য ছিল না। কোম্পানীর আমলের শাসনকালের যে সকল বিবরণ এখন আমাদের সহজলভ্য হইয়াছে সেই সময় তাহা ছিল না। প্রথম কবিতাটিতে আছে,—

বাঙ্গালায় কৈরা দিলা পাঁচ আফিস ছাব্বিশ জেলা
কেলেক্টর জজ ফৌজদার
কেলেক্টার তহশীলেতে জজ কর্তা আদালতে
ফৌজদারী আইন মতে লিখে॥
চুরি ডাকাতি ফেলশানি মাইর পীট লুটি খুনি
এসব ফৌজদার মোতালকে॥

দ্বিতীয় কবিতাটিতেও অনুরূপ বর্ণনা আছে,—

আদালত ফৌজদারি কেহ কর্ত্তা কেলট্রারি
আফিলের কর্ত্তা কেহ হৈলা।
বুঝিলাম হক বটে জজসাহেব ধর্মবটে
চিত্রগুপ্ত সঙ্গেতে দেওয়ান॥

in the Nawab but to the unbiased observer of events it must even in 1765 have been clear that it was not enough to say that the English had acquired merely a certain civil position since they had been invested with the military power.—Fifth Report etc. Introduction.

১১৮ ঐ বিবরণী পৃ ৪

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকাল সম্পর্কে প্রামাণিক বিবরণাদি হইতে যতদুর জানা যায় যে, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দেই কোম্পানী জেলাসমূহের জন্য সুপারভাইজার (Supervisor) পদের লোপ করিয়া কালেক্টার (Collector) নিয়োগ করেন এবং তাঁহাদের কার্যে সহায়তা এবং প্রয়োজন-বোধে দৃষ্টি রাখার জন্য একজন করিয়া দেশী কর্মচারীকে দেওয়ান হিসাবেও নিয়োগ করা হয়। কিন্তু এই সময় বাংলা দেশে ছাব্বিশটি জেলার বিবরণ পাওয়া যায় না—জেলার সংখ্যা আরো কমাইয়া চৌদ্দটি করা করা হয়। স্যার জন শোরের পূর্ব পর্যন্ত এইরূপ পরিবর্জন এবং পরিবর্ধন চলিতে থাকে, এবং পরবর্তী সময়ে জেলার নির্ধারিত সংখ্যা চব্বিশ করা হয়।[১১৯] অবশ্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের তদানীন্তন বিচার ব্যবস্থার বর্ণনাসূত্রে কবি বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত কর্মচারীর বিবরণ যে প্রদান করিয়াছেন তাহা তথ্যাশ্রিত এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। কবিতা দুইটির বর্ণনানুযায়ী দেওয়ানী আদালতের কর্তা ছিলেন কালেক্টর এবং তিনি দেশীয় দেওয়ানের সহায়তায় অন্যান্য আমলাদের লইয়া বিচার করিতেন এবং ফৌজদারি আদালতে তিনি জেলার কাজী এবং মুফ্‌তিদের সহায়তায় বৎসরে দুইবার (?) ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি করিতেন। বক্সী নাজির এবং মোল্লা, গঙ্গাজলীর উপস্থিতিতে বিচার কার্য চলিত। এই বর্ণনার সহিত ঐতিহাসিক তথ্যের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

"On May the 14th 1772, the Governor and council came to a determination as to "the constitutional ground work of all their subsequent proceedings" and their decision may be summarised as follows :

(3) The servants of the company employed in the districts under the designation of 'supervisiors' or supravisors were henceforth to be termed 'Collectors'.

(4) In each of the several districts a native office under the title of Diwan, should be appointed to inform or check the Collectors"[১২০]

রিপোর্টের মধ্যে অন্যত্র আছে,—"In the criminal court the cauzy and moofty of the district and two moolavis sat

---

১১৯ Fifth Report from the Select Committee on the Affairs of the East Indian Company-Introduction. Cambridge History of India Vol V (1497-1858)

১২০ ঐ

to expound the Mahomeddan Law and to determine how far delinquents were guilty of its violation. But it was the collector's duty to attend to the proceedings of his court, so far as to see that all necessary evidence were summoned and examined and that the decision passed was fair and impartial "[১২১]

প্রথম কবিতা হইতে আরো জানা যায়, যে সকল মামলা দায়রা সোপর্দ হইত সেগুলির বিচার ফৌজদারী আদালতে হইত না, কর্মচারীরা সেই মামলার নথিপত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিত এবং 'যে সাহেব অধিকারী' তিনি বৎসরে দুইবার জিলায় আসিয়া সেই সকল মামলার নিষ্পত্তি করিতেন। এই দায়রা-বিচার কাহিনীর নীরস তথ্যকে কবি প্রতিমা পূজার উপমার সাহায্যে এমন সরসভাবে বিবৃত করিয়াছেন যাহার ফলে বর্ণনাটি অত্যন্ত উপভোগ্য উঠিয়াছে। ইহার কিয়দংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

দিনেক দুই গতে হুকুম জারি ফৌজদারীতে
যেমত প্রতিমা পূজা হয়।
তবে শুন তার মজা যেমত হইল পূজা
প্রতিমা হইলা সাহেব আসি।
কাদিরা আসন করি সমুখেতে মেজ ধরি
পূজা লন পূর্ব্বমুখে বসি॥

* * * *

খড়্গ হইল কোড়া বানাত্তে বান্ধ্যাছে গোড়া
খাঁড়াইত তার জাফর খালাসী॥
চন্দন হইল কালি পুষ্প হইল কাগজগুলি
মেজের উপরে রাখে আনি।
নাহি কোশা টাট ছিপ শঙ্খ ঘন্টা ধুপ দীপ
সবে বাদ্য বেড়ির ঝনঝনি॥

অপরাধীদের স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে বেত্রাঘাত ব্যতীতও শাস্তি হিসাবে রাস্তা নির্মাণের কার্যে নিযুক্ত করার উল্লেখ এই কবিতায় পাওয়া যায়।

মালদহ কালেক্টরী হইতে প্রাপ্ত নথিপত্রের মধ্যে সাধারণ অপরাধীদের জেলখানার মধ্যে সুরকী ভাঙ্গা প্রভৃতি কার্যে এবং গুরুঅপরাধীদের, বাহিরে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিশ্রমমূলক কার্যে নিয়োগের

১২১ Fifth Report etc p 6

বিবরণ পাওয়া যায়।[১২২] পরবর্তীকালে স্ত্রীলোকের বেত্রাঘাত নিষিদ্ধ হয়। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের শুনানী এবং দায়রা কোর্টের মন্তব্য ইত্যাদি কাউন্সিলের নিকট প্রেরিত হইত এবং কাউন্সিল কাগজপত্র পরীক্ষান্তে 'হুকুম' লিখিয়া জিলায় পাঠাইতেন এবং ফৌজদারী হইতে সেই হুকুম কার্যকরী করা হইত। কবিতাটির এই বিবরণ অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যাশ্রিত। তদানীন্তন বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় প্রামাণ্য কাগজ-পত্রাদির মধ্যেও অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।[১২৩] বিচারের নামে সেই সময় যে হাস্যকর ব্যাপারের অবতারণা হইত তাহারই আরো তীক্ষ্ণ প্রকাশ ঘটিয়াছে দ্বিতীয় 'নাটোরের কবিতা'টির ব্যঙ্গাত্মক ভাষায়।

বুঝিলাম হক বটে জজ সাহেব ধর্ম্ম বটে
চিত্রগুপ্ত সঙ্গেতে দেওান।
গুণবান আমলা যত সাহেবের মনোমত
সাক্ষিরূপে পণ্ডিত প্রধান॥
কাজের কিছু নাহি ছল দুধের দুগ্ধ জলের জল
জজের আমলার ধর্ম্ম বটে।
প্রজাক ভরতের সাঁপ কলিতে প্রধান তাপ
তাহে ভাল মন্দ ঘটে॥

১২২ Report of the Regional Records Survey Committee for West Bengal (1949-50)—Maldah

১২৩ Appeals from these decisions were allowed to two superior courts established at the chief seat of Government, one under the denomination of Dewany Sudder Adaulut or Chief Court of Criminal justice. The former, consisted of the president and members of council assisted by the native officers of the Khalsa or exchequer, and in the latter, a chief officer of justice presided, appointed on the part of the Nazim, assisted by the head Cauzy and Moofty and three eminent Moolavis. Over this court a controll was vested in the president and Council, similar to what was exercised by the Collectors in the provinces.... The collectors and aumils (or native suprintendents) had acted as magistrates but on the recall of the former, native officers stiled Fauzdars were appointed to the fourteen districts or local jurisdiction into which Bengal was divided with on appropriate number of armed men..." Fifth Report etc. p 6

কবির বিবরণ অনুসারে ১২০০ সালে অর্থাৎ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে কোর্টের কাজকর্ম উকিল মারফৎ নিষ্পন্ন হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং ত্রিশজন উকিলের মধ্যে কেহ কেহ 'মনসব' অর্থাৎ প্রতিনিধিত্বকরণের (সরকার পক্ষের ?) সনদ লাভ করেন।

তখন সন ১২০০ সাল হুকুম দিলা আদালতে
বাকরণ্ড মারফতে কাজ।
আসামী ফৈরাদি যত আছিলেক শত শত
সবার মস্তকে পৈল বাজ॥

কবি এখানে উকিল অথবা প্রতিনিধিদের উপর কটাক্ষ করিয়া তাহাদের 'বাকরণ্ড' অর্থাৎ বাক্-বেশ্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহার কারণ সে সময়ে যাহারা উকিল নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই ছিল অপদার্থ এবং তাহাদের পারিশ্রমিক দিয়া নিযুক্ত করিয়া দরিদ্র চাষীদিগের সুবিধা দূরের কথা দুর্দশার সীমা ছিল না। কবির ভাষায়,—

আসামীর কর্ম্ম মতে যে হয় জজের হাতে
বাকরণ্ডের নাহি কিছু ফল।
তবে যদি খাড়া হয় ডরে কিছু নাহি কয়
জোড় হাতে থাকে হয়া ধন্দ।
সাহেব যদি পুছে তাথে না বুঝিয়া মাথা ঝাঁকে
সেলাম করে বল্যা খোদাবন্দ॥

কিন্তু অপদার্থ হইলে কি হয় এদিকে নিজেদের 'পাওনাগণ্ডা' বুঝিয়া লইতে তাহারা পশ্চাদপদ হইত না! ডিক্রিতে 'রোসন' এবং মামলা ডিসমিস্ হইলে 'মিহনতথানা' ঠিক স্তোকবাক্যদানে আদায় করিত। তাহাদের এইরূপ আচরণে জনগণের মনে বেশ বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল—

"কোন বিধি হয়া ভণ্ড নির্ম্মাইল বাকরণ্ড
আমরা সভে গরদিশ পাই।
বাক্রণ্ড যদি নইত তবে কি এমন হৈত
যার কথা কৈত যারা সেই॥"

* * *

উকিলের মুখে ছাই ছাড়ান না যায় তাই
দরবারে চড়ে সে যে গাধা॥

রঙ্গপুরের বর্ধনকুঠির নয়-আনির জমিদারের দেওয়ান নিয়োগ সংক্রান্ত ঘটনা সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক ছড়া পাওয়া গিয়াছে। ছড়াটি হইতে জমিদারের উপর ইংরেজ কালেক্টরের প্রভাব বিস্তারের সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য রাজশক্তির বিরুদ্ধে রায়তদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সাফল্য বর্ণনে। নয়-আনির জমিদার সীতারাম রায়কে দেওয়ান নিযুক্ত করিবার জন্ম ইংরেজ কোম্পানীর অনুমতি ভিক্ষা করেন। কিন্তু রঙ্গপুরের কালেক্টর গুডল্যাণ্ড সাহেবের চেষ্টায় রামবল্লভ রায় দেওয়ান নিযুক্ত হন। এই নির্বাচন প্রজাদের মনোমত হয় নাই। রামবল্লভের চক্রান্তে জমিদারের মহল নিলাম হইবার উপক্রম হইলে জমিদার অনন্যোপায় হইয়া প্রজাদের শরণাপন্ন হন। প্রজারা দলে দলে গিয়া গুডল্যাণ্ডের কাছারী অবরোধ করে। প্রথম দিন গুডল্যাণ্ড স্বীয় ক্ষমতা জাহির করিয়া তাহাদের ভয় দেখান কিন্তু দ্বিতীয় দিন ক্রমবর্ধমান জনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি শঙ্কিত হন।

প্রজাদের কাছারী অবরোধের বর্ণনা নিম্নরূপ—

একটি একটি করিয়া রায়ত ধরল সারি।
কাচারি বেড়িয়া রায়ত হল হাজার চারি॥
হেনকালে সাহেবের দৃষ্টি পড়ল পাছে
দেখে কেবল রায়ত যত অন্য কেহ নাহি আছে।
পূর্ব্ব দিনের ধমক-চমক সব আছে মনে
চারিদিকে চাহে সাহেব চঞ্চল নয়নে॥

উপায়ন্তর না দেখিয়া সাহেব দেওয়ানের নিকট পরামর্শ চাহিলেন, কিন্তু—

দেওয়ান বলে রায়ত সব করতে পারে।
কাকেও স্বর্গে তোলে কাকে আছড়ে মারে।
রায়ত লইয়া সবার ঠাকুরালী
যত দেখ সোনার বালা রায়তের কড়ি।

গুডল্যাণ্ড প্রজাদের সমক্ষে দেওয়ানের পদচ্যুতির কথা ঘোষণা করিলে তাহারা আনন্দে কালেক্টরের শুভকামনা করিল।

সাহেব বলে আজ হতে দেওয়ান খারিজ হইল।
শুনিয়া সকল প্রজা স্বর্গ হাতে পাইল॥

মহাশব্দ করি সবে ঝাকি দিয়া কয়।
জীয়া থাক সাহেব তোমার বিবির হউক জয়॥

সহস্র সহস্র প্রজার স্বার্থ দাবী পূরণের জন্য কাছারী-অবরোধ এবং গণশক্তির জয়লাভের এই চিত্রটি অবশ্য স্থানীয় জনগণেরই দুঃসাহসিকতা এবং আত্মপ্রতীতি সপ্রমাণিত করে। রঙ্গপুর সীমান্তবর্তী অঞ্চল। মোগল শাসন শক্তির অবসান এবং ইংরেজ শাসনাধিকারের প্রথমদিকে সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা লাগিয়াই থাকিত। ইংরেজ শাসনকর্তা-গণ খাজনার টাকা আদায়ের কথাই ভাবিতেন, প্রজার সুখসুবিধার কথা তাঁহারা বুঝিতেন না; তদ্ব্যতীত ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের ফলে জমি হইতে উৎসাদিত কৃষক এবং কর্মচ্যুত সৈনিকগণ দলবদ্ধভাবে ডাকাতি করিতে আরম্ভ করে।[১২৪] এই অরাজকতা এবং অনিশ্চিৎ অবস্থার ফলে প্রজারা সংঘবদ্ধ এবং সংগ্রামী হইয়া উঠিবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

চন্দ্র পৃষ্ঠে চন্দ্র লিখে গ্রহ পৃষ্ঠে শূন্য।
সেই সনে অপ্রতুল্য শুন তার জন্য॥

কবির এই উল্লেখ হইতে অনুমান হয়, ঘটনাটি ঘটে ১১৯০ সাল অর্থাৎ ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে। ভণিতা হইতে আরো জানা যায় যে, মহীপুর গ্রামনিবাসী কৃষ্ণহরিদাস এই ছড়ার রচয়িতা এবং তাহের মামুদ ইহার লিপিকার।

উত্তরবঙ্গের ছড়ার বৈশিষ্ট্য

রঙ্গপুরের জাগের গানের মধ্যেও আমরা প্রজাদের সাহস এবং অনুরূপ দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়াছি। উত্তরবঙ্গের কবিদের রচিত কবিতা-ছড়া-গুলি ব্যতীত প্রজাদের এইরূপ মনোভাবের পরিচয় অন্যত্র পাওয়া যায় না। উত্তরবঙ্গের কবিগণ অত্যাচারীর অত্যাচারকে 'প্রজার পাপের ফল' বলিয়া যে মনে করিতে পারেন নাই তাহার কারণও এই অঞ্চলের অধি-বাসীদের স্বভাব-ধর্মের স্বাতন্ত্র্য। সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের তৎকালীন রাজ-নৈতিক অবস্থাও অধিবাসীদের মনে গভীর রেখাপাত করিয়া থাকিবে।

একটি ঐতিহাসিক গানের মধ্যে ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ে শালিখা হইতে পূর্বমুখে দাঁড়া-রাস্তা নির্মাণের বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। গানটির কিছু কিছু পাঠান্তর আছে। একটি গানের রচয়িতারূপে মেদিনীপুরবাসী মদন-মোহন[১২৫] অপরটিতে আবদুলপুর নিবাসী দ্বিজ রাধামোহনের[১২৬] ভণিতা

১২৪ The District Gazeteer of Bengal—Rangpur.
১২৫ ঐতিহাসিক চিত্র, ২য় খণ্ড
১২৬ সা-স ৪৯৬ (পূর্বার্ধ খণ্ডিত)

আছে। লিপিকালের তারিখ ১২৭০ সাল অর্থাৎ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ হইলেও গানটি আরো পূর্বে রচিত হওয়াই সম্ভব। প্রারম্ভেই বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্যসিংহের সহিত যুদ্ধে হেষ্টিংসের পরাজয়ের কথা আছে,—

চণ্ডালগড় হৈতে চণ্ডালগড় হৈতে
যেনমতে হিষ্টিনী হারিল।
চৈতন্যসিংহ মহারাজ জানে সর্ব্বজন,
চলিলা তার সনেতে চলিলা তার সনেতে
রণ করিতে হিষ্টিনী হারিল।
দেখ রঙ্গ দিল ভঙ্গ দেখ সব লুটিল॥

মল্লভূমি বড় সহজে ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করে নাই। বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে আছে যে, পলাশী যুদ্ধের পরেও বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্য সিংহ ইংরেজদের নিকট হইতে কর আদায় করিয়াছিলেন। ইংরেজ শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার অর্ধশতাব্দী পর পর্যন্ত মল্লভূমির বিদ্রোহ দমনার্থে ইংরেজ সরকারকে সৈন্য প্রেরণ করিতে হইত।[১২৭] I. C French কৃত "Land of the wrestler" নামক গ্রন্থে চৈতন্য-সিংহ সম্পর্কে কিছু ভিন্ন বিবরণ আছে। চৈতন্যসিংহের জনৈক আত্মীয় মুর্শিদাবাদে গমন করিয়া মোগল প্রতিনিধি বাংলার নাজিম এবং কার্যতঃ স্বাধীন, নবাব সিরাজউদ্দৌলার নিকট হইতে বিষ্ণুপুর অবরোধের জন্য সৈন্য সহায়তালাভ করেন। দামোদর তীরবর্তী সংঘটগোলার যুদ্ধে চৈতন্যসিংহ তাহাকে পরাভূত করিলেও তিনি হতাশ না হইয়া পুনরায় মুর্শিদাবাদ গমন করেন এবং পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী কালে নূতন নবাব মীরজাফরের নিকট সৈন্য সাহায্য লাভ করিয়া পুনরায় অভিযান করেন এবং এইবার এক নৈশ আক্রমণে বিষ্ণুপুর বিজিত হয়। চৈতন্যসিংহ পলায়ন করিয়া কলিকাতায় লর্ড ক্লাইভের সাহায্য প্রার্থনা করিলে ক্লাইভ তাঁহাকে বিষ্ণুপুর রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন বটে কিন্তু আর স্বাধীন রাজা হিসাবে নহে—একজন জমিদাররূপে।[১২৮] কিন্তু এই যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণের মধ্যে কোথাও হেষ্টিংসের নাম পাওয়া যায় না। গানটিতে অবশ্য আছে যে প্রথম যুদ্ধে হেষ্টিংস পরাজিত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যান এবং সেখানে সহকর্মীদের

---

১২৭ History of Bishnupur Raj—A. B Mullick, p.85
১২৮ 'Land of the Wrestlers'—
Statesman 27th Nov 1927

সহিত পরামর্শ করিয়া টাকাকড়ি ও সৈন্যাদি লইয়া পুনরায় চণ্ডালগড়ে আসিয়া পূর্বদিকে শালিখা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের জন্য বেগার খাটিবার লোক সংগ্রহ করেন। এই সময়ে কেরানীরা পরামর্শ করিয়া রাস্তা নির্মাণের অজুহাতে বড় বড় বাড়ী ভূমিস্যাৎ করিতে আরম্ভ করে। গৃহস্থেরা তাহাদের এই ইচ্ছাকৃত কাণ্ড দেখিয়া ভয়ে তাহাদের টাকার লোভ দেখাইয়া নিরস্ত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাতে লোভের দাবী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

বলে রাস্তা ইধার যাগা বলে রাস্তা ইধার যাগা
মহার লাগায়ে উতরিল বাড়ী।
লোকে দেখে কম্প হৈল কিছু কবুলে কড়ি॥
পাইআ লোভ বাড়িল পাইআ লোভ বাড়িল
ঘর লুটিল ভাঙ্গিল কত ঘর।
আস্নুদ আম বকুল জাম কাটিল বহুতর॥

চণ্ডালগড় হইতে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত এইভাবে রাস্তা নির্মিত হয় এবং বিষ্ণুপুর শহরের মধ্য দিয়া পূর্বমুখে শালিখা ঘাটের অপরপার পর্যন্ত পথ প্রস্তুত হয়। এই রাস্তা নির্মাণের জন্য বেগারের ভয়ে চাষীরা পলায়ন করিতে থাকে। যাহারা বেগার খাটিতে বাধ্য হইত তাহাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, যৎকিঞ্চিৎ আহার্য এবং অশেষ দুর্দ্দশার যে চিত্র এই গানটির মধ্যে পাওয়া যায় তাহা অতীব করুণ,—

হাতে বেঁধে গোপ্তা মেরে রাস্তাতে খাটায়।
হাতে করে বেতের বাড়ি
হাতে করে বেতের বাড়ি তাড়াতাড়ি মারে [সবায়] পিঠে
বেতের ভয়ে যত কোড়া চতুর্দ্দিগে ছুটে।
খাবাদাবা বন্দ করে
খাবাদাবা বন্দ করে রাকে ধরে সন্দে কালে ছুটি
কোদাল পিঠে ঝুড়ি হাতে যায় গুটি গুটি।

মহাস্থানের ছড়া

বগুড়া জেলার ছয় মাইল উত্তরে পৌণ্ড্র ক্ষেত্রে মহাস্থান নামক স্থানে করতোয়া নদীকূলে শীলাদেবীর ঘাটে কয়েকবৎসর পর পর বিশেষ তিথিনক্ষত্রের যোগে পৌষ-নারায়ণী স্নানের রীতি আছে। একটি ছড়ায় এই করতোয়া-স্নানের বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। ছড়াটি হরগোপাল দাসকুণ্ডু কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ১৩১৪ সালে প্রকাশিত হয়। ছড়াটির রচনা সমাপ্তিকাল ১২২০ সাল অর্থাৎ ১৮১৩ খৃষ্টীয় শতক।

রচনার শেষাংশে ভণিতার মধ্যে কবির নাম এবং বাসস্থানের বিবরণ আছে।

কবিতা রচিল দ্বিজ গৌরীকান্ত নাম।
নিবাস তাহার বটে নারুলি গ্রাম ॥
বগুড়ার [পূর্ব্বভাগ] চেল পাড়া গ্রাম।
দ্বিজকুলে উৎপত্তি সেই করে গান ॥

অন্যান্য ছড়া রচয়িতার ন্যায় দ্বিজ গৌরীকান্ত রচিত ছড়ার আরম্ভও দেবলোকের কাহিনীতে। গতানুগতিকভাবে পৃথিবীতে নরনারীর পাপ বৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া ছড়াকার লিখিয়াছেন যে, স্বর্গপুরে দেবগণের সভায় পৃথিবী-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে বরুণ, পবন প্রভৃতি দিকপালগণ পাপীতে পূর্ণ পৃথিবীতে অতঃপর কে রাজা হইবেন ভাবিযা চিন্তিত হইলেন। মহাদেব তাঁহাদের চিন্তার কারণ দূর করিয়া বলিলেন নারায়ণী-স্নান করিলেই রাজাদের যাবতীয় পাপের ক্ষালন হইবে। বৈশাখ মাসে দেবগণের মধ্যে এই আলোচনার পর পৌষ মাস আসিযা পড়িল বলিয়া ছড়াকার তাঁহার আসল বক্তব্য পৌষ-নারাযগী স্নান যোগের বিবরণ আরম্ভ করিয়াছেন।

বৈশাখ মাসেতে কথা উপস্থিত হৈল।
দৈবযোগে হেনকালে পৌষ মাস আইল ॥
পৌষ মাসের সোমবার অমাবস্যার ভোগ।
মুলা নক্ষত্রেত পাইল নারায়ণী যোগ ॥

এই বিশেষ যোগ উপলক্ষে 'বাইশ রাজা'র স্নান উদ্দেশে যাত্রার এক বিস্তারিত বিবরণ এই ছড়ার মধ্যে রহিয়াছে। এই বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, এই বিশেষ যোগ উপলক্ষে বাংলা দেশের সকল স্থান হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যাত্রা করিতেন এবং তাঁহাদের সহিত বহু লোকের সমাগমে করোতোয়া-কূল মুখরিত হইয়া উঠিত। ছড়াটির মধ্যে সমসাময়িক জমিদার—যাঁহারা এই স্নান-যাত্রা করেন তাঁহাদের নামোল্লেখ আছে।

এই স্নানযাত্রা উপলক্ষে সেখানে সাধু-সন্ন্যাসীরও সমাগম হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু ছড়াটির মধ্যে সন্ন্যাসীদের আগমন সংবাদ পাইয়াই স্নানযাত্রীদের

শঙ্কায় পলায়নের বিবরণ রহিয়াছে। ইহারা সন্ন্যাসী হইলেও প্রকৃতপক্ষে ছিল লুঠেরা।

মঙ্গলবারের দিন আইল ছয় শত সন্ন্যাসী।
তারা কাশীবাসী, মহাঋষি,উর্দ্ধবাহুর ঘটা ॥...
সন্ন্যাসী আইল বল্যা লোকের পড়ে গেল শঙ্কা।
...হাজারে হাজারে, বেটারা লুঠ করিতে আইসে ॥
...বেটাদের অস্ত্র আছে, রাথে কাছে, বন্দুক সাঙ্গি তীর।
তমার চিমটা, খাপে ঢাল, ঢাকা শির ॥

পৌষনারায়ণী স্নান উপলক্ষে এইভাবে লুঠেরা সন্ন্যাসীদের আকস্মিক আগমন ও লুঠের এক মূল্যবান বর্ণনা এই ছড়ার মধ্যে পাওয়া যায়। আমরা সন্ন্যাসী-ফকীরদের বাংলা দেশে অত্যাচারের আলোচনা প্রসঙ্গে চতুর্থ অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত উল্লেখ করিয়াছি।

ক্ষুদ্রায়তন ছড়া

পূর্বোল্লিখিত ইতিহাসাশ্রিত বড় ছড়া ও গানগুলির পর আমরা এখানে আয়তনে আরো ক্ষুদ্র কয়েকটি ছড়ার উল্লেখ করিব। এই ছড়াগুলির অধিকাংশই দরিদ্র, নিরক্ষর শ্রেণীর লোকে মুখে মুখে রচনা করিয়া থাকিবে এবং ইহাদের উৎসও অনেক ক্ষেত্রেই জনশ্রুতি। কিন্তু ছড়াগুলির মধ্যে আর কিছু না পাওয়া গেলেও খানিকটা ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জনশ্রুতিও প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রতিকূল নহে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার 'বেনের মেয়ে' নামক সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে একটি বহু শ্রুত এবং উচ্চারিত প্রাচীন গানের উল্লেখ করিয়াছেন। সপ্তগ্রামের রাজা রূপা জাতিতে বাগ্দী বলিয়া তাঁহার সেনাদলে কেবল বাগ্দী সৈন ছিল। তাঁহার আদেশে বাগ্দী সেনাদল হিন্দুরাজা হরি বর্ম্মার বিরুদ্ধে অভিযান করে।

শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—রাজা হুকুম দিলেন, "সব বাগ্দী সাজ"। বাগ্দীরা কেবল লড়ে। কিন্তু রাস্তা তৈয়ার করা, শত্রুর গতিবিধি দেখা ডোমদের কাজ, আর ঘোড়সওয়ারও ডোম। দশ হাজার বাগ্দী সাজিলে, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ হাজার ডোমও সাজিল। তাহারা আগে আগে গিয়া রাস্তা দেখিতে ও তৈয়ার করিতে লাগিল, বাজনা বাজাইতে লাগিল, ঘোড়ায় চড়িয়া দেশের অবস্থা দেখিতে লাগিল। গান উঠিল—

আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে
ডাল মৃগল ঘাঘর বাজে।

বাজ্‌তে বাজ্‌তে পড়লো সাড়া,
সাড়া গেল বামুনপাড়া।

ডোমদের পাড়া বামুনপাড়ায় গেলে তাহারা ভারি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।"[১২৯] রাজা হরিবর্মার সময়ে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তি ঘটে। তাঁহার পূর্ববর্তী রাজা জাতবর্মার সময়ে কৈবর্তনায়ক দিব্যর বিরুদ্ধে আক্রমণ এবং বৌদ্ধবিহার ধ্বংসের কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায়।[১৩০] উদ্ধৃত ছেলে ভুলানো গানটির মধ্যে এই ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ বিরোধেরই আভাস রহিয়াছে। কয়েকটি ঘটকের ছড়ায় জাতিধর্ম লইয়া তৎকালীন জমিদারদের স্বেচ্ছাচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। দেশের জমিদারের আদেশ অমান্যের ফলে জাতিচ্যুতির সংবাদ একাধিক ছড়া পাওয়া যায়,—

'জাতির কর্ত্তা রাজীব রায়, মুলুকের শুবা।
তাঁর হুকুম তুচ্ছ করে দত্ত হলেন ধোবা॥"

অথবা— 'হাল বয়, তাল খায়, গিধনায় বাস।
তার বেটা কায়েত হলো, বিশ্বাস খায।'

ঘটকের ছড়া

ইংরেজ শাসনাধিকারের প্রথমদিকে সরকারী আদালত ছাড়াও গভর্ণরের মনোনীত সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ জাতি ধর্ম্ম সম্পর্কে অভিযোগাদির বিচার পৃথক বিচারালয়ে করিতেন। এই বিচারালয়কে 'Caste Cutchery' বলা হইত। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইলে সাধারণতঃ শাস্তিস্বরূপ তাহাকে সমাজচ্যুত (বয়কট ?) করা হইত।[১৩১] প্রধানত হিন্দু জমিদারগণই এই বিচারালযের কর্ত্তা নিযুক্ত হইতেন। বিনা অপরাধে সমাজচ্যুতি অভিপ্রেত না হইলেও কোন কোন সময়ে ক্ষমতার অপব্যবহারও হয়তো হইয়া থাকিবে এবং সমাজচ্যুতি হইতে জাতিচ্যুতিও শাস্তি হিসাবে বলবৎ হইতে পারে।

১২৯ হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী পৃ ১৪৯

১৩০ বাঙালীর ইতিহাস—নীহার রঞ্জন রায় পৃ ৫১৯

১৩১ The court was presided over by some distinguished Hindu official nominated by the Governor. In Verelst's time, Maharaja Nabakrishna, the Company's Political Banyan, held charge of this Cutchery. The court took cognizance of all matters relative to the caste observance of the Hindus. In the exercise of his authority, the judge was assisted by a number of learned Brahmin priests in consultation with whom he pronounced judgement. The punishment awarded by this court was generally in the form of a sentence of excomunication, redering the offender an outcast from society.

Verelst's Rule in India—N. D. Chatterji. p. 75

ওয়ারেন হেষ্টিংসের গভর্ণর জেনারেল থাকাকালে কাউন্সিলের কতিপয় সভ্যের সহিত মহারাজ নন্দকুমার কর্তৃক আনীত উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ লইয়া হেষ্টিংসের মতবিরোধ এবং এই বিরোধের ফলে হেষ্টিংসের ষড়যন্ত্রে পরিশেষে বিচারের অজুহাতে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসীর বিধান প্রভৃতি ঘটনা দেশে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। একটি ছড়ায় কাউন্সিলের সভ্যদের সহিত হেষ্টিংসের মতবিরোধ এবং নন্দকুমারের ফাঁসীর কথা পাওয়া যায়,—

আজগুবী এক আইন হয়েছে,
কৌলচলিদের সাথে হেষ্টিন ঝগড়া বাঁধিয়েছে।
'হায়রে হায় একি হোল বামুনের ফাঁসি হোল,
নন্দকুমার মারা গেল, গুরুদাস ধূলায় পড়েছে।

ইহা ব্যতীত একটি ছড়ায় হেটিংসের বারাণসী হইতে পলায়ন এবং অপর একটিতে নন্দকুমারের মৃত্যুতে জনগণের দুঃখবোধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এই জাতীয় ছড়াগুলির রচনাকালের কোন স্থিরতা নাই। তবে ঘটনার কিছুকালের মধ্যেই রচিত হওয়া সম্ভব।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সম্পর্কে একটি ছড়ায় ইংরেজ কোম্পানীর নায়েব-দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর কারসাজীর ফলে দেশে যে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

নদনদী খালবিল সব শুকাইল।
অন্নাভাবে লোকসব যমালয়ে গেল॥
দেশের সমস্ত চাল কিনিয়া বাজারে।
দেশ ছারখার হ'ল রেজা খাঁর তরে॥
একচেটে ব্যবসা দাম খরতর।
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হ'ল ভয়ঙ্কর॥
পতিপত্নী পুত্র ছাড়ে পেটের লাগিয়ে।
মরে লোক, অনাহারে অখাদ্য খাইয়ে॥

এই ভীষণ মন্বন্তরের সময়েও কোম্পানীর রাজস্ব আদায়ে যে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য ঘটে নাই William Hunter তাঁহার একটি গ্রন্থে তাহা ওয়ারেন হেষ্টিংসের উক্তি উদ্ধৃতি সহকারে প্রমাণিত করিয়াছেন—

"Not withstanding the loss of at least one third of the inhabitants of the province and the consequent

decrease of the cultivation, the nett collections of the year 1771 exceeded even those of 1768.'[১৩২]

পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে তিনি স্যর জন শো-র লিখিত এই দুর্ভিক্ষের বর্ণনামূলক একটি কবিতাও উদ্ধৃত করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত মুমূর্ষু নরনারীর এই করুণ চিত্রটি পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল।[১৩৩]

বিদেশী বণিকদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের দেশের অনেক অসহায়া স্ত্রীলোকের চরকা কাটিয়াই দিনগুজরান হইত বলিয়া চরকা কাটার সময়ে তাহাদের কণ্ঠে চরকার প্রশস্তি শোনা যাইত।

চরকা মোর ভাতার পুত, চরকা মোর নাতি ॥
চরকার কল্যাণে মোর দ্বারে বাঁধা হাতি ॥

চরকা অবলম্বনে যৎসামান্য অর্জিত হইলেও স্বল্পসন্তুষ্ট দরিদ্র রমণীর নিকট তাহা অমূল্য হইয়া উঠিত। কিন্তু পর্তুগীজ এবং আরমাণি বণিকদের প্রলোভনে বাংলা দেশের তাঁতীরা 'দাদনি' প্রথায় স্বীকৃত হইলে এই আর্থিক-সংস্থান ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরে এবং চরকার প্রচলন উঠিয়া যায়। কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের মধ্যে দাদনি প্রথার এই কুফলের এক চিত্র পাওয়া যায়।

প্রভুর দোসর নাই উপাই কে করে।
কাটনার কড়ি কত যোগাব ওঝারে ॥
দাদনি দেয় এবে মহাজন সবে।
টুটিল সুতার কড়ি উপায় কি হবে ?
দু'পণ কড়ির সুতা, একপণ বলে।
এত দুঃখ লিখেছিলা অভাগী কপালে ॥

---

১৩২ Annals of Rural Bengal—W. W. Hunter p. 56.

১৩৩ "Still fresh in memory's eye the scene I view
The shrivelled limbs, sunk eyes and lifeless hue,
Still hear the mother's shrieks and infants moans,
Cries of despair and agonizing groans,
In wild confusion dead and dying lie ; —
Hark to the jackale's yell and vulture's cry,
The dog's fell howl, as amidst the glare of day.
They riot unmolested on their prey,
Dire scenes of horror which no pen can trace
Nor rolling years from memory's page efface.'
—Annals of Rural Bengal

এই জাতীয় ছড়ার সংখ্যা খুব অল্প নহে। এখানে কয়েকটি ছড়ার আলোচনা হইতেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ঐতিহাসিক লোকশ্রুতি-মণ্ডিত এই সকল ছড়ার মধ্যে বাংলা দেশের নরনারীর বহু বিচিত্র স্মৃতি বিজড়িত হইয়া আছে।

কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবু সিরাজউদ্দৌলার ভয়ে পলাতক ওয়ারেন হেষ্টিংসকে কাশিমবাজারে আশ্রয়দান করেন এবং হেষ্টিংস কৃতজ্ঞতাস্বরূপ পরে তাঁহাকে কোম্পানীর দেওয়ানী প্রদান করেন—এইরূপ এক কাহিনী অবলম্বনে পরে কৃষ্ণনগরে 'রসসাগর' কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী একটি ব্যঙ্গাত্মক ছড়া রচনা করিয়াছিলেন। ছড়াটির মধ্যে সিরাজের ভয়ে ভীত হেষ্টিংসের কান্তবাবুর শরণাপন্ন হওয়ার কৌতুকপ্রদ বিবরণ পাওয়া যায়।

হেষ্টিংস সিরাজ ভয়ে হযে মহাভীত।
কাশিমবাজারে গিযা হন উপনীত॥
কোন্ স্থানে গিয়া আজ লইব আশ্রয়।
হেষ্টিংসের মনে এই নিদারুণ ভয়॥
কান্তমুদী ছিল তার পূর্বে পরিচিত।
তাহারি দোকানে গিয়া হন উপনীত॥
নবাবের ভযে কান্ত নিজের ভবনে।
সাহেবকে রেখে দেয় পরম গোপনে॥
সিরাজের লোক তার করিল সন্ধান।
দেখিতে না পেয়ে শেষে করিল প্রস্থান॥
মুস্কিলে পড়িযা কান্ত করে হায় হায।
হেষ্টিংসে কি খেতে দিয়া প্রাণ রাখা যায়?
ঘরে ছিল পান্তা ভাত আর চিংড়ি মাছ।
কাঁচা লঙ্কা, বড়ি পোড়া, কাছে কলাগাছ॥

* * *

সূর্য্যোদয় হল আজি পশ্চিম গগনে।
হেষ্টিংস ডিনার খান কান্তের ভবনে॥

কান্তবাবু সমৃদ্ধির পূর্বে কাশীমবাজারে ইংরেজ কুঠিতে মুহুরীর পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং নবাব সিরাজ কর্তৃক কাশীম বাজারের কুঠি আক্রমণ কালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিম্নতন কর্মচারীরূপে এক সময় ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁহার ভয়ে কান্তবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় লাভ করিয়া থাকিবেন।[১৩৪] ছড়াটির সকল বিবরণ সত্য বলিয়া মনে হয় না।

---

১৩৪ মুর্শিদাবাদ কাহিনী—পৃ ৪২০-২১

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজকাহিনী

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা রাষ্ট্রীয় ঘটনাশ্রিত বিবিধ কবিতার আলোচনা করিয়াছি। রাষ্ট্রীয় ঘটনাসমূহের আলোচনাসূত্রে রাজগণেরও প্রাসঙ্গিক উল্লেখ আমরা পাইয়াছি। ইহা ব্যতীত রাজবংশীয়গণের কাহিনী অবলম্বনে পৃথক এক শ্রেণীর কাব্যও রচিত হইয়াছিল। বর্তমানে অধ্যায়ে সেই রাজকাহিনী আমাদের আলোচ্য। ইতিপূর্বে প্রাচীন 'রাজমালা' 'চম্পকবিজয়' প্রভৃতি ইতিহাসাশ্রিত কাব্যগ্রন্থের আলোচনাকালে আমরা 'কৃষ্ণমালা'র প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করিয়াছি। কৃষ্ণমালা রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের (রাজ্যকাল ১৭৬০ খৃঃ-১৭৮৩ খৃঃ) জীবনকাহিনী। দুর্গামণি-সংশোধিত রাজমালা হইতে জানা যায় যে, কৃষ্ণমাণিক্যের ভ্রাতৃপুত্র রাজধরমাণিক্যের (রাজ্যকাল ১৭৮৫ খৃঃ-১৮০২ খৃঃ) আদেশে রামগঙ্গাবিশারদ 'কৃষ্ণমালা' রচনা করেন।[১] কয়েকটি কারণে কৃষ্ণমালার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এই কাব্যের মধ্যে কৃষ্ণমণি এবং তাঁহার রাজ্যকাল সম্বন্ধে এমন বহু তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যাহা অন্যত্র একান্তই দুর্লভ।

কৃষ্ণমালা

রচয়িতা

কৃষ্ণমণির রাজত্ব আদৌ সুখের ছিল না। অল্পকাল রাজত্বের মধ্যেই একাধিকবার তাঁহাকে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে হয়। পরাজিত হইয়া অরণ্যে এবং পর্বতগহ্বরে তিনি আত্মগোপন করেন এবং আত্মগোপনকালে কখনো তিনি কাছাড় ও মণিপুর রাজার শরণাপন্ন হইয়াছেন; কখনো পার্বত্য কুকিদের সহিত মিশিয়া থাকিয়াছেন। রাজ্যভ্রষ্ট কৃষ্ণমণির এই সকল বৃত্তান্ত একমাত্র কৃষ্ণমালার মধ্যেই বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

কৃষ্ণমণি ১১৭০ ত্রিপুরাব্দ অর্থাৎ ১৭৬০ খৃষ্টীয় শতকে সিংহাসন লাভ করিয়া উদয়পুর হইতে রাজধানী আগরতলায় স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু অল্প-কাল পরেই রোশনাবাদ চাকলার রাজস্ব লইয়া নবাবের ফৌজদারের সহিত তাঁহার মনান্তর ঘটে। ফৌজদার ইহা নবাবের কর্ণগোচর করিলে নবাব

১ "উজীর বলে বিজয় মাণিক্য অভ্যন্তরে। কৃষ্ণমাণিক্য মহারাজ হৈল তার পরে ॥
তান কীর্ত্তি রাজধর মাণিক্য আদেশে। জয়ন্ত চন্তাই পূর্ব্বে বলিছে বিশেষে ॥
কৃষ্ণমালা নাম পুস্তক বিস্তার কাহিনী। রামগঙ্গাবিশারদ রচিল তখনি ॥
—রাজমালা পৃ ৩২৯

ইংরেজ কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। তদানীন্তন ইংরেজ গভর্ণর লর্ড ভ্যান্সিটার্টের আদেশে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হ্যারি ভেরেল্‌ষ্ট ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে লেঃ মেথুস্‌কে ত্রিপুরা অভিযানে প্রেরণ করেন। অন্যত্র এ সম্পর্কে কিছু নূতন বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিবরণ অনুসারে হ্যারি ভেরেল্‌ষ্টের চট্টগ্রাম পৌঁছাইবার পূর্বেই নাকি ত্রিপুরার তদানীন্তন ফৌজদার ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন। ভেরেল্‌ষ্ট কলিকাতা হইতে লিখিত অনুমতি পাইয়া ইহা অধিকার করেন।[২] ফৌজদারের অবমাননার অজুহাতে ত্রিপুরা অধিকার করাই ছিল এই অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য[৩] এবং এই উদ্দেশ্যের পিছনে ছিল ইংরেজ শক্তির ত্রিপুরায় আধিপত্য বিস্তার তথা ব্যবসাবাণিজ্যের পথ সুপ্রশস্তকরণ।[৪] অন্যতম রাজবংশীয় বলরামমাণিক্যও রাজ্য লাভের জন্য এই অভিযানের সুযোগ গ্রহণ করেন। কৃষ্ণমালা হইতে জানা যায়, জগৎমাণিক্যের বংশধর বলরাম-মাণিক্য রাজ্য লাভার্থে তাঁহার পূর্বপুরুষদের কীর্ত্তিকলাপের কথা স্মরণ করিয়া নিজেও রাজ্যলাভের আশায় মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট

ত্রিপুরায় ইংরাজ অভিযান

২ "On their journey to Islamabad the chief and Council had learnt that the Dewan was in Tipperah, 'with an army making a conquest of that province' towards the cost of which 'Muhammad Raja Khan' had levied a special rate of two annas on all lands in the Chittagong District." —'Verelst in Chittagong'—Bengal Past and Present. Vol. XVII.

৩ "Assuming though without any obvious data, that there had been good grounds for the invasion of Tipperah by the Chittagong forces they write: "with regard to the Tippera Rajoh, as the Nabab's Phousddar had been obliged from his ill behaivours to take up arms against him, we desire that you'ill use your endeavours to reduce him to his due state of obediance to the Government of Islamabad." (20th June 1761)"—Ibid

৪ "We beg leave to reccomend on Approbation from the Nabab of Muxabad to such proceedings as may tend to the conquest of Tepper (Tippera) as it will be a valuable acquisition to our Hon'ble Masters, and m[ain] tained at a small expence." (3rd June 1761)"—Ibid.

সাহায্যের জন্য গমন করেন। বলরামমাণিক্যের অভিযোগ শুনিয়া নবাব কৃষ্ণমাণিক্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বলরামকে রাজ্যাধিকারের অনুমতি দান করেন।

এই মতে কতদিন যদি নির্ব্বাহিল।
তথা রাজা বলরাম উদ্যোগ করিল॥
রাজা ছত্রমাণিক্য প্রপৌত্র সন্তান।
লইতে রোশনাবাদ করিল সন্ধান॥

* * *

পূর্ব্বে মোর পিতা গিয়া ই রাজ্যকারণ।
ধর্ম্মমাণিক্যের সনে করাইল রণ॥

* * *

বলরামে মন্ত্রণা করিয়া এই মতে।
মুর্শিদাবাদেতে গেল নবাব সাক্ষাতে॥
নবাব নিকটে করিলেক নিবেদন।
রোশনাবাদ রাজ্য লইতে কারণ॥
নবাবের ক্রোধ কৃষ্ণমাণিক্য প্রতি।
রাজা বলরামেরে দিলেক অনুমতি॥

কৃষ্ণমাণিক্যও যথাসময়ে বলরামের এই অন্তর্ঘাতী ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাইলেন—

তোমা পিতামহে যবে সাশিল ধরণী।
গদাধর ছিল নাজির তখনি॥
তাহার তনয় বলরাম নাম ছিল।
রাজার সঙ্গে সে গিয়া মিলিল॥

তিনি প্রস্তুত হইয়া নূরনগরের নিকটবর্তী প্রাচীন কৈলারগড় দুর্গে সসৈন্যে অবস্থান করেন। ইংরেজ সেনাপতি লেঃ মেথুস্ নূরনগরে উপস্থিত হইয়া তাহার পশ্চিম দিকের ময়দানে শিবির সংস্থাপন করেন। প্রবাদ যে, রাজকীয় সৈন্যদলের 'বক্সী'র বিশ্বাসঘাতকতায় কৃষ্ণমাণিক্য ইংরেজ সেনাপতি মেথুস্-এর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। এই প্রবাদের মূল যাহাই হউক না কেন এই সময় কৃষ্ণমাণিক্যকে কিছু-কালের জন্য জগৎমাণিক্যের বংশধর বলরামমাণিক্যের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সেনাপতি মেথুস্

এবং ব্রাউন ত্রিপুরায় পৌঁছাইয়া দেখেন যে দেওয়ান ইতিমধ্যেই ত্রিপুর-রাজকে পরাজিত করিয়া পর্বতের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছেন। রাজা দেওয়ানের কবল হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্ত সেনাপতি মেথুসের ফৌজকে বাধাই দেন নাই।[৫] এই সময় ত্রিপুরায় মিঃ লিক প্রথম ইংরেজ রেসিডেণ্টরূপে নিযুক্ত হন।[৬] কিন্তু বলরামমাণিক্য দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণমালার বর্ণনানুসারে অল্পকাল পরে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হ্যারী ভেরেলষ্টের সহায়তায় কৃষ্ণমাণিক্য বলরামকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রোশনাবাদ অধিকার করেন।

সেই হারি যে সাহেব সুমতি।
অনুকূল ছিল বড় মহারাজ প্রতি॥
তান অনুকূলে তান হৈল রাজ্য লাভ।
নৃপতির মনে ছিল তান প্রতি ভাব॥

কৃষ্ণমালা রচয়িতা একাধিক স্থলে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হ্যারী ভেরেলষ্টের সহিত কৃষ্ণমাণিক্যের সৌহার্দ্যের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিযাছি যে কৃষ্ণমাণিক্যের বিরুদ্ধে ত্রিপুরাভিযানে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে হ্যারী ভেরেলষ্ট লেঃ মেথুসকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পুনর্বার রাজ্য প্রাপ্তির পর কৃষ্ণমাণিক্য ১১৭৭ ত্রিপুরাব্দ অর্থাৎ ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে যথাবিহিতভাবে সিংহাসনারোহণ করেন,—

এগারশ সাতসত্তর সন যে কার্তিকে।
রাজ্যেতে আসিল নৃপ বিহিত গতিকে॥

চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হ্যারী ভেরেলষ্টের কাছাড় অভিযান সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য কৃষ্ণমালার মধ্যে পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত কসবায় রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের সহিত বাংলার ভাবী গভর্ণর হ্যারী ভেরেলষ্টের চট্টগ্রাম প্রত্যাবর্তন পথে কসবায় হুলি খেলার এক বিস্তারিত বিবরণ কৃষ্ণমালার মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ। বিবরণটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল। এই বিবরণের সহিত কাছাড় অভিযানে অংশগ্রহণকারী লেঃ আর্চিবল্ড সুইংটনের বিবরণের সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কাছাড় অভিযান

তারপরে নরপতি আসিল কসবায়।
পুরীতে রহিল আসি উপর কিল্লায়॥

---

৫ An Early Account of Meckly—A. Swinton. Bengal Past and Present. Vol. XLVIII.

৬ রাজমালা—কৈলাসচন্দ্র সিংহ

হেনকালে সৈন্য সমে চাটিগ্রাম হতে।
"হাড়ি বিলিসি" সাহেব আসিল কসবাতে॥
ব্রহ্মার দেশেতে গিয়া করিতে বিজয়।
শজ্জ হইয়া চলিছিল সৈন্যচয়॥
"সুলটিন্" সাহেব আসিল কাপ্তান।
লপ্টন ইষ্টবিল সহিতে তাহান॥
আষ্টজন ইংরাজ এসব প্রভৃতি।
কসবায় আসিল যথায় নরপতি॥

ব্যবসার উদ্দেশ্যেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ত্রিপুরা করতলগত করিয়াছিলেন এবং মণিপুরের তদানীন্তন রাজা জয়সিংহের উকিলের নিকট মণিপুর হইতে বর্মীদের বিতাড়িত করিলে সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে জানিয়া ভেরেলষ্ট্ তাঁহাদের সহিত কোম্পানীর মৈত্রীচুক্তি করিয়া তাহার খসড়া এবং কাছাড় অভিযানের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া সম্মতির জন্য কলিকাতায় পত্র দেন। "The letter from Verelst to Vansitert and the articles of alliance were placed before the Board at Fort William on October 4, 1762, and it was decided to detach six companies of Sepoys, four from hence [Calcutta] and two to be draughted from Grant's Battalion at Chittagong under the command of Lieutenant Archibald Swinton, with two other officers Lieutenant John Stable and Eusign Scotland, to fix a post at Moneypoor and make themselves acquainted with the strength and diposition of the Burmahs and the situation of their country, "[1]

বলা বাহুল্য যে Lt. Swinton এবং Lt. John Stable-কে কৃষ্ণমালা রচয়িতা যথাক্রমে 'সুলটিন্' এবং 'লপটন ইষ্টবিল সাহেব' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

তীর্থমঙ্গল কাব্যের আলোচনাকালে আমরা বাংলার গভর্ণর হ্যারী ভেরেলষ্টের দেওয়ান রূপে গোকুলচন্দ্র ঘোষালের উল্লেখ করিয়াছি। এস্থলে কৃষ্ণমালার মধ্যেও হ্যারী ভেরেলষ্টের দেওয়ানরূপে গোকুলচন্দ্রের নাম পাওয়া যাইতেছে।

গকুল ঘোষাল সাহেবের দেওয়ান।
তাসবার সঙ্গে ছিল ব্রাহ্মণ প্রধান॥

[1] An Early Account of Meckly—A. Swinton.
Bengal Past and Present. vol. XLVIII.

মিঃ ভেরেলষ্ট ১৭৬১ খৃষ্টীয় শতকের প্রথমাংশে চট্টগ্রামের শাসন কর্তৃত্ব (Chief of Chittagong) লাভ করেন এবং ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। মধ্যবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি কাছাড় অভিযান পরিচালনা করিয়া থাকিবেন কিন্তু সেই সময়ে তাঁহার দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছিলেন বলা হইয়াছে।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লর্ড ক্লাইভ স্বদেশ যাত্রা করেন এবং ইহার পর হ্যারি ভেরেলষ্ট, বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হন। তীর্থমঙ্গল ১৭৭০ খৃষ্টীয় শতকে রচিত হয়। গোকুলচন্দ্র কাছাড় অভিযানে যাইলেও অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা হিসাবে তীর্থমঙ্গলে কিন্তু তাহার কোন উল্লেখ নাই!

হ্যারি ভেরেলষ্ট কসবায় সসৈন্যে উপস্থিত হইলে রাজা কৃষ্ণমাণিক্য তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

কতগুলি ঘোড়া আর কতেক সিপাই।
চলিছে সাহেব সঙ্গে লেখাজোখা নাই॥
হাড়িবিলাস সাহেব এসব সঙ্গে করি।
উপস্থিত হইল যদি কসবা নগরী॥
রাজা আসি সাহেবের সহিত মিলিল।
নৃপতিকে দেখিয়া সাহেব সম্ভাষিল॥

কবি এস্থলেও আর একবার আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে সাহেবের সহিত রাজার পূর্ব হইতেই সদ্ভাব ছিল।

ইষ্টালাপ পরস্পরে ছিল বহুতর।
তার পরে গেল রাজা আপনার ঘর॥

অতঃপর দোলযাত্রা উপস্থিত হইলে রাজা বিধিমতে তাহা পালন করিয়া সাহেবকে সেই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিলেন।

হুলী খেলার বিবরণ

বিধিমত দোলযাত্রা করি সমাপন।
পাঠাইল সাহেব নিকটে নিমন্ত্রণ॥
ইংরাজ সকলে পাইয়া নিমন্ত্রণ।
রাজপুরে গেল হুলি খেলার কারণ॥
সভাতে বসিল গিয়া রাজার বিদিত।
আতর গোলাপ গন্ধে, সভা আমোদিত॥
সুগন্ধি আবির চূর্ণ আনি ভারে ভার।
পুঞ্জ পুঞ্জ করি রাখে সভার মাঝার॥

পাত্রগণ সহিতে বসিল মহারাজ।
হাড়ীবিলাস সাহেব প্রভৃতি ইংরাজ॥

এই হুলী খেলার বিবরণ অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে মহারাজার নিমন্ত্রণে ইংরেজ হ্যারি সাহেব হয়তো এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রাজসভায় এইভাবে হুলী উৎসব সম্পন্ন হইলে রাজা কৃষ্ণমাণিক্যকে ভেরেলষ্ট ব্রহ্মদেশ অভিযানে অনুগমন করিতে বলেন। কৃষ্ণমাণিক্য রাজকার্যবশতঃ স্বীয় অক্ষমতা জানাইয়া প্রধান পাত্র জয়দেব রায়কে প্রেরণ করেন।

এইমত হুলি খেলা যত নির্ব্বাহিল।
নরপতি পাষে তবে সাহেবএ কহিল॥
ব্রহ্মার দেশেতে আমি করিব গমন।
লইব যে সেই রাজ্য করিয়া দমন॥
আমার সহিত যদি চলহ আপনে।
অবশ্য জিনিব রণে লয় মোর মনে॥
অতএব মোর সঙ্গে চল নরপতি।
শুনিয়া নৃপতি কহে সাহেবের প্রতি॥
রাজকার্য ছাড়ি আমি না পারি যাইতে।
মুখ্য এক পাত্র দিব তোমার সহিতে॥

ইহার পর জয়দেব ঠাকুরকে আহ্বান করিয়া কৃষ্ণমাণিক্য তাঁহাকে চট্টগ্রামে যাইতে বলিলেন,—

তারপরে জয়দেব ঠাকুরকে আনি।
যাইবারে চাটিগ্রামে কহেন নৃপমণি॥
ইংরাজ হইল বাঙ্গলার অধিকার।
এবে এই দেশ জিনে করিব তাহার॥
হাড়িবিলাস কাছে তুমি চলি যাও॥

ঢাকার ইংরেজ কুঠি লুণ্ঠন

জয়দেব ঠাকুরকে এইরূপ নির্দেশ দিয়া রাজা কৃষ্ণমাণিক্য হ্যারি ভেরেলষ্টকে বলিলেন,—

আমার দক্ষিণ বাহু জয়দেব রায়।
তাহাক সহিতে নেও দিলাম তোমায়॥
ভাল বলি তুষ্ট হৈয়া কহিল সাহেবে।
তাসবের সহিতে চলিল জয়দেবে।
তান সঙ্গে চলে লুচিদর্পনারায়ণ।

কসবা হইতে ইহাদের ব্রহ্মদেশ অভিমুখে যাত্রার একটি তারিখও (?) কৃষ্ণমালার মধ্যে রহিয়াছে—

ফাল্গুণের আটাইশ দিন তথা হতে।
চলিলেক দুইজন সাহেব সহিতে॥
হিড়িম্ব দেশেতে গিয়া উপস্থিত হইল॥
শুনি রাজা রাজ্য ছাড়ি পলাইয়া গেল॥
খাসুপুরে নিজপুরী আপনী পুড়িয়া।
পরিবার সনে বনে গেলেন ছাড়িয়া॥
হাড়ীবিলাস সাহেব রহিল সেই দেশে।
জয়দেব ঠাকুর রহিল তান পাশে॥

কৃষ্ণমালার উপরিদ্ধৃত বিবরণ হইতে জানা যায়, হিড়িম্ব দেশের রাজা স্বীয় প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করিয়া পলায়ন করিলে হ্যারি ভেরেলষ্ট রাজ্য জয় করিয়া সেই স্থানেই জয়দেব ঠাকুরের সহিত অবস্থান করেন। ভেরেলষ্টের কাছাড় অভিযান সম্পর্কে অন্যত্র লিখিত হইয়াছে যে, তিনি চট্টগ্রাম হইতেই যাত্রা করেন এবং নৈসর্গিক কারণ ও ব্যাধির প্রকোপের জন্য কাছাড় (হিড়িম্ব) বিজয় অসম্পূর্ণ রাখিয়াই প্রত্যাবর্তন করেন।

"At last a detachment destined for the Meckly (Manipur) expedetion safely reached Chittagong about December 1762. In January 1763 it left Chittagong for Manipur under Mr. Verelst. It reached Khaspur near Badarpur in April but suffered so much from rain and desease amidst pastilential swamps that it melted away and the remnant fell back to Jainagar on the left bank of the River Barak whence they eventually returned to Bengal"[৮]

'রাজমালা'য় এই প্রসঙ্গে দুর্গামণি উজীর লিখিয়াছেন —

হেড়ম্বেতে আগু হৈয়া গিয়াছি যুদ্ধেতে॥
কাছাড় হতে সৈন্য সব ফিরিয়া আসিল।
ইংরাজ কুঠী আদি বৃন্দাবন লুটিল॥

---

৮ 'An Early History of Manipur'—Bengal Past and Present. Vol. XL VIII.

মীরকাসেমের দেওয়ান বৃন্দাবন মুর্শিদাবাদ হইতে ঢাকায় আসিয়া ইংরেজ কোম্পানীর কুঠি লুণ্ঠন করিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া যে হ্যারি ভেরেলষ্ট্ হিড়িম্ব ত্যাগ করেন কৃষ্ণমালার মধ্যেও তাহার উল্লেখ আছে। কৃষ্ণমালা অনুযায়ী ভেরেলষ্ট্ এই ঢাকার কুঠি লুণ্ঠনের সংবাদ পাইয়া ক্যাপটেন সুইংটন্কে (Captain Swinton) ঢাকায় প্রেরণ করেন এবং ক্যাপটেন সুইংটন নবাব সৈন্যকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া মুর্শিদাবাদে মীর-কাসেমকে পরাজিত করেন। মীরকাসেম পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। "Swinton was ordered to Dacca where he contributed greatly by his activity and bravery in recovering the Factory which had been attacked by the forces of Mirkasim…"[১]

হিড়িম্ব দেশেতে তথা সাহেব আছয়।
তথা গিয়া তার ঠাই হুতে বার্ত্তা কয়॥
নবাব আছয়ে জান কাসিমালী খান।
বৃন্দাবন নামে আছে তাহার দেওয়ান॥
মুর্শিদাবাদ হনে ঢাকায় আসিয়া।
কোম্পানীর কুঠি সব লইছে লুঠিয়া॥
হ্যারি সাহেব এই বৃত্তান্ত শুনিয়া।
সুলটীন্ সাহেবকে দিল পাঠাইয়া
সৈন্যসম সুলটীন ঢাকায় আসিয়া।
জিনিল নবাব সৈন্য সমর করিয়া॥

* * *

তথা হতে পুনি মুর্শিদাবাদ গেল।
তথা গিয়া কাসিমালী খানকে জিনিল॥
নবাব পলাই গেল হারি পাই লাজ।
বাঙ্গলার অধিপতি হৈল ইংরাজ॥
হারি সাহেব হিড়িম্বা হতে।
আসিলেক জয়দেব ঠাকুর সহিতে॥

---

১ An Early History of Manipur—
Bengal Past and Present. vol. XLVIII

সৈন্য সনে বাঙ্গলাএ সাহেব চলিল।
আপনা ভবনে জয়দেব রায় গেল॥

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই মীরকাসেমের সহিত ইংরেজদের শেষ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ হয় পলাশীর নিকটে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে।

রাজমালার ন্যায় কৃষ্ণমালার মধ্যেও পূর্ববর্তী রাজাদের সদাচারের উল্লেখ প্রসঙ্গে পুষ্করিণী খননের কথা পাওয়া যায়। কৃষ্ণমাণিক্যকের নিকট তাঁহার পূর্বপুরুষ ধর্মমাণিক্যের গুণ ব্যাখ্যা করা হইল—উদ্দেশ্য তিনিও যেন পূর্বপুরুষদের অনুসরণে অনুরূপ সদাচার পালন করেন।

তোমা জ্যেষ্ঠ পিতামহ শ্রীধর্ম্মমাণিক্য।
তাহান যতেক কীর্ত্তি কহিতে অশক্ষ॥
দিয়াছে দিঘিকা সব আছে দেশে।
নামে ধর্ম সাগর সমস্ত লোক ঘোষে।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য যে একজন দয়ালু, স্বধর্মানুরাগী রাজা রূপে বহু দানধ্যানে নিরত ছিলেন কৃষ্ণমালা হইতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তুলাপুরুষ প্রভৃতি দানক্রিয়া উপলক্ষে তিনি বাংলা দেশের বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রচুর ভূমি ও অর্থদান করেন। এই প্রসঙ্গে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণের ত্রিপুরার রাজার নিকট হইতে ভূ-সম্পত্তি লাভের উল্লেখ আছে। রাজা রত্নমাণিক্য কুমিল্লা নগরীর পার্শ্বে 'সতর রত্ন' নামক যে মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ করিয়া অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান কৃষ্ণমাণিক্য তাঁহার রাজত্বকালে সেই মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ করেন। কৃষ্ণমাণিক্য দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, মহত্তরাণ প্রভৃতি নিষ্কর ভূমিদান ব্যতীত ডাকাইত সমসের গাজী প্রদত্ত নিষ্কর দানও অনুমোদন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

সমসেরের রাজ্যাধিকারের প্রথমাবস্থায় প্রজাদের অসহযোগিতার জন্য তাহাকে বেশ অসুবিধায় পড়িতে হয়। ডাকাইত সমসেরের রাজ্যলাভ ত্রিপুরবাসিগণ ঠিক অনুমোদন করিতে পারে নাই। রাজমালা রচয়িতা দুর্গামণি উজীর লিখিয়াছেন যে, সমসেরের রাজ্যলাভের সংবাদে ত্রিপুরবাসিগণ 'খেদা' পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দেয় এবং সমসের 'বঙ্গদেশীয়' অনুচরের সাহায্যে খেদাকার্য সম্পাদন করে। প্রজাদের এই অসন্তুষ্টির কারণ অনুধাবন করিতে কিন্তু সমসেরের বেশী বিলম্ব হয় নাই। প্রজাদের

এই অসহযোগিতার ভাব যে তাহার সিংহাসন রক্ষার অনুকূল নহে ইহা উপলব্ধি করিয়া স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বশে সমসেরও প্রজাদের মন হইতে এই অসন্তুষ্টি অপনোদনের এক কৌশল অবলম্বন করে। স্বয়ং রাজা নাম গ্রহণ না করিয়া কোন অক্ষম রাজবংশীয়ের নামে রাজত্ব পরিচালনাই প্রকৃষ্ট পন্থা ভাবিয়া সমসের ধর্মমানিক্যের পৌত্র এবং গদাধর ঠাকুরের পুত্র লবঙ্গঠাকুরকে উদয়পুর হইতে আনিয়া লক্ষ্মণমাণিক্য নাম দিয়া রাজা করেন। কৃষ্ণমালার মধ্যে ইহার এক বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়,—

সমসেরগাজী

> সামসের গাজী গেল আপনা বাড়ীত।
> না হইলে ত্রিপুরা রাজা না মিলে ত্রিপুরা॥
> ভুবনে বিখ্যাত ধর্ম্মমাণিক্য নৃপতি।
> গদাধর ঠাকুর যে তাহার সন্ততি॥
> লবঙ্গ ঠাকুর গদাধরের সন্ততি।
> উদয়পুরেতে তিনি করয়ে বসতি॥
> তাহাকে করিব রাজা রিহাঙ্গেতে গিয়া।
> তবে সে ত্রিপুর সব মিলিব আসিয়া॥
> এত ভাবি লবঙ্গ ঠাকুরের কারণ।
> উদয়পুরেতে লোক পাঠাইল তখন॥
> লোক আসি লবঙ্গ ঠাকুরকে লইয়া।
> উপস্থিত হইলেক রিহাঙ্গেতে গিয়া॥
> লক্ষ্মণমাণিক্য নাম তখনে করিয়া।
> রাজা করিলেক তানে রিহাঙ্গেতে গিয়া॥

কৃষ্ণমাণিক্যের শাসনকালে বিশ্বাস বংশীয় দেওয়ানের সহিত মতান্তর হইলে তিনি মেহেরকুলের অন্তর্গত দুর্গাপুরের সিংহবংশীয় সুরমণি সিংহকে চাকলা রোশনাবাদের দেওয়ান নিযুক্ত করেন। যুবরাজ হরিমণি কৃষ্ণমাণিক্যের জীবৎকালেই দুই শিশুপুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন। কৃষ্ণমালায় হরিমণির পরলোকগমনের তারিখ নিম্নরূপ—

> ষোলশত সাতানব্বই শক পরিমাণে।
> জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী দিনে।

হরিমণির মৃত্যুর পর কৃষ্ণমাণিক্য রাজধরকে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কৃষ্ণমাণিক্য ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুলাই পরলোকগমন

করেন। তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে এইরূপ বহু খুটিনাটি তথ্য এবং স্থানীয় ঘটনার বিবরণে কৃষ্ণমালা সমৃদ্ধ।[১০] ইহার রচনা-বৈচিত্র্য তাদৃশ উল্লেখযোগ্য না হইলেও সমসাময়িক ঐতিহাসিক উল্লেখ হিসাবে এই কাব্যগ্রন্থের মর্যাদা সমধিক।

কৃষ্ণমালার মূল্যায়ন

প্রাচীন রাজমালার আলোচনাসূত্রে আমরা দেখিয়াছি যে, দুর্গামণি সংশোধিত রাজমালায় বিশ্বাসনারায়ণের উল্লেখ না থাকিলেও রাজমালার চতুর্থ খণ্ড কৃষ্ণমাণিক্যের অনুরোধে দুর্গামণির পিতা জয়দেব উজীর বিশ্বাসনারায়ণকে রচনা করিতে আদেশ দেন। এই খণ্ডে জয়মাণিক্য পর্যন্ত রাজাগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণে প্রাচীন রাজমালা গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। ইহার পরবর্তী রাজাদের বিবরণের জন্য দুর্গামণি সংশোধিত রাজমালার উপর নির্ভর করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। মহারাজ কাশীচন্দ্রমাণিক্যের রাজ্যকালে ১২৩৮ ত্রিপুরাব্দে (১৮২৬ খৃষ্টাব্দ) উজীর দুর্গামণি সমগ্র রাজমালার সংশোধন করেন। দুর্গামণি সংশোধিত রাজমালারও সকল খণ্ড প্রকাশিত হয় নাই। কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত রাজমালার তৃতীয় খণ্ড (অমরমাণিক্য হইতে কল্যাণমাণিক্য পর্যন্ত) যে দুর্গামণি সংশোধিত রাজমালার পুথি অবলম্বনে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা দুর্গামণির রাজমালার অপ্রকাশিত মুদ্রিত সংস্করণের[১১] সহিত তুলনামূলক পাঠ হইতে বুঝা যায়।

দুর্গামণি উজীর বিরচিত রাজমালা

দুর্গামণি রচিত রাজমালার চতুর্থখণ্ড হইতে জানা যায়, রাজা রামগঙ্গা মাণিক্যের রাজ্যকালে পিতা জয়দেবের আদেশে দুর্গামণি গোবিন্দমাণিক্য রাজার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।

জয়দেব উজীর ছিল জ্ঞান কলেবর।
তান হৈল দুই পুত্র এক সহোদর॥
রামমণি উজীর জ্যেষ্ঠ ছিল গুণমণি।
দুর্গামণি কনিষ্ঠেতে বলিল আপনি॥
গোবিন্দমাণিক্যাবধি যত রাজাগণ।
কৃষ্ণমাণিক্য মহারাজা করি সমাপন॥
রামগঙ্গামাণিক্য স্থানে বলিছি পূর্বেতে।
রাজমালা মধ্যাবৃত লিখহ তাহাতে॥

---

১০ কৃষ্ণমালার পুথি আগরতলাস্থ ষ্টেট লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

১১ রাজমালার অপ্রকাশিত মুদ্রিত সংস্করণ (শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের

দুর্গামণি লিখিয়াছেন, গোবিন্দমাণিক্যের রাজ্যকালে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নক্ষত্র রায় মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া রাজত্বের সনদ লাভ করেন এবং উদয়পুর অভিযান করেন। গোবিন্দমাণিক্যের মন্ত্রীবর্গ তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দেন কিন্তু রাজা উদয়পুর ত্যাগ করিয়া আরাকানরাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। "উদয়পুর ত্যাগে রাজা গোবিন্দ নৃপতি। রাণী সঙ্গে মনরঙ্গে রিহাঙ্গে বসতি॥" ইহার পর রসাঙ্গ রাজসভায় গোবিন্দমাণিক্যের অবস্থানকালে সুজা বাদশাহের আরাকান আগমন প্রসঙ্গে দুর্গামণি লিখিয়াছেন, রাজসভায় সুজা আগমন করিলে গোবিন্দমাণিক্য সিংহাসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। শা সুজা গোবিন্দমাণিক্যের সৌজন্যে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজের বর্তমান দুরবস্থার কথা জানাইয়া স্বীয় হস্তাঙ্গুরী উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে শাহ সুজার সহিত আরাকান-রাজ সন্দ-সু-ধর্ম্মের বিরোধ এবং আরাকান-রাজ কর্তৃক শাহ সুজার বঙ্গোপসাগরে নিমজ্জনের কাহিনীও রাজমালার মধ্যে পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গগীতিকার উল্লেখকালে আমরা এই কাহিনীর পর্যালোচনা করিয়াছি। শাহ সুজা ও গোবিন্দমাণিক্যের আরাকানে সাক্ষাৎ-বৃত্তান্ত অন্যত্র পাওয়া যায় না। শাহ সুজার সহিত গোবিন্দমাণিক্যের যে সাক্ষাৎ কোথাও হইয়াছিল তাহা বুঝা যায় গোবিন্দমাণিক্যের শাহ সুজার উপর গভীর অনুরাগের নিদর্শনস্বরূপ গোমতী নদীর তীরে সুজার নামে মসজিদ নির্মাণ হইতে। সাক্ষাৎ সংস্পর্শ না ঘটিলে এতাদৃশ আচরণ কি সম্ভব? রাজমালার বর্ণনানুযায়ী ছয় বৎসর রাজত্বের পর ছত্রমাণিক্যের মৃত্যু হইলে গোবিন্দমাণিক্য পুনরায় রাজা হন এবং মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট হস্তী নজরাণা প্রেরণের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু দুর্গামণির এই বিবরণ যথার্থ নহে। নক্ষত্ররায় ছত্রমাণিক্য নামে মাত্র কয়েকমাস রাজত্ব করেন।[১২] গোবিন্দমাণিক্যের সময়ে ছত্রমাণিক্য যেরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া নবাবের নিকট হইতে রাজত্বের সনদ লাভ করেন পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের রাজ্যকালেও ছত্রমাণিক্যের প্রপৌত্র জগতরাম সুযোগ বুঝিয়া সেই কৌশল অবলম্বন করেন। ভ্রাতৃহন্তা রাজা মহেন্দ্রমাণিক্যের মৃত্যুর পর রত্নমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্যোধন ঠাকুর ধর্মমাণিক্য নামে সিংহাসনারোহণ

গোবিন্দমাণিক্য ও শাহ সুজা

দুর্গামণির বিবরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি

১২ 'স্বাধীন ত্রিপুরার রাজমালা'—প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৫৪

করেন। তাঁহার অভিষেক মুদ্রার তারিখ ১৬৩৬ শক (১৭১৪ খৃষ্টাব্দ)। ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালের মধ্যে বহু যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়াছিল। দুর্গামণির রচনা হইতে জানা যায়, তাঁহার সময়ে মুর্শিদাবাদে নবাবের নিকট বৎসরে তিপান্নটি হস্তী করস্বরূপ প্রেরণের সর্ত ছিল। সেই সর্ত পালন না করায় মুর্শিদাবাদে রাজার উকিলের নিকট হস্তী প্রেরণের যে সকল তাগিদ-পত্র আসে তাহা রাজার নিকট গোপন করা হয় এবং এই কর বন্ধের সুযোগে জগতরাম তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূরণ অভিলাষে নবাবের নিকট রাজ্য-লাভের জন্য দরখাস্ত করেন এবং নবাবের সৈন্য সহায়তা লাভ করিয়া ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। কিন্তু প্রাচীন রাজমালার বিবরণ অন্যরূপ। এই বিবরণ অনুযায়ী ধর্মমাণিক্যের রাজত্বের প্রথম দিকে ঢাকার নবাবের সহিত তাঁহার যে সংঘর্ষ হয় তাহার সহিত জগতরামের কোন যোগসাজস ছিল না।

প্রাচীন রাজমালার বিবরণ অন্যরূপ

বোদ্ধিমন্ত নবাব জে ঢাকাতে আছিল।
ভোগসেশ হৈল তান ঢাকা হনে গেল॥
আর এক নবাব ঢাকাতে আসিল।
সর্ব্ব নবাবের মত ধন তারে দিল॥
সন্তোষ না হৈল তার ক্রোধ চিত্ত হৈল।
কসবা নগরে সন্য পাঠাইয়া দিল॥

এই যুদ্ধে ত্রিপুর সেনাপতি ছিলেন রণভীমনারায়ণ। আটমাস যুদ্ধের পর নবাব-সৈন্য ফিরিয়া যায়। দুর্গামণির মতে জগতরাম মাত্র একবার ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু প্রাচীন রাজমালার বিবরণ অনুসারে জগতরাম কর্তৃক মোট দুইবার—প্রথমবার স্বয়ং এবং দ্বিতীযবার নবাব সৈন্যের সহায়তায় ত্রিপুরা আক্রান্ত হয়। তাঁহার প্রথমবারের অভিযান ধর্মমাণিক্যের সহিত নবাবের পূর্বোল্লিখিত যুদ্ধেব কিছুকাল পরেই ঘটে। প্রাচীন রাজমালা হইতে এই অভিযানের বিবরণ সংগ্রহ করা যায়।

জগতরাম নামে এক দুষ্ট পাপাচারি।
জয়নারায়ণ সুত কাদবা অধিকারী।
নৃপতির অস্বর্য দেখীয়া অনিবার।
জত্ন আরম্ভিল হইতে দেস অধিকার॥
চন্দ্রকীর্ত্তি নারায়ণ গেল হস্তী ধরিবারে।
সর্ব্ব সৈন্য সঙ্গে গেল অরণ্য মাঝারে॥

এহি ছিদ্র বার্ত্তা সেই জখনে পাইল।
রাজ্জ লইবার সেই সন্ত পাঠাইল॥
মগ আদি কত সন্য একজুক্ত হইয়া।
কুমিল্লার থানা লইল সন্ধান করিয়া॥

জগতরামের এই অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়,—

কাদবার জত সন্য যুদ্ধেত হারিয়া।
জুদ্ধ এড়ি পলাইল ভয়যুক্ত হৈয়া।
জগতরামে রায্য হেতু বহু ছেষ্টা কৈল।
না পাইল রাজ্য সেই অপমান পাইল॥

ইতিহাস হইতে জানা যায়, সম্রাট অওরঙ্গজেবের রাজ্যকালে ছত্রমাণিক্যের পুত্র উৎসব রায কাদবা প্রভৃতি পরগণার জায়গীর পান। জগৎরাম এই উৎসব রায়ের পৌত্র ছিলেন। উদয়পুরে এক প্রবল মগ সৈন্যদলের ধর্মমাণিক্যের বিরুদ্ধাচারণের বৃত্তান্ত দুর্গামণির রাজমালায় আছে। জগতরাম তাহা হইলে কি ইহাদের সাহায্য গ্রহণ করেন?

জগতরামের এই পরাজয় কাহিনীর পরই দুর্গামণি মোগল কর্তৃক ত্রিপুরা বিজয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিযাছেন। এই যুদ্ধে রাজা পরাজিত হইয়া আত্মগোপন করেন এবং পরে জগতশেঠের (ফতেচাঁদ) সহায়তায় নবাবের নিকট হইতে পুনরায় রাজত্বের সনদ লাভ করেন। কিন্তু প্রাচীন রাজমালায় তৎপূর্বে জগতরাম কতৃক আর একবার ত্রিপুরা আক্রমণের উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিধাতা লিখীত কেবা পারে খণ্ডাইবার।
আউসেশ মৃর্ত্তু হৈল ঢাকার নবাব।
আর এক অধিকার ঢাকাতে আসিল।
পরিমিত ধন দিয়া অবধি করিল॥
শত্রু মুখে রাজার ঐশ্বর্য সব যুনি।
করারগী রাখী জুদ্ধ করিলেক পুনি॥
বিরূপ দেখিয়া রাজা মনে কৈল সার।
প্রাচির করিয়া জুদ্ধ কৈল আনিবার॥
বহু দিন জধ্য করি ক্ষেমা করি মন।
নবাব সাক্ষাতে জাইয়া মিলিত রাজন॥

রাজ্য লইতে জগতরামের মনে বাঞ্ছা ছিল।
কালিকার কৃপা নাহি লজ্জ্যা সে পাইল ॥
কর্মের নির্ব্বন্ধ কেবা পারে খণ্ডাইবার।
পুনরপি লজ্জ্যা পাইল পাপ দুরাচার ॥

শেষ যুদ্ধে ধর্মমাণিক্য মোগল সৈন্যের নিকট পরাভূত হন এবং ত্রিপুরা (সমতলক্ষেত্র) মোগল অধিকারে চলিয়া যায়। 'তারিখ-ই-বাঙ্গালা' রিয়াজ-উস্-সালাতীন প্রভৃতি ইতিহাসে ধর্মমানিক্যের এই যুদ্ধের প্রামাণিক বৃত্তান্ত আছে। এই বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, মুরসিদ-কুলী খাঁর সহায়তাপুষ্ট মীর হবিবই এই অভিযানের প্রকৃত পরিচালক ছিলেন। তিনি জগতরামকে রাজত্বদানের প্রলোভনে ত্রিপুর অভিযানের পথ প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করেন এবং পাটপাসা পরগণার জমিদার আকাসাদেকের সহায়তা বলে অভিযান পরিচালনা করেন। এই যুদ্ধের ফলে রাজা পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মীর হবিব দেশ অধিকার করেন। বিজিত রাজ্যের রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাদি করিয়া মীর হবিব জগতরামকে জমিদারি অর্পণ করেন এবং আকাসাদেককে মোগল পক্ষের ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং ধনরত্ন, লুণ্ঠিত সামগ্রী, বহু সংখ্যক হস্তীসহ জাহাঙ্গীর নগরে ফিরিয়া যান এবং এই সকল উপহারসহ ত্রিপুরবিজয় বার্তা নবাব সুজা খাঁর নিকট নিবেদন করেন। সুজা খাঁ ত্রিপুরার নাম রাখেন 'রোশনাবাদ' অর্থাৎ আলোকপুরী। জগতরাম খুব বেশীদিন ত্রিপুরার রাজা ছিলেন না, ধর্মমাণিক্য মৃত্যুর পূর্বে জগতশেঠের সহায়তায় পুনরায় রাজত্ব লাভ করেন। প্রাচীন রাজমালায়ও আছে ;—

ধর্ম্মরাজা পুনর্ব্বার বৎসরেক ছিল।
আয়ুসেস মহারাজ স্বর্গে চলি গেল ॥

মোগল কর্তৃক ত্রিপুরা বিজয়ের তারিখনির্ণয়

মোগল কর্তৃক ত্রিপুর বিজয়ের তারিখ লইয়া মতভেদ আছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ধর্মমাণিক্য প্রদত্ত সর্বশেষ দানপত্রের তারিখ ১১৩৯ ত্রিপুরাব্দ ১৭ই আষাঢ় এবং পরবর্তী রাজা মুকুন্দমাণিক্য প্রদত্ত সর্ব প্রাচীন দানপত্রের তারিখ ১১৩৯ সনের ১১ই শ্রাবণ হইতে অনুমান করেন যে, ধর্মমাণিক্য ১১৩৯ সনের আষাঢ় মাসে (১৭২৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাস) পরলোক গমন করেন এবং ইহার পূর্বেই ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে মোগল কর্তৃক ত্রিপুরা বিজিত হয়। এই অভিযান যে ১৭২৭ খৃষ্টাব্দের পরে হইয়াছিল

তাহা সুনিশ্চিৎ, কারণ এই সালেই সুজা বঙ্গাধিকার লাভ করেন এবং তাঁহার বঙ্গাধিকারকালেই ত্রিপুরা আক্রান্ত ও বিজিত হয়।[১৩]

ত্রিপুরার শেষ স্বাধীনরাজা

প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যই ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন রাজা। তাঁহার পর হইতেই একজন ফৌজদার ত্রিপুরায় নিযুক্ত হইতে থাকে এবং সেই ফৌজদারের তত্ত্বাবধানে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা হয়। ত্রিপুরার পরবর্তী বিবরণ পারিবারিক ষড়যন্ত্র ও অশান্তিপূর্ণ। দুর্গামণি লিখিয়াছেন, ধর্মমাণিক্যের পর যুবরাজ চন্দ্রমণি মুকুন্দমাণিক্য নামে রাজা হন এবং ১৭২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বৎসর রাজত্ব করেন এবং পরিশেষে হস্তীকর দিতে না পারায় তিনি কারারুদ্ধ হন। কারাগারেই তাঁহার জীবনান্ত হয় এবং রাণী তাঁহাব সহমৃতা হন। মিঃ গ্রাণ্টের বিবরণ হইতে জানা যায় যে মুরসিদ কুলিখাঁর মৃত্যুর পরে ত্রিপুরা আবার স্বাধীন হয়।[১৪] মুকুন্দমাণিক্যের মৃত্যুর পর ত্রিপুরায় আবার অন্তর্বিপ্লব সুরু হয়। সেনাপতি বিচারনারায়ণ রুদ্রমণি যুবরাজকে রাজা করিতে মনঃস্থ করেন এবং সহমৃতা রাণীব বাক্য লঙ্ঘন করিয়াই রুদ্রমণিকে রাজপদ প্রদান করেন। রুদ্রমণি জয়মাণিক্য নামে রাজা হন। রাজপুত্র পাঁচকড়ি ঠাকুর মুর্শিদাবাদ হইতে নবাবের পরোয়ানা বলে রাজত্বের সনদ গ্রহণ করেন এবং ইন্দ্রমাণিক্য নামে উদয়পুরে রাজা হন। কিন্তু বেশিদিন রাজ্যভোগ তাঁহার ভাগ্যেও ঘটে নাই। তাঁহাদের এই পারিবাবিক চক্রান্তের সুযোগে দক্ষিণশিক পরগণার সমসেব গাজি, হাজি হোসেনের সহিত রাজ্যলাভের ষড়যন্ত্র করিয়া ইন্দ্রমাণিক্যের কর বাকীর অজুহাতে তাঁহাকে নিগ্রহের জন্য নবাবের নিকট সুপারিশ করেন। নবাব মহাবৎজঙ্গ (আলীবর্দী খাঁ) ইহা শুনিয়া হাজীকে রাজধানীতে আসিতে আদেশ দেন এবং

হাজী হোসন সমসর একতা হইয়া।
চলিলেক হোসনদ্দি নবাব লইয়া॥

ইন্দ্রমাণিক্যের পর পুনবায় জয়মাণিক্য নবাবেব কৃপায় রাজ্যলাভ করেন। কিন্তু ঢাকার নবাবের সাহায্যপুষ্ট ধর্মমাণিক্যের অন্যতম পুত্র উদয়মাণিক্য ও জয়মাণিক্যের মধ্যে এই সময় সিংহাসন লইযা বিবাদ আরম্ভ হয়।

জয় ইন্দ্রমাণিক্য এ দুই রাজন।
দুয়ের বিবাদ উদয়মাণিক্য কথন॥

---

১৩ 'স্বাধীন ত্রিপুরার রাজমালা' প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৫৪

১৪ View of the Revenue of Bengal—Fifth Report. Reprint of 1917 Vol 11 pp 399-400.

শেষ পর্যন্ত হাজী হোসেন নবাবের নিকট দরখাস্ত করিয়া রাজ্যের ওয়াদার নিযুক্ত হইলেন এবং হাড়িধন ঠাকুর নামমাত্র রাজ্যাধিপ রহিলেন। এই হাড়িধন ঠাকুর বিজয়মানিক্য নামে রাজা হন। নবাবের নিকট ত্রিপুরা সম্বন্ধে হাজীর উক্তি হইতে ক্ষমতাহীন রাজা এবং অস্তং-গমিত মহিমা ত্রিপুর-রাজবংশের দৌর্বল্যের চিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

রাজত্বের জমিদারি ওয়াদাতে থাকিব।
রাজ্যেতে দখল রাজার কিছু না রহিব॥
ত্রিপুরার রাজা মাত্র খেদার কারণ।
এইমাত্র হাজি বলে নবাব সদন॥

রাজধরমাণিক্যের বিবরণ

রাজমালা ব্যতীতও ত্রিপুরার এই দৌর্বল্যের বিস্তারিত বিবরণ অন্যত্র পাওয়া গিয়াছে। রাজধরমাণিক্য ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার রেসিডেণ্ট জন বুলারের নিকট এ' সম্পর্কে এক পত্র লিখিয়া পাঠান। চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার কালেক্টারীতে রক্ষিত এই পত্রের ইংরেজী অনুবাদের সার সঙ্কলন করিয়াছেন শ্রীযুক্তদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।[১৫] বিবরণটি স্থানে স্থানে পক্ষপাতদুষ্ট হইলেও বহু তথ্যপূর্ণ। এই বিবরণ হইতে জানা যায়, হাজি মাসুম মুকুন্দমাণিক্যের রাজ্যকালে উদয়পুরে মোগল ফৌজদার নিযুক্ত হন। সেই সময় 'খেদা দারোগা' রুদ্রমণি ঠাকুর ধীবর-নারায়ণ নামক ত্রিপুরার 'সরকারের' প্ররোচনায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হাজি হোসেনকে বধের সঙ্কল্প রাজাকে লিখিয়া জানান। পাঁচকড়ি ঠাকুর তখন মুর্শিদাবাদে ত্রিপুররাজের প্রতিভূস্বরূপ ছিলেন। রাজা ভয়ে রুদ্রমণির চিঠি ফৌজদারকে দেখাইলে হিতে বিপরীত ঘটে। ফৌজদার তাঁহাদের সকলকে রুদ্রমণির সহিত সংশ্লিষ্ট মনে করিয়া রাজাকে কারারুদ্ধ করেন এবং রাজা কারাগারেই প্রাণত্যাগ করেন। রাজার এই মৃত্যুবিবরণ দুর্গামণি প্রদত্ত বিবরণের সহিত অভিন্ন নহে। রুদ্রমণি সেই সুযোগে উদয়পুর অবরোধ করেন এবং রাণীর বাক্য অমান্য করিয়া 'মতাই' নামক স্থানে জয়মাণিক্য নাম ধারণপূর্বক রাজা হইলে ফৌজদার এবং কারারুদ্ধ রাজপুত্রগণ পলায়ন করিয়া ঢাকায় পাঁচকড়ি ঠাকুরকে সংবাদ দেন। পাঁচকড়ি অতঃপর নবাবের নিকট হইতে সনদ গ্রহণ করিয়া উদয়পুরে ইন্দ্রমাণিক্য নামে রাজা হন। জয়মাণিক্য ছয়মাস পরে ঢাকার

১৫ চুণ্টাপ্রকাশ, আশ্বিন ১৩৪৫

তৎকালীন নবাবকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া ইন্দ্রমাণিক্যকে কারারুদ্ধ করান। নবাব ধর্মমাণিক্যের অপরপুত্র গঙ্গাধর ঠাকুরকে উদয়মাণিক্য নাম দিয়া কুমিল্লা প্রেরণ করেন। কিন্তু জয়মাণিক্য ঢাকার জগতরায়ের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া উদয়মাণিক্যকে রাজচ্যুত এবং জগতরায়ের ভ্রাতা নরহরিকে যুবরাজ করেন এবং স্বয়ং দ্বিতীয়বার রাজপদে অভিষিক্ত হন। কারারুদ্ধ ইন্দ্রমাণিক্যও নবাব হুসেন কুলী খাঁর সহায়তায় মুক্তিলাভ করিয়া চারি হাজার সৈন্যের সাহায্যে জগৎমাণিক্যকে পর্বত হইতে ধরিয়া আনেন এবং স্বয়ং দ্বিতীয়বার রাজা হন। জয়মাণিক্য হাজী হোসেনের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইলে হাজী ইন্দ্রমাণিক্যের ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করিতে থাকেন। অপর দিকে ইন্দ্রমাণিক্যের অভিযোগ শুনিয়া নবাব তদন্তের জন্য হুসেনুদ্দীন খাঁকে প্রেরণ করেন। তিনি উভয়কে সঙ্গে করিয়া নবাবের নিকট আসেন। নবাব তখন বর্গীদমনে ব্যস্ত। ইন্দ্রমাণিক্যের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ইন্দ্রমাণিক্য অসুস্থতার অজুহাতে যুদ্ধে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার চিকিৎসার ভার হাজী হোসেনের উপর ন্যস্ত হইলে হাজী প্রেরিত চিকিৎসকের হস্তেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ত্রিপুরার শাসনভার অতঃপর সমসর গাজীর উপর বর্ত্তায়। ইহার অল্পকাল পরেই কুমিল্লায় জয়মাণিক্যের মৃত্যু হয়। হাজী হোসেন হাড়িধন ঠাকুরকে বিজয়মাণিক্য নামে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন কিন্তু বিজয়মাণিক্য ত্রিপুরায় কখনো পদার্পণ করেন নাই, অল্পকাল পরেই ঢাকায় তাঁহারও মৃত্যু হয়। বিজয়মাণিক্যের সম্বন্ধে অন্য মতও প্রচলিত আছে।[১৬] রাজধরের বিবরণের সহিত দুর্গামণি প্রদত্ত বিবরণের অল্পবিস্তর পার্থক্য আছে। কিন্তু ইহা দুর্গামণি প্রদত্ত বিবরণ অপেক্ষা বিশদ। ইহার পর সমসের গাজী বনমালী ঠাকুরকে লক্ষ্মণমাণিক্য উপাধি দিয়া নামমাত্র রাজারূপে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। এই সংবাদে জনগণ উৎসাহবোধ না করিয়া

ত্রিপুর ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়

১৬ কৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালায় জয়মাণিক্যের অব্যবহিত পরবর্তী রাজা বিজয়মাণিক্যের নামে নবাবী সনদের তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার প্রদত্ত তিনখানি তারিখযুক্ত সনদের উল্লেখ হইতে বিজয়মাণিক্য ৫ বৎসর রাজত্ব করেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা হইলে কি একই সময়ে বিজয়মাণিক্য এবং লক্ষ্মণমাণিক্য ত্রিপুরার রাজা হন?

'খেদাকার্য' বন্ধ করিলে সমসের বঙ্গদেশীয়দের দ্বারা খেদাকার্য সম্পন্ন করান।

না আসিল ত্রিপুর লোক তখনে জানিয়া।
খেদা করে সমসের বাঙ্গাল লোক দিয়া॥

এই সময়ে রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলাও অন্তর্হিত হয়। চোর-ডাকাতের উপদ্রবে প্রজাগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। দুর্গামণি লিখিয়াছেন যে, এইভাবে বার বৎসর সমসেরের অত্যাচার চলিবার পর নবাব মহবৎ জঙ্গ সংবাদ পাইয়া সমসের গাজীকে বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে আনিয়া তোপ-সংযোগে হত্যা করেন।[১৭] প্রকৃতপক্ষে হাজীর রাজ্যাধিকার কাল হইতেই ত্রিপুরায় দুর্গতি দেখা দেয়ঃ—

যদবধি হাজি রাজ্য করিল দখল।
* * *
রাজধানী রাজা নাহি আছিল তখনে।
জয়দেব উজীর কহে নৃপ বিদ্যমানে॥

পরবর্তী রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের রাজত্বকালের সুরু ১১৭০ ত্রিপুরাব্দ অর্থাৎ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার সময়ে রাজধানীও আগরতলায় স্থানান্তরিত হয়।

এগারশ সত্তর সন হয়েত যখন।
আগরতলা রাজধানী করিল তখন॥

জমিদারী ব্যবস্থাযও কিছু পরিবর্তন ঘটে। মন্ত্রিগণ এক একটি পরগণার শাসনভার লাভ করেনঃ—

জমিদারী পরগণা আমল হইল।
কসবাতে যুবরাজ তখনে আসিল॥
ত্রিপুরা প্রধান মন্ত্রী আছিলেক যত।
পরগণাতে একজনা শাসন করিল॥

রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে 'কৃষ্ণমালা' নামক যে জীবনী-কাব্য রচিত হইযাছিল দুর্গামণির রাজমালায় তাহার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ পাওয়া যায়। এই অংশ হইতে কৃষ্ণমাণিক্যের জীবনী-কাব্য কৃষ্ণমালার রচয়িতা এবং গ্রন্থের পরিধির কথা জানিতে পারা যায়। কৃষ্ণমাণিক্যের শাসনকালে চট্টগ্রামের প্রথম ইংরেজ শাসক Harry

১৭ এ সম্পর্কেও মতভেদ আছে—গাজীনামার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

Verelst (শাসনকাল ১৭৬১খৃঃ-৬৪ খৃঃ) যে কাছাড় অভিযান করেন দুর্গামণির রাজমালায় তাহার উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়,—

হারবিলাস সাহেব বহু সৈন্য লইয়া।
চাটিগ্রাম হতে নুরনগর আসিয়া॥
কাছাড়াদি রাজ্য হৈয়া মণিপুর পথে।
ব্রহ্মরাজ্য মারিবার চলিল ত্বরিতে॥

কৃষ্ণমালার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে কৃষ্ণমালার মধ্যে এ সম্পর্কে আরো বিস্তৃত এবং কৌতুকজনক বিবরণ আছে। দুর্গামণি মীরকাসেমের দেওয়ান বৃন্দাবন কর্তৃক ইংরেজ কুঠি লুণ্ঠন এবং ঢাকা হইতে ইংরেজ সৈন্যের বিতাড়ন-কাহিনীও সূত্রাকারে উল্লেখ করিয়াছেন।

কাছাড় হতে সৈন্য সবে ফিরিয়া আসিল।
ইংরাজ কুঠি আদি বৃন্দাবন লুটিল॥
নূরনগর হৈয়া সৈন্য নৌকাপথে গেল।
ঢাকা হতে বৃন্দাবন দেওয়ান খেদাইল॥

কৃষ্ণমাণিক্য কলিকাতা গমন করিয়া নবাবের নিকট হইতে রাজত্বের সনদ গ্রহণ করেন এবং জগন্নাথপুরে আসিয়া রাজধানী নির্মাণ করেন। রাজ্যের মধ্যে চৌদ্দ মাদল বাদ্যসহকারে মহোৎসব পালনের বর্ণনায় রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ এবং উৎসাহ প্রদানের ইঙ্গিত আছে। কৃষ্ণমাণিক্যের সময়েই ইংরেজদের সহিত ত্রিপুরার যোগসূত্র দৃঢ় স্থাপিত হয়। তাঁহার পরে মহারাণী জাহ্নবীদেবী কিছুকাল শাসনকার্য পরিচালনা করেন কিন্তু সেই সময়ে ইংরেজ সরকারের পক্ষ হইতে লিক সাহেব কর গ্রহণ করিতেন।

লিক সাহেব জমিদারী প্রজার কর লয়ে।
রাজ্যের মুসরা রাণী পায় সে সময়ে॥

এই সময় হইতে ইংরেজ শাসকগণ ঘন ঘন ত্রিপুরার রাজ্য পরিচালনা ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন। পরবর্তী রাজা রাজধরমাণিক্যের সহিত শাসনকর্তা লিক সাহেবের এইজন্য মনোমালিন্য ঘটে। রাজধরমাণিক্যের রাজ্যপ্রাপ্তির সময়ে ত্রিপুরায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটে এবং দুই বৎসর ধরিয়া জনগণ কষ্ট ভোগ করেন।

রাজমালা হইতে এই দুর্ভিক্ষের বর্ণনা উদ্ধৃত হইল,—

এগার শ চৌরানব্বই ত্রিপুরের সন।
অন্নাভাবে প্রজা ক্ষিতি হইল নিধন॥
মূল্য দিয়া অন্ন নাহি পায় কোনস্থান।
পিতাপুত্রে সম্বন্ধেতে অন্ন নাহি দান॥

* * *

এই মতে দুই বৎসর দুর্ভিক্ষ আছিল॥

১২১৩ ত্রিপুরাব্দে রাজধরমাণিক্য পরলোকগমন করিলে রাজ্যাধিকার লইয়া জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়—

কালীচরণ নাম এক রাজার যে বংশ।
দরখাস্ত করে সে যে পাইতে রাজঅংশ॥

ইহাতে জজ রায় দেন যে,—

দখলকার দখলেতে রাজ্য যে থাকিব।
যাহার যে স্বত্ব থাকে নালিশ করিব॥
বড়ঠাকুর দখল এখনে রহিব।
হুজুরের কর ঠাকুর নিজ নামে দিব॥

স্বত্বাধিকারের দাবী জানাইয়া দরখাস্ত বড় কম হয় নাই,—

যত অংশী রাজবংশী ঢাকাতে রহিয়া।
রাজত্বের দরখাস্ত করে বিবেচিয়া॥
উমানাথ নামে দ্বিজ নদীয়া বসতি।
নবদ্বীপ কৃষ্ণচন্দ্র নৃপতির জ্ঞাতি॥
রাজধরমাণিক্যাবধি তহশীল রাজেতে।
বুদ্ধিমন্ত জ্ঞানশীল বিশেষ তর্কেতে॥
রামগঙ্গা বড় ঠাকুর বুঝিয়া আশয়।
উমানাথ ঢাকা পাঠায় জবাব বিষয়।

মোকদ্দমা চলিতে থাকে এবং এই অবকাশে রামগঙ্গামাণিক্যের বিবাহ কার্য নিষ্পন্ন হয়। এই বিবাহে প্রত্যেক প্রজা রাজাকে এক আনা করিয়া চাঁদা দেয়। এই সময় হইতেই একপ্রকার বিবাহ, শ্রাদ্ধ এবং অভিষেক প্রভৃতি দশকার্যে প্রজারা রাজসরকারে চাঁদা দিত। রামগঙ্গামাণিক্য ত্রিপুর ১৭১৭ সালে সিংহাসনে বসিলেও মোকদ্দমায় তাঁহার বিরুদ্ধেই

ডিক্রী হয়। তিনিও যুদ্ধায়োজন করেন এবং উদয়পুরে ইংরেজ সৈন্যের সম্মুখীন হন। কিন্তু সদর হইতে শাসনকর্তা Harrington সাহেব আসিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। গোপনে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সাধিত হয় এবং "বারশ উনিশ সনে বৈশাখ মাসেতে। ঢাকা হতে যুবরাজ আসিল রাজ্যেতে॥" আশ্বিন মাসে তিনি দুর্গামাণিক্য নাম ধারণপূর্বক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং তাঁহার এই সিংহাসনারোহণ উপলক্ষে প্রজাদের পুনরায় এক আনা করিয়া 'তৌজি' চাঁদা দিতে হয়।

তৌজি প্রথা

সিংহাসনস্থের চান্দা প্রজা হতে লয়।
এক আনা তৌজি চান্দা ছিল সে সময়॥

দুর্গামাণিক্যের মৃত্যু হইলে বারশ তেইশ ত্রিপুরাব্দে রামগঙ্গামাণিক্য জেলা শাসকের নিকট রাজ্যলাভ প্রত্যাশায় আবেদন জানান—আরো তিনটি দরখাস্তও জমা হয়। জজসাহেব রামগঙ্গামাণিক্যের প্রতি রাজ্য দখলের পরোয়ানা দেন।

উলেম্পেটন জজ তলপ দিয়া নরপতি।
রাজ্য দখল পরোযানা দিল শীঘ্রগতি॥

রামগঙ্গামাণিক্য জমিদারীব আয়তন বৃদ্ধি করেন কিন্তু ১২৩২ ত্রিপুরাব্দে লেঃ ফেসর আমিনি কার্যে আসিযা ঃ—

কম্পানি ত্রিপুর রাজ্য সবাদ্দ করিয়া।
মন্তলা কাছাড়াবধি সীমানা লিখিয়া॥
পূর্ব্ব সরদ্দ ত্রিপুর পর্ব্বতের ছিল।
কম্পানি সরদ্দ মধ্যে সামিল করিল॥

রাজা পূর্ব সীমানা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য দরখাস্ত করেন কিন্তু তাঁহার দরখাস্ত চাপিয়া রাখা হয়। তখন রাজা দেওয়ান গোবর্ধন মিত্রকে গভর্ণরের নিকট প্রেরণ করেন। গভর্ণরের আদেশে খিলাতের হুকুম হয়। বাধ্য হইয়া জজ সাহেব সম্মতিদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে ইংরেজদের বর্মা যুদ্ধের উল্লেখ এস্থলে পাওয়া যায় ঃ—

বারশ চৌত্রিশ সন ব্রহ্মায় রাম্বুতে।
কম্পানির তুমুলযুদ্ধ ব্রহ্মার সহিতে॥

১২৩৬ ত্রিপুরাব্দে তার্মাসন জেলাজজ হইয়া আসেন ত্রিপুরায়। তাঁহার সময়ে (রামগঙ্গামাণিক্যের মৃত্যুর পর) ত্রিপুরার নামে চল্লিশ হাজার টাকা

কর বাকী দেখান হয়। যুবরাজ কাশীচন্দ্রমাণিক্য ইহা অস্বীকার করেন এবং কলিকাতার কাউন্সিল হইতে রাজখিলাত আদায় করেন। রাজা হইবার তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি পরলোকগমন করেন বলিয়া জানা যায়।

বারশ ছত্রিশ সনে হইল রাজন।
বারশ উনচল্লিশ সনে রাজার মরণ॥

রচনাকাল

দুর্গামণি মহারাজ কাশীচন্দ্রের জীবৎকালের মধ্যেই ১২৩৮ ত্রিপুরাব্দে সমগ্র রাজমালা সংশোধন করেন এবং কাশীচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকালের বর্ণনাতেই তাঁহার রাজমালা সমাপ্ত হয়।

বৈশিষ্ট্য

দুর্গামণি ছিলেন উজীর, স্বভাব-কবি নহে। বংশানুক্রমে রাজাদের সিংহাসন প্রাপ্তি সূত্রে রাজপরিবারে অন্তর্দ্বন্দ্ব, ইংরেজ শাসনকর্তাদের হস্তক্ষেপ, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ প্রভৃতি নিরস বর্ণনামূলক এই দীর্ঘ কাহিনী অবতারণার মধ্যে কবিত্ব প্রকাশের অবকাশ যেমন স্বল্প, আয়াসও ততোধিক ক্ষীণ। মাঝে মাঝে ত্রিপদীর ছন্দবৈচিত্র্যে কচিৎ কোথাও কবিত্বের ক্ষীণ ঝঙ্কার কর্ণস্পর্শ করে। কিন্তু সমগ্র রাজমালার বিস্তারের তুলনায় তাহা নগণ্য। এই সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থের প্রায় শেষ দিকে রাম-গঙ্গামাণিক্যের মৃত্যু বর্ণনা প্রসঙ্গে দুর্গামণি যে উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল।

কৃষ্ণা প্রতিপদ হৈল সৌর কার্ত্তিকের।
চন্দ্রমার প্রকাশিত উদিত দিগের।
রাস রাত্রে যেন কৃষ্ণ গোপীর সহিত।
রাত্র শেষে লুকায় কৃষ্ণ গোপিকা মোহিত॥
সেইত সময় হৈল রাত্র শেষ যবে।
রামগঙ্গামাণিক্য দেহত্যাগ করে জীবে॥

রাসলীলার এই উপমাপ্রয়োগ হইতে কি দুর্গামণির বৈষ্ণব-প্রীতি সূচীত হয়?

গাজীনামা

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে নোয়াখালির সিরিস্তাদার মৌলবী ঘবিব কবি সেখ মনুহর রচিত "গাজীনামা" মুদ্রিত করেন। এই মুদ্রিত সংস্করণ অধুনা দুষ্প্রাপ্য। সৌভাগ্যক্রমে কৈলাসচন্দ্র সিংহ সংগৃহীত একটি আদ্যন্ত খণ্ডিত পুথি শ্রীযুক্ত-দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের সৌজন্যে আমরা দেখিবার সুযোগলাভ করিয়াছি। এই খণ্ডিত পুথিটি মূল পুথিটির একটি আধুনিক প্রতিলিপি—সম্ভবতঃ

একশত বৎসরের প্রাচীন। মুদ্রিত সংস্করণটি সম্পর্কে শ্রীযুত ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন,—মুদ্রিত সংস্করণে মূল গ্রন্থের অনেক অংশ পরিত্যক্ত ও পরিবর্তিত হইয়াছে। বিশেষতঃ গ্রন্থকারের বহুতর ভনিতার মধ্যে মাত্র একটি মুদ্রিত হওয়ায় (পৃ ৮০) এবং গ্রাম্য কবির কুলপরিচয় সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হওয়ায় গ্রন্থের কালনির্ণয় ও প্রামাণিকতা বিষয়ে ভ্রমপ্রমাদের অবকাশ সৃষ্টি করিয়াছে।[১৮]

কবির পরিচয়

হস্তলিখিত পুথিটির মধ্যে কবির "নিজ করছি" বিবরণ অর্থাৎ, বংশাবলীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। পল্লীকবি সমসের গাজীর পূর্ব-পুরুষগণের নাম সংগ্রহ করিতে না পারিলেও স্বীয় পিতৃমাতৃকুলের ছয় সাত পুরুষের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই বিবরণ হইতে জানা যায়, ভুলুয়ার তালুকদার 'মাহাম্মদ নাছির' ছিলেন কবির ষষ্ঠপুরুষ উর্ধতন এবং নাছিরের পৌত্র সেকগাজী ভুলুয়া ত্যাগ করিয়া দক্ষিণশিকে আসিয়া বসবাস করেন। ইহার কনিষ্ঠপুত্র "সাদাক মাহাম্মদ" ছিলেন কবির পিতামহ। পিতামহের নিকট হইতেই কবি সমসের গাজীর কাহিনী সংগ্রহ করেন। "কহে সেখ মনুহরে পাঞ্চালি রচিয়া। পীতামোহ মুখে বাক্য সকল শুনিয়া ॥" কবির প্রমাতামহ তাহের উজির এবং পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাসির মহম্মদ সমসেরের সমসাময়িক ছিলেন। দক্ষিণশিক পরগণার কুঞ্জরা গ্রামে আনুমানিক ১৭১০ খৃষ্টাব্দে সমসের জন্মগ্রহণ করে।

গাজীনামার ঐতিহাসিকত্ব

সেখ মনুহরের কাব্য রচনার কোন তারিখ নাই। পূর্বোল্লিখিত বংশাবলী হইতে রচনাকাল ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পূর্বে নহে বলিয়া মনে হয়।[১৯] সেখ মনুহর ছিলেন অশিক্ষিত পল্লীকবি—তাঁহার জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত স্বল্প, তদুপরি তিনি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না, পিতামহের নিকট সমসেরের বিজয় কাহিনী শুনিয়াছিলেন। স্বভাবতঃই সেই ঘটনা তখন কাহিনীতে পর্যবসিত হইয়াছে। সুতরাং তথ্যোদ্ধার নহে, পল্লীকবির রচনা হইতে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ হিসাবে ঐতিহাসিক বিবরণ গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অবশ্য কাব্যের এই ঐতিহাসিক ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া না ফেলিলে

---

১৮ সা-প-প ১৩৫৮

১৯ চট্টগ্রাম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪৫

কিছু স্থানীয় ঘটনা এবং সমসাময়িক বিবরণও ইহার মধ্যে পাওয়া যায়।

সমসেরের জন্ম ও বাল্যকালের বর্ণনা অপ্রাকৃত। সে সম্বন্ধে আলোচনাও অনাবশ্যক। যৌবনে সমসের স্থানীয় জমিদারের অধীনে কর্মে নিযুক্ত থাকাকালে জমিদার-কন্যার রূপমুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে জমিদারের সহিত তাহার শত্রুতা ঘটে। প্রবলপরাক্রমশালী ভ্রাতা সান্ধ এবং কচুয়া নিবাসী ভৌমিক নূর মহম্মদের সহায়তায় সমসের সপুত্র জমিদারকে নিধন করে। দক্ষিণশিক পরগণার অংশীদার রতন চৌধুরী ত্রিপুরার রাজসৈন্যের সহায়তায় সমসেরের ছাগলাই কেল্লা দখল করেন, কিন্তু সমসের ত্রিপুরার উজীরকে কৌশলে বন্দী এবং পরিশেষে স্বীয় সমর্থক করিয়া ফেলে। মনুহর এই উজীরের নাম 'জয়দেব' বলিলেও কৃষ্ণমালায় ইহার নাম রামধন দত্ত বিশ্বাস। ত্রিপুরার রাজা ইন্দ্রমাণিক্য অনন্যোপায় হইয়া সমসেরকে দক্ষিণশিক পরগণার জমিদার বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু সমসেরের উচ্চাশা ছিল আরো প্রবল, তাই সৈন্য সংগ্রহ এবং লুণ্ঠন তাহার আরব্ধ হইয়া উঠে। তাহার লুণ্ঠনের এক পরিকল্পনা গাজীনামা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

> জগতপুর খণ্ডল অবধি মণিপুর।
> চৌদ্দগ্রাম গোসাইর মেহেরকুলপুর॥
> নুরনগর লৌহগড় উদয়পুরে গিয়া।
> আটজঙ্গল বিশালগড় সকলে লুটিয়া॥
> দান্দার বাউরপুর যাব ভুলুয়া নগরী।
> উমরাবাদ আহম্মদাবাদ যতেক নগরী॥

গাজীনামা রচয়িতার ত্রুটি

ইহার ফলে ত্রিপুররাজগণের সহিত সমসেরের একাধিক যুদ্ধ হয়। কবি সেখ মনুহর এই সকল যুদ্ধের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার বর্ণনা হইতে মনে হয় যে একই সময়ে যেন এই সকল যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। বিভিন্ন যুদ্ধের স্থানসাদৃশ্যবশতঃও কবির এই ভ্রম হইতে পারে। রাজমালার আলোচনাকালে ইতিপূর্বে আমরা সমসেরের আবির্ভাবকালে ত্রিপুরার বিশৃঙ্খল অবস্থার উল্লেখ করিয়াছি। জয়মাণিক্য, বিজয়মাণিক্য এবং ইন্দ্রমাণিক্য—'একরাজ্যে তিন রাজার' অধিকার লাভ প্রচেষ্টার ফলে যে বিপ্লবের সূত্রপাত হয় সেই বিপ্লবজনক পরিস্থিতির সুযোগে হাজী

হোসেনের[২০] সহায়তায় সমসের ত্রিপুরা আক্রমণ করে। রাজমালার বর্ণনানুযায়ী—

হাজি হোসেন মোগল ঢাকাতে বসতি।
সমসর গাজি দস্যু দক্ষিণশিকস্থিতি॥
গাজিয়ে মনে করে ত্রিপুররাজ্য লইতে।
হাজি হোসন মুরব্বি করিল কোনমতে॥

ত্রিপুরার রাজা ইন্দ্রমাণিক্য প্রদত্ত বিভিন্ন সনদের তারিখ আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন যে, ইন্দ্রমাণিক্যের রাজ্যকালের শেষভাগেই তাঁহার সহিত সমসেরের দক্ষিণশিক অঞ্চলে তিনটি খণ্ড যুদ্ধ হয়।[২১] প্রথম সংঘর্ষ হয় ছাগলাই গ্রামে, দ্বিতীয় কিল্লাদীঘি এবং তৃতীয় যুদ্ধ মহেশ পুষ্করিণীর পাড়ে।

রাজসৈন্য মৈল বহু অবশিষ্ট সৈর্ণ।
মহেশ পুষ্করিণী পাড়ে গেল অগ্রগণ্য॥

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইন্দ্রমাণিক্য উদয়পুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এই উদয়পুরে সংঘটিত যুদ্ধেও ইন্দ্রমাণিক্যের পরাজয় ঘটে। সেখ মন্নুহর এই যুদ্ধের পর তৃতীয় যুদ্ধের আর পৃথক উল্লেখ না করিয়াই রাজার আগরতলায় পলায়ন এবং সেখান হইতে মণিপুরের রাজার আশ্রয় গ্রহণের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধের পর নবাব প্রেরিত হুসেনুদ্দীন খাঁর সহিত মুর্শিদাবাদ যাত্রার পর ইন্দ্রমাণিক্য আর ত্রিপুরায় প্রত্যাবর্তন করেন নাই। কৃষ্ণমালা হইতে জানা যায় যে, ইন্দ্রমাণিক্য দেশে সমসেরের আধিপত্য লাভের কথা জানাইয়া তাঁহাকে পর্বতে আশ্রয়লাভের পরামর্শ দিয়াছিলেন।

---

২০ "সমসেরের পৃষ্ঠপোষক হাজি হোসনের পরিচয় অজ্ঞাত। সমসেরের অধিকারের প্রারম্ভেই তাঁহার আবির্ভাব, শেষভাগে নহে। তৎসম্বন্ধে কবির বিবরণ নিতান্ত অতিরঞ্জিত ও ভ্রান্তিপূর্ণ। হোসনাবাদ পরগণার বহু প্রাচীন সনদপত্রে হাজি হোচনের নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ১১৩৩ বাং সনের পূর্ব হইতেই তিনি উক্ত পরগণার ওয়াদ্দার ছিলেন এবং তাহার সম্পূর্ণ নাম 'আকবতপনা হাজি মাহাম্মদ হোচন ওয়াদ্দাদার'। ১১৫৪ বাং ৯ মাঘের এক সনদে তিনি 'মতুফী' (মৃত) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সুতরাং ১৭৫৮ খৃঃ পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। উভয় হাজি হোসন অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।"
—চুন্টা প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৪৫

রাজমালার আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, ইন্দ্রমাণিক্যের এবং জয়মাণিক্যের মৃত্যুর পর বিজয়মাণিক্য রাজা হন। বিজয়মাণিক্য কর্তৃক প্রদত্ত ১১৫৫ ত্রিপুরাব্দ অর্থাৎ ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দের সনদ পাওয়া গিয়াছে।[২২] রাজধরের বিবৃতির মধ্যে বিজয়মাণিক্যের রাজ্যকালের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু বিজয়মাণিক্য প্রদত্ত তিনখানি তারিখযুক্ত সনদ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকালে সম্পূর্ণ ত্রিপুরা না হইলেও দক্ষিণ অঞ্চল সমসেরের অধিকারে ছিল। ইহার পর বৎসর ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে সম্ভবতঃ সমসের ত্রিপুরা অধিকার করে। কৃষ্ণমণি ইন্দ্রমাণিক্যের পরামর্শমত তিন বৎসর আত্মগোপন করিয়া ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টা করেন কিন্তু সমসের রজ্জাক, রণমর্দননারায়ণ প্রমুখ সেনাপতির সহাযতায় উদয়পুরে কৃষ্ণমণিকে পরাস্ত করিলে তিনি পুনরায় হিড়িম্বায প্রত্যাবর্তন করেন।

সমসের প্রথম তিন বৎসর বনমালী ঠাকুরকে লক্ষ্মণমাণিক্য উপাধি দিয়া তাঁহার নামে স্বযং রাজ্যশাসন করে। লক্ষ্মণমাণিক্য এই সময় গাজী কর্তৃক বংশনির্মিত সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। লক্ষ্মণমাণিক্যের রাজ্যত্যাগের পর দীর্ঘ সাত বৎসর সমসের স্বীয় নামে রাজ্যশাসন করে। সেখ মনুহর তাহার রাজ্যশাসন এবং কীর্তিকলাপের বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। ত্রিপুরার রাজমালা, কৃষ্ণমালা, চম্পকবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থ ব্যতীত কোন প্রামাণ্য ইতিহাসে কিন্তু তাহার রাজত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমসেরের আধিপত্য লাভের অনুকূল ছিল। মুর্শিদাবাদের নবাব 'মহাবৎ জঙ্গ' তখন বর্গীর হাঙ্গামায় ব্যতিব্যস্ত, প্রান্তিক শাসনকার্যে হস্তক্ষেপের পরিবর্তে 'হুজুরে' রাজস্বের প্রাচুর্য ছিল তখন একান্ত কাম্য। সমসের এই টাকার দুর্ভিক্ষ কালে প্রচুর অর্থ রাজস্ব হিসাবে প্রদান করিয়া স্বীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। কবি মনুহর লিখিয়াছেন, সমসেরের আমলে রাজস্ব প্রাচুর্যের এই সম্ভাবনা জানাইয়া উজীর নবাবের নিকট সমসেরকে রোশনাবাদের 'ছুফেদারি' (সুবেদারী) প্রদানের সুপারিশ জানান।

সমসেরের আধিপত্য লাভের কারণ

উজিরে কহিল তত্ত্ব নৃপতি হুযুর।
ভাটি দেশে হইছে সামসের বাহাদুর॥

২২ রাজমালা—কৈলাসচন্দ্র সিংহ পৃ ১১৮, চণ্ডীপ্রকাশ আশ্বিন ১৩৪৫

রোসনাবাদ ছুফেন্দারি দেওত তাহানে।
ইর্শাল পাইবে ভাল মুল্লুক আমানে॥

কবির উল্লিখিত ১,৩৬০০০, টাকা না হইলেও সমসেরের রাজত্বকালে রোশনাবাদের রাজস্ব যে অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে।[২৩]

লুণ্ঠনের জন্য সমসের দক্ষিণ দেশে ডাকাইত নামেই পরিচিত ছিল। চট্টগ্রামের জমিদারগণও সমসেরের লুণ্ঠনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কবি মনুহর চট্টগ্রামের মিরাহা চৌধুরীর ধনসম্পত্তি লুণ্ঠনের বর্ণনায় সমসেরের এই লুণ্ঠনের ফলেই চৌধুরীর কৃপণ স্বভাব দূর হয় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। এইরূপ লুণ্ঠনের ফলে ডাকাইত বলিয়া অভিহিত হইলেও রাজা হইবার পর সমসের স্বীয় রাজকীয় মহত্বের পরিচয়স্বরূপ বহু লাখেরাজ ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিল। গাজীনামা হইতে আরো জানা যায় কৃষ্ণমাণিক্য এই সকল নিষ্করভোগীদের ধরিয়া আনিয়া কাহার আদেশে তাহারা নিষ্কর ভোগ করিতেছে জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে তাঁহারা সমসেরের ন্যায় সামান্য ব্যক্তিও যে-নিষ্কর দান করিয়াছে মহারাজ তাহা অস্বীকার করিতেছেন বলিয়া অনুযোগ করে। কৃষ্ণমাণিক্য ইহাতে লজ্জা পাইয়া সমসের প্রদত্ত নিষ্কর দেবোত্তর দান বহাল রাখেন।

সমসের কর্তৃক নিষ্কর দান

তবে গাজী যে সবারে দিল লাখেরাজ।
পাকড়ি আনিল রাজা লইতে খেরাজ॥
সকলে মিনতি করে মহারাজ আগে।
মহারাজ দোহাই দিয়া ক্ষমাবর মাগে॥
তছুদ্দক খাই মোরা ফকির খোদার।
ভট্ট ব্রাহ্মণ মোরা পেসা নাই আর॥
মহারাজ বলে তোরে কে দিল নিষ্কর।
বলে, দিছে হেন রজক সমসর॥
এক পুরিয়া জমিদার দিল আমরারে।
পোস্তাপোস্থি হুই তুমি চাহ ভাঙ্গিবারে॥
এতেক শুনিয়া রাজা হৈল সলজ্জিত।
পাত্রগণ বুঝাইল রাজার বিদিত॥

---

২৩ Chittagong Records : vol I p 11.

রায়ত হইয়া কর্ত্তা দিয়াছে নিষ্কর।
আপনি লইলে কর লজ্জা বহুতর॥
তবে মহারাজ বহাল করিল সবারে।
খয়রাত নিষ্কর দিলা আর দেবোত্তরে॥

বর্ণনা হইতেই বুঝা যায় যে এই সময় সমসের সমগ্র ত্রিপুরার পরিবর্ত্তে কিয়দংশের অধিকারী ছিল।[২৪] আগা বাখরের সহিত বিরোধের ফলেই সমসেরের পতন অনিবার্য হইয়া উঠে। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নবাব মহাম্মদ বাকর 'আগা বাখর' নামে পরিচিত ছিলেন। কবি মনুহরের বর্ণনানুযায়ী আগাবাখরের চক্রান্তেই রঙ্গপুর ঘোড়াঘাটে তোপমুখে গাজী নিহত হয় কিন্তু ইহা যথার্থ ঘটনা নহে। কৃষ্ণমালা হইতে জানা যায় যে, নবাব জাফরালির অধিকারকালে ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে সমসের তোপমুখে নিহত হয় এবং আগাবাখর নহে, বাখরের পুত্রই সেই সঙ্গে নিহত হয়। গাজীনামা অনুসারে ইংরেজসৈন্যের সহায়তায় সমসের পরাজিত এবং কৃষ্ণমণি রোশনাবাদের অধিকারী হন এবং উদয়পুর ত্যাগ করিয়া কুমিল্লায় গমন করিয়া রাজা রত্নমাণিক্যের অর্দ্ধসমাপ্ত "সতররত্ন" দেবমন্দিরের নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ করেন।

বাজারে বহাল করি দখল দেলাই।
তক্তের উপরে তানে দিলেন চড়াই।
কৃষ্ণচন্দ্র মাণিক্য হইল মহারাজ।
কৃষ্ণকে করিল বন্দোবস্ত রোসনাবাদ॥
সে অবধি কুমিল্লাতে হইল কাছারী।
সহর বানায় তবে ইংরেজ পোসারি॥
আগরতলায় কৈল স্থান স্ত্রীপুত্রের।
উদয়পুর সে অবধি ছাড়িলেক॥
রাজসব মহারাজে আনিল শতে শতে।
সতর রত্ন উঠাইল কুমিল্লাতে॥

গাজীনামার রচনাগুণ

সেখ মনুহরের বর্ণনা একেবারে কবিত্ববর্জিত নহে। ত্রিপুররাজগণের পরাজয়ের পর সমসের 'জগন্নাথ-সোনাপুর' গ্রামটিকে গড়বন্দী করিয়া এক বিশাল পুরী নির্মাণ করেন। চতুঃসীমা বেষ্টিত এই গ্রামটির বর্ণনা বেশ সুন্দর।

দক্ষিণেতে ফেনি নদ্দি, পূর্ব্বে গিরি
মুড়াবন্দি, উত্তরেত এহেন জলদি॥

২৪ রাজমালা—কৈলাসচন্দ্র সিংহ পৃ ১২৭

পশ্চিমে মলয়াপাণি তার মধ্যে ভদ্রাখানি,

মধ্যে যেন থিরুদের দধি ॥

পল্লীকবির কবিত্বপূর্ণ বর্ণনার আর একটি নিদর্শন একাবলি ছন্দে সমসের নির্মিত 'মুতিঘরের' (মুক্তাগারের) বর্ণনা—

এক তোলা ঘর সোভা। মুনীগণ মোনলোভা ॥

জেহেন অমরাপুরি। সভানের মোনহারি ॥

দেখীতে নিয়া ছন্দা। জেন সত চন্দ্র বান্দা ॥

ঝলকে তারকাগণ। চারি পাসে অভরণ ॥

সেই সে ঘরের ঝরা। গুতিত মুতির ছরা ॥

জেহেন চামর দোলে সুবর্ণ সুতির জলে ॥

বিন্দু বিন্দু বারি মোহে। গ্রীষ্ম উষ্ম নাহি রহে ॥

···আনন্দ সানন্দ মন। জেন শ্রীবৃন্দাবন ॥

রাধিকার কোরে কানু। জেন বৈসে জোগভানু ॥

সমসেরের কতিপয় প্রামাণিক দলিলপত্র হইতে জানা গিয়াছে যে সমসেরের দরবারে প্রচলিত নাম ছিল—"শ্রীশ্রীযুত মাহাম্মদ সমসের চৌধুরী জমিদার"।[২৫]

কীর্তিচন্দ্রের গাথা

বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র সম্বন্ধে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের ঘটনাশ্রিত একটি ছোট পল্লীগাথার আধুনিক রূপায়ণের মধ্যে রাজা কীর্তিচন্দ্রের দানশীলতা, পরাক্রম এবং মৃত্যুকাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৬] ১৭০২ খৃষ্টীয় শতকে জগৎরামের মৃত্যু হইলে রাজবংশের নিয়ম অনুসারে জ্যেষ্ঠ কীর্তিচন্দ্র বিষয়াধিকারী হন। কীর্তিচন্দ্র তাঁহার জমিদারীর এলাকা বিস্তৃত করেন এবং এই সূত্রে ঘাটালের নিকটে চন্দ্রকোণার রাজার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়।[২৭] আলোচ্য গাথাটিতে কীর্তিচন্দ্রের চন্দ্রকোণা অভিযানেরও উল্লেখ আছে,—

জমিদারেরা ছিল দেশে বড়ই অত্যাচারী।
তোমার নামে কাঁপত তারা সদাই থরথরি ॥
বর্গী ভয় হতে রাজা আমাদের রাখলে যতনেতে।
তোমার সমান দয়াল রাজা না দেখি ধরাতে ॥
ক্ষত্রিকুলে জনম তোমার তরয়ালের ধনী।
চন্দ্রকোণা জয় করিতে সাজিলেন আপনি ॥

রাজার মৃত্যুতে রাজ্যব্যাপী এক শোক বর্ণনায় ছড়াটি শেষ হইয়াছে।

২৫ চণ্টাপ্রকাশ, আশ্বিন ১৩৪৬

২৬ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত এবং 'কথাপ্রসঙ্গ-এ সঙ্কলিত।

২৭ বংশপরিচয়—জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সঙ্কলিত পৃ ১৮

দিনাজপুরের রাজার কবিতা

কবি দ্বিজ জগন্নাথের ভণিতায় দিনাজপুরের রাজা রাধানাথ (জমিদারী প্রাপ্তিকাল ১৭৯২ খৃঃ) সম্বন্ধে একটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে।[২৮] ইহার কোন রচনাকাল নাই। বর্ণনা হইতে অনুমিত হয় যে ঘটনার কিছুকাল পরে ইহা রচিত হইয়াছিল। কবিতাটি বিশেষ দীর্ঘ না হইলেও ইহার কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। দিনাজপুরের রাজা বৈদ্যনাথ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। তাঁহার বিধবা পত্নী রাণী সরস্বতী জ্ঞাতিপুত্র রাধানাথকে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ৭৩০টি স্বর্ণ মুদ্রা উপঢৌকন প্রদান করিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকট হইতে রাধানাথের নামে উত্তরাধিকার সনদ লাভ করিয়াছিলেন।[২৯] রাজা রাধানাথের নাবালক অবস্থায় কিন্তু জমিদারীর উপর রাণীর কোন কর্তৃত্ব ছিল না—এমন কি রাধানাথের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারেও রাণী কোন উপদেশ দিতে পারিতেন না। প্রথম অবস্থায় মুর্শিদাবাদের দিলওয়ারপুরের রাজা দেবী সিং জমিদারীর তদারগ করিতেন, পরে রাণীর ভ্রাতা জানকীরাম এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁহার পরিচালনকালে ইংরেজ সরকারের নিকট দেয় রাজস্ব বাকী থাকায় ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বোর্ড অফ রেভিনিউ কর্তৃক সেই বংশেরই রামকান্ত রায় জমিদারীর ম্যানেজার নিযুক্ত হন। রামকান্ত জমিদারী পরিচালনার কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিলেও তরুণ রাজার উপর তাঁহার কোন প্রভাব ছিল না। রাণী সরস্বতী তাঁহার ভ্রাতা জানকীরামের প্রতি ইংরেজদের আচরণে উত্তেজিত হইয়া তাঁহাদের সহিত সংশ্রব ছিন্ন করিতে সচেষ্ট ছিলেন।

রাধানাথ ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জমিদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে জানকীরামকে তাঁহার পরামর্শদাতারূপে নিযুক্ত করেন। রাজার অনবধানতায় এবং ক্ষমতালিপ্সু দুই দেওয়ানের ষড়যন্ত্রের ফলে জমিদারী কিভাবে নীলাম হয় দ্বিজ জগন্নাথ এই কবিতাটিতে তাহা সুকৌশলে ব্যক্ত করিয়াছেন। রাজ্যের দুরবস্থার অন্যতম কারণস্বরূপ কবি রাজার রাজ্যশাসনে অমনোযোগিতার উল্লেখ করিয়াও এ সবই বিধিলিপি বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন,—

রাজ্যনাশের কারণ

বিধি নিয়োজিত কর্ম্ম বুঝা নাহি যায়।
নৃপতির মতি হৈল অক্ষটীর প্রায়॥

---

২৮ হরগোপাল দাস কুণ্ডু কর্তৃক সংগৃহীত—র-সা-প-প ১৩৫৫ সালে প্রকাশিত।

২৯ The Eastern Bengal District Gazeteer—Dinajpur.

রাজ্য যেন কার্য্য নাহি উচাটন মন।
মির শিকারী সঙ্গে করি ফিরে বনে বন॥

বিধাতার ইচ্ছা না হইলে রাজা কি ব্যাধের ন্যায় আচরণ করিতে পারেন —কবির মনে এই কথার উদয় হইলেও একমাত্র রাজার দোষেই যে রাজ্য নষ্ট হয় নাই, রাজ্যনাশের পিছনে যে আরও গুরুতর কারণ ছিল কবি তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন।

এক ভূমেতে দেওান দুই নাহিক বন্দেজ।
কার কথা কেউ না রাখে কেবল দন্দেজ॥
কার কথা কেউ না রাখে পরস্পর দ্বেষ।
তাথে হৈল রাজ্য নষ্ট কাথে দিব দোষ॥

কবির বিবরণ অনুযায়ী এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেওয়ান হইতেছেন লালা মাণিকচান্দ এবং রামকান্ত রায়। আমরা কিন্তু দিনাজপুরের বিবরণের মধ্যে মাণিকচাঁদের পরিবর্তে প্রাক্তন দেওযান জানকীরামের নাম পাইতেছি। ইনি রাণীমাতার সহোদর ছিলেন এবং ইহার বিতাড়ন (বোর্ড অফ রেভিনিউ কর্তৃক) এবং রামকান্তের নিয়োগের পর হইতেই অসন্তোষ দেখা দেয়।

রাণী সরস্বতীর মন্ত্রণানুযায়ী দেওয়ান জানকীরাম রাজা রাধাকান্তের বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন অপরদিকে রামকান্ত রায় ইংরেজ কোম্পানী কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাজপুরুষদের কর্মদোষে কিভাবে দিনাজপুর রাজ্য দেনার দাযে নিলাম হইযাছিল কবি দক্ষতার সহিত এক পৌরাণিক রূপকের অবতারণা করিয়া তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রজার পাপে পিঁড়ে রাজা আর নষ্ট রাজ্য।
যাগযজ্ঞ করিতে হয় বেদ বিহিত কার্য্য॥
অশ্বমেধ রাজসূয় রাজপ্রিয় আদি।
তিন যুগে রাজাগণ কৈল নানাবিধি॥
শুন ধর্ম্ম সে সব কর্ম্ম লোকে নাহি করে। বর্ণন কৌশল
যুগ কলিতে হৈল জন্ম রাজ্য দিনাজপুরে॥
নিদ্ধূম যজ্ঞের ক্রম দেবতা বহির্ভূত।
বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি যেন কৈলা আর মত॥
ব্রহ্মা লালা মাণিকচান্দ জ্বালেন আনল।
হোতা আচার্য হৈল বল্লভযুগল॥

দেওান রায় রামকান্ত অধিষ্ঠিত হয়া।
নিদ্ধূম যজ্ঞের ক্রম দেন বাড়াইয়া॥
পলাতক হৈল মন্ত্র ত্রেত রকম ফের।
বিলাত বাকী আহুস্থলী হইল যজ্ঞের॥
চরু তাথে তহবিল তলব বই নিস্ফল।
উদখোল ছাজি নান্দা আইল মুশল॥

*　　*　　*　　*

সর্ব্ব যজ্ঞের অঙ্গ প্রমাণ ভোজন।
তাহার এআজে মির শিকারী ভোজন॥

এইভাবে লালা মাণিকচাঁদ (জানকীরাম ?) তাঁহার সহচর কৃষ্ণবল্লভ, রামবল্লভের ষড়যন্ত্রে এবং রাজার উদাসিন্যের ফলে সকলেই সুযোগমত চুরী করিতে থাকে।

বহাল রাইত ফিবর করে বিনামেত পাট্টা।
ঘরে থাকি না দেয় কড়ি আমলা সহে সাট্টা॥
ভর্ত্তা জমা খাস্ত করে লিখে রকম ফের
পাট্টা লইয়া বেটা প্রজা দরবারেএ সের॥
বিনে পাট্টায় জমি কেহ করে জবর করি।
তজবিজেতে সাদের হইলে ধরিতে না পারি॥
বিনাম পাটা ফের করিয়া ভর্ত্তা সামেল করে।
অনায়াসে খায় জমি কেহ ধরিতে না পারে॥

প্রজারা নানা অসুবিধা এবং দুর্ভোগ সহ্য করিয়া খাজনা প্রদানে স্বভাবতঃই অস্বীকৃত হয়। কবি কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন—

যত্ন কৈলে রত্ন দেয় প্রজা কামধেনু।
সাব বিনা না হয়ে চন্দন মলায়তবেণু॥

তাই প্রজার দুঃখ রাজা না দেখায়,—

ভোমে গেল ভোমের কড়ি তদারক বিনে
খরচে ঋণের বৃদ্ধি হৈল দিনে দিনে।

রাজা সেদিকে দৃকপাত না করিয়া খাজনার টাকা হইতে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। মির শিকারীর ভাগ্যে সোনার বালা, হীরা মুক্তাদি নবরত্ন মিলিল। রাজার এই যথেচ্ছদানে প্রজারা বলাবলি করিতে লাগিল যে···

যোগীর যোগ রাজার রাজ্যপাট।
উল্টা হইল সেহি কর্ম মহাল হইল লাট।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের মোট বাকী রাজস্ব ৭৭,০০০৲ টাকা হইলে বোর্ড অফ রেভিনিউ কর্তৃক জমিদারীর কিয়দংশ নীলাম হয় এবং পরে ক্রমশঃই অন্যান্য অংশ নীলাম হইতে থাকে। কবিতাটির মধ্যে দ্বিজ জগন্নাথ লিখিয়াছেন যে, রাজার লাট নীলাম হইলে লাট ক্রয় করিবার জন্য রাজার দাসদাসীরাও উপস্থিত হয়।

লাটবন্দি মহাল সব হৈল থরে থরে।
লাটে পেল ইস্তাহার মালগুজারির তরে ॥

*　　*　　*

মহাজন মোসাহেব রাজা জমাদার।
মণ্ডল রাইওত আর সিপাহী সন্ন্যাসী ॥
লাট কিনিতে আসে রাজার দাসদাসী ॥

*　　*　　*

হাড়ি শুড়ি করে যুক্তি লাট লইতে যায়।
যে পাইল সেই লইল যার কপালে ছিল।
কেহবা লইয়া লাট বাজারে বিকাইল ॥

কবির এই লাট বিক্রীর বর্ণনার মধ্যে অত্যুক্তি থাকিতে পারে কিন্তু রাজ্যের ধনসম্পদ কিভাবে হস্তান্তরিত হইয়াছিল ইহার মধ্যে তাহার ইঙ্গিত আছে। রামকান্ত রায় বেনামীতে রাজার বহু ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন এবং রাজা-মাতা সরস্বতীদেবী এবং পত্নী ত্রিপুরাসুন্দরীও লাট ক্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

"The Raja struggled to save his estates by raising money on mortages (one of his principal creditors being Ramkanta Ray) and buying back parts of his estate under assumed names. His own wife Rani Tripura Sundari and the old Rani Saraswati also purchased land to a considerable extent".[৩০]

কান্তনামা বা রাজধর্ম

দেওয়ান মাহুর্ষা মণ্ডল রচিত কান্তনামা বা রাজধর্ম নামক জীবনী-কাব্যটি নলিনীকান্ত ভট্টশালী কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ঢাকা সাহিত্য পরিষদ হইতে আনুমানিক ১৩২০-২১ সালে প্রকাশিত হয়। এই জীবনীকাব্যে কবি কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবুর

৩০ The Eastern Bengal District Gazeteer—Dinajpur.

বংশপরিচয় এবং বিশেষভাবে মহারাজ হরিনাথ ও কৃষ্ণনাথের কীর্তি ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু কাব্যটি শুধু এই কারণেই উল্লেখনীয় নহে। স্বপ্নাদেশে আশ্রয়দাতা রাজা এবং রাজপরিবারের কীর্তি ঘোষণা প্রাচীন কবিদের কাব্যরচনার সপক্ষে প্রধান যুক্তি ছিল—মামুদ্ বা মণ্ডল তাঁহার পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেও তাঁহার কাব্যে শুধুমাত্র কাশিমবাজারের রাজাদের বংশাবলী পাওয়া যায় না। মহারাজ কৃষ্ণনাথের (প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামী) সমসাময়িক হিসাবে তিনি বহু স্থানীয় সংবাদ এবং জ্ঞাত ঘটনাবলীর সমাবেশ করিয়াছেন তাঁহার কান্তনামা বা রাজধর্মে, উপরন্তু কান্তবাবুর বংশের গুণকীর্তন উপলক্ষে রাজধর্মের ব্যাখ্যানই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

কাব্যরচনার উদ্দেশ্য

গ্রন্থের সূচনায় কবি কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথের প্রশস্তি সহকারে লিখিয়াছেন যে তিনি এই মহারাজ কৃষ্ণনাথের 'পিতা-উর্দ্ধারণ' রূপ কীর্তিগাথা রচনা করিবার জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হন। উদ্দেশ্য এই যে, কৃষ্ণনাথ রাজধর্ম যথাযথভাবে পালন করিয়া পিতৃকৃত-অন্যায় ক্ষালনান্তে পিতার বৈকুণ্ঠের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন।

> ষুনিতে পাইলে রাজা করে পিত্রি কাজ।
> তবে পিতা রৈক্ষা পাএ বৈকুণ্ঠের মাজ॥

কিন্তু স্বপ্নাদেশ শুনিয়া কবির স্বতঃই মনে হয়—

> আরত রাজায় ক্রিত্তি লেখিতে লাগে ভএ।
> না জানি বাসিবে মন্দ রাজা মহাসএ॥
> আমিত পরজা বটে সেহি রাজেশ্বর।
> না জানি বাসিবে মন্দ হইয়া পামর॥

এই সময় পুনরায় কবির উদ্দেশে আকাশবাণী ধ্বনিত হয়—

> আপনাব ক্রিত্তি ষুনি তোমাক মন্দ কএ।
> তাহার বিচার আমি করিব তথাএ॥

কিন্তু ইহা শুনিয়াও কবি যে একেবারে নিঃশঙ্ক হইতে পারেন নাই তাহা কবির বারংবার একই কথার পুনরুক্তি হইতে বুঝা যায়।

> লিখিএ রাজার ক্রিত্তি দেখিয়া সপন॥
> প্রাণ তরসিয়া লিখি বরো লাগে ডর।
> মাচারকে মন্দ বোল জানিবে ইশ্বর॥

প্রজার প্রতি সদাচারের ফলে নল, হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি রাজাগণ কিরূপে অক্ষয় স্বর্গলাভ করেন এবং 'শ্রিরিচন্দ্র' নামক জনৈক মহাপ্রতাপশালী রাজা কুমতির বশবর্তী হইয়া পুত্রের অন্নপ্রাশন, বিবাহ এবং পিতার মৃত্যুতে প্রজার নিকট হইতে তিনগুণ 'বাবত' অর্থাৎ জোর করিয়া কর আদায় করার কিভাবে জন্য নরকভোগ করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিয়া কবি লিখিয়াছেন—

ধর্ম্ম রাজা হৈলে সে বাবত লৈবে কেনে।
প্রজাআদি পালিত (বে) ক পুত্রের সমানে॥

কবির মতে ইহাই রাজধর্ম। কান্তবাবু এবং তাঁহার পুত্র লোকনাথ যথারীতি এই রাজধর্ম পালন করিয়া পরলোকগমন করেন। লোকনাথের পর তাঁহার নাবালক পুত্র হরিনাথের সময় কর্মচারীবর্গ বাবত লইয়া প্রজাদের কষ্ট দেয়। পরে হরিনাথ রাজা হইলেও প্রজাদের উপর ইজারাদারের অত্যাচার কিছুমাত্র না কমিয়া বরং আরো বৃদ্ধি পায়। রাজা হরিনাথের নিকট নালিশ করিয়াও কোন ফল হয় না, পরন্তু রাজসদনে যাইয়াও অনাহার এবং লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া প্রজারা ফিরিয়া আসে।

রাজধর্ম

কুনমতে জাইতে তাথে না দিল দরানি।
ফিরিয়া যাইছে প্রজা চক্ষে মোছে পানি॥

এই রাজধর্মচ্যুতির ফলে হরিনাথের মৃত্যু হইল। কবির বর্ণনানুযায়ী পূর্বকৃত সুকর্মের ফলে তিনি বৈকুণ্ঠে গমন করিলেও অত্যাচারিত প্রজাবর্গ প্রতিকারের আশায় তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া উপবাসজনিত ক্ষুধায় যেরূপ জ্বালা সহ্য করিয়াছিল, হরিনাথ বৈকুণ্ঠে গিয়াও শরীরে তদনুরূপ জ্বালা অনুভব করিতে থাকেন। স্বয়ং ভগবান একদিন দয়াবশে তাঁহাকে জানাইলেন যে, কেহ যদি তাঁহার কীর্তিগাথা রচনা করিয়া জগতে প্রচার করে এবং এই গাত্রজ্বালার কথা মহারাজ কৃষ্ণনাথকে জানায় তবে তাহা শুনিয়া কৃষ্ণনাথ দানধ্যান এবং রাজধর্ম যথাযথভাবে পালন করিলে তাঁহার গাত্রদাহ নিবারিত হইবে। সেই অনুযায়ী কবি স্বপ্নাদেশ লাভ করেন।

কবির আত্মকাহিনী

গ্রন্থমধ্যে একাধিকবার কবি তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা এবং আত্মীয় পরিজন বিয়োগে মানসিক দুরবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক বৃদ্ধ কবির এই আত্মকাহিনী অতি করুণ।

সপ্তপুত্র ছএ ভাই সকল বিধির ঠাঞি
ভ্রাতাপুত্র গেল তিনজন।
ভ্রাতাবধু ঘরের লোক পাইয়া পুত্রের সোগ
একে একে মৈল কুরিজন॥

জেষ্ট ভ্রাতার ছুটি পুত্র আমার একটি পুত্র
বধ্য কৈল আগে নৈরাকার।
আমার হৈল পাছা বেলা তাহাতে এসব জ্বালা
প্রাণে আমার নাহি সহে আর॥

এই উক্তি হইতে অনুমিত হয় যে একেবারে বৃদ্ধাবস্থায় কবি কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন সুতরাং তিনি শুধু কৃষ্ণনাথেরই নহে, হরিনাথেরও সমসাময়িক ছিলেন। হরিনাথের রাজত্বকালে এবং তাঁহার মৃত্যুর পরেও ইজারাদারের অত্যাচারের যে বর্ণনা কান্তনামার মধ্যে পাওয়া যায় তাহা অনায়াসেই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কবি অবশ্যই রাজরোষের ভয়ে অনেকস্থলে এই কথা লিখিয়াছেন যে,

আমি কিবা জানি ভাই গুরুর মুখে শুনি।
রচিল মানুর্দ্ধা দেওান মহারাজার বাণী॥

সত্য বিবরণ

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহাকে ঠিক মানুর্দ্ধা মণ্ডলের 'সপনের বাণী' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইহার মধ্যেই সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা, কান্তবাবুর সময়ে প্রজা-বিদ্রোহ, কান্তবাবুর হেষ্টিংসের সহায়তায় অবৈধভাবে নূতন পরগণা লাভ,[৩১] তাঁহার প্রপৌত্র হরিনাথ এবং তৎপুত্র কৃষ্ণনাথের সময়ে প্রজার প্রতি ইজারাদারের পীড়নের এক একটি চিত্র সমুজ্জ্বল হইয়া আছে।

কৌশলে সমসমায়িক ঘটনাবলীর এইরূপ চিত্রন কবির অভিলষিত হইলে তিনি সফলকাম হইয়াছেন বলিতে হইবে। গ্রন্থের ভূমিকায় একস্থানে নলিনীকান্ত ভট্টশালী লিখিয়াছেন—'গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় অনেক কাটাকুটী দেখা যায় এবং তাহার মধ্যে ১২৫০ এই সনটি লিখিত দেখা যায়। ১২৫২ সনে মহারাজ কৃষ্ণনাথ পরলোকগমন করেন, কাজেই এই ১২৫০ সনটিই পুস্তকরচনার বংসর, সেই বিষয়ে একরূপ নিশ্চিৎ হওয়া যায়। অপর দিকে কবির রচনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, কান্তবাবু ১১৭২ সালে

৩১ ওয়ারেন হেষ্টিংস রাণীভবানীর নিকট হইতে বলপূর্বক বাহারবন্দ লইয়া প্রথমে ১১৮১ সাল, ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে কান্তবাবুর পুত্র লোকনাথকে ইজারা দেন। লোকনাথকে যখন প্রথম ইজারা দেওয়া হয় তৎকালে তাহার বয়স মাত্র একাদশ। 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'র ৪৩২ পৃ দ্রষ্টব্য।

রাজা হন।[৩২] 'রাজা হৈল কান্তবাবু সন বাহার্ত্তরে॥' 'এগারো সত বাহার্ত্তরে হৈল জমিদার'॥ কান্তবাবুর জমিদারী প্রাপ্তির তারিখ ১১৭২ সন এবং মহারাজ কৃষ্ণনাথের মৃত্যু তারিখ ১২৫২ সালের মধ্যবর্তী কাল হইতেছে আশি বৎসর। এই আশি বৎসরে কান্তবাবু লোকনাথ, হরিনাথ এবং কৃষ্ণনাথ রাজত্ব করিয়াছেন 'সুতরাং একেবারে কান্তবাবুর সমসাময়িক না হইলেও বয়োবৃদ্ধ কবির সময়ে কান্তবাবুর কাহিনী বেশ তাজা ছিল বলা যায়। কান্তনামায় কান্তবাবুর রাজত্বলাভ এবং প্রজাপালনের বর্ণনা খুব বিস্তারিত না হইলেও এই স্বল্প পরিসরের মধ্যেই কবি কান্তবাবুর চারিত্রিক গুণাবলীর উল্লেখে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। বাহিরবন্দের প্রজারা বিদ্রোহী হইলে রাজা সসৈন্যে তাহাদের দমন করিতে গেলে বিদ্রোহী প্রজারা ভয়ে পলায়ন করে এবং রাজা তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিবার জন্য পত্র দেন। ইহাতে প্রজারা কিন্তু 'দুরে থাকি জবাব লিখে না মানি তোমারে॥' শুধু তাহাই নহে, রাজাকে তাহারা স্পষ্ট ভাষায় এক রকম শাসাইযাও দেয়—

> না দিব খাজনা আর না মানি তোমাব।
> ভালাই চাহ ফির্যা জাহ ঘরে আপোনার॥
> অতিবাদ করো জদি বুঝিবেন সেসে।
> প্রাণ লৈঞা পলাইয়া জাইতে নারে দেশে॥

রাজার বিরুদ্ধে প্রজাব এইরূপ সদম্ভ উক্তির মধ্যে প্রজাদের অসন্তোষের ইঙ্গিত আছে।[৩৩] কবির বিবরণ অনুসারে কান্তবাবু প্রজার এইরূপ অপমানজনক পত্রেও ক্রুদ্ধ না হইয়া তাহাদের শুভবুদ্ধি উদয়ের অপেক্ষা করেন এবং বারংবার একইরূপ ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবাব পাইয়া দুঃখিত এবং শেষে ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্রোহদলনে প্রস্তুত হন। এই সামান্য ঘটনার উল্লেখ করিয়া কবি কান্তবাবুর চারিত্রিক ঔদার্য প্রতিপন্নের চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্যই কবির এই বর্ণনায় কান্তবাবুর দোষ বাদ দিয়া কেবল গুণাবলীই উল্লিখিত হইয়াছে। স্বার্থ রক্ষার জন্য কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ এবং প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য দ্বিধাহীন নিষ্ঠুর আচরণ এবং ধনসম্পদ বৃদ্ধির লোভে পরসম্পত্তি অধিকারে তিনি পশ্চাদপদ ছিলেন না।[৩৪] বাহিরবন্দ পরগণার

কান্ত-চরিত্র

৩৩ মুর্শিদাবাদ কাহিনী—পৃ ৪৩৪

৩৪ ঐ প ৪৩৪-৪৩৭

প্রজাগণ প্রায় সকলেই যে ধনী ছিল তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যায়।

এখোক রাইঅতের জমা দুই চারি হাজার।
কুঞ্জর আছেন বান্ধা ফিলখানার মাঝার॥

কবির বিবরণ হইতে জানা যায় যে, নাবালক পুত্র রাখিয়া লোকনাথ ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।[৩৫] সুযোগ বুঝিয়া রাজকর্মচারিগণ সেই সময়ে কিভাবে প্রজার অর্থ আত্মসাৎ করিয়া তাহাদের বিপদগ্রস্ত করিয়াছিল দেওয়ান মাহুর্যা মণ্ডল তাহার এক বর্ণনা দিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে নাবালক রাজার অস্থিরমতিত্বের জন্যও প্রজাদের যে দুঃখভোগ করিতে হইয়াছিল প্রকারান্তরে তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন।

নাবালক রাজা হৈলে কিছু নাহি জানে।
দয়ামায়া কিছু নাহি বুঝে প্রজাস্থানে॥
পিতা রাজা পালন করে নান্হান জতানে।
পরে মারে অবিচারে দয়া নাহি জানে॥

হরিনাথের নাবালক অবস্থায় জমিদারীর রক্ষণাবেক্ষণ কার্য কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ (Court of Wards) কর্তৃক পরিচালিত হইতে থাকে। সুযোগ বুঝিয়া সরকারী আমলাগণ কিভাবে সরকারে প্রদত্ত খাজনা নিজেরা প্রজার নিকট হইতে হাওলাতস্বরূপ গ্রহণ করিয়া সরকারের হিসাবে বাকী দেখায় এবং দাখিলা না দিয়া ও মাথাপিছু না হিসাব করিয়া আন্দাজে এক এক এলাকা হইতে ডৌল স্বরূপ খাজনা আদায় করিয়া স্ব স্ব দেশে পরগণা কিনিয়াছিল তাহার এক বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় কান্তনামার মধ্যে।

আমলা হাওলাত করি হৈল বাকীপারা।
রাইঅতের বদনাম করি লইল ইজারা॥
রাজার লোকসান করি প্রজার করে দোস।
ডৌলের বাক্য গণিল্ল করি জমিদার খোশ॥
এহিরূপে রাজধানীতে করিয়া ইজারা।
মলুকে জাইয়া কৈল পরগণা ইজারা॥

---

৩৫ সন ১২১১ সালে (ইং ১৮০৪) মহারাণী সুদারময়ীকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া এক বৎসরের শিশুপুত্র কুমার হরিনাথকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া তিনি পরলোকগমন করেন।” —মহারাজ মনীন্দ্রনাথ পৃ ৫

বন্দবস্তি ডৌল দিলানি নানস্থান বাবত লএ।
ফওত ফেরস্থার কতো হৈল পরগণাএ॥

ইহার পর হরিনাম সাবালক হইয়া রাজা হইলে,—

সাবালক হৈয়া জখন পাটে হৈল রাজা।
পূর্ব্বমতে পালন কৈল জতেক পরজা।
মহাধার্ম্মিক রাজা হৈল কি কহিব তার।
বাবত বলি করাকরি না নিল প্রজার॥

কিন্তু হরিনাথের রাজত্বকালে প্রজারা পুনরায় সুখী হইলেও ইজারাদারের অত্যাচার যে একেবারে বন্ধ হয় নাই বরং সাময়িকভাবে তাহারা আত্ম-গোপন করিয়াছিল তাহা জানা যায় হরিনাথের রাজত্বকালেই অত্যাচারিত প্রজাদের নালিশ হইতে। হরিনাথ প্রজাদের এই অভিযোগে কর্ণপাত করেন নাই—

কুনমতে জাইতে তাথে না দিল দরানি।
ফিরিয়া জাইছে প্রজা চক্ষের মোছে পানি॥

হরিনাথের মৃত্যুর পর (১৮৩২ খৃঃ) ইজারাদারদের অত্যাচার চরম হইয়া উঠে। নাবালক রাজা কৃষ্ণনাথের সময় শ্যামকিশোর রায় নামক ইজারাদারের অত্যাচারের যে বর্ণনা কবি দিয়াছেন তাহা কোম্পানীর আমলের ইজারাদারদের অত্যাচারের অন্যতম নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ইজারাদারের অত্যাচারের বিবরণ

সনসগির রাজা হৈল কেহ নাহি আর।
সাহেব লোক হইল রাজার মুক্তিআর॥
আগিলা ইজারাএ প্রজা হৈযাছে নিসস্ত।
সামকিসর কালেট্যরিত কৈল বন্দবস্ত॥
কালেট্যরিত ডৌল লৈএগা করিল ইজারা।
মুলুকে জাইয়া কৈল পরগণা উজারা॥
মশিদা কাথরপুরি করিয়া আপনে।
দোয়ানি দেখিতে চাহে কহেন অখনে॥
তাহা সুনি ভাবে সব জতো প্রজাগণ।
না জানি লেখিলে দুখ নাম নিরাঞ্জন॥

পর পর তিন বৎসর বৃষ্টি অল্প হওয়ায় ফসল কম উৎপন্ন হইলেও

ইজারাদারের দাবী কিন্তু ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। অবশেষে রাজা কৃষ্ণনাথ সাবালক হইলে ইজারা প্রদান বন্ধ হয় এবং প্রজাদেরও দুর্গতি শেষ হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালের ইজারাদারী অত্যাচারের এই বর্ণনায় ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

রাজা কৃষ্ণনাথকে ঈশ্বরের অবতার রূপে অভিহিত করিয়া কবি তাঁহার কার্যকলাপকেও দৈবী লীলা-খেলা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

নবরূপে নারাএঅণ বুঝিতে সভার মন
গোপ্তে আছে হইয়া রাজন।
নিজ রূপ আছ্যাদনে থাকে রাজা অলক্ষণে
চিহ্নিতে পারে এতো কার প্রাণ॥

রাজার লীলা বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—

বাউরের বেশে ফিরে কেহ না চিম্বিতে পারে
লোকে তাথে বাউরকার কএ।
উত্যমের এহি চিন নাহি তার অত্যাভিন্য
মনে কাথ অদয়া না হএ॥

মৃত্যুর পূর্বে রাজা কৃষ্ণনাথের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। নলিনীকান্ত ভট্টশালী এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—রাজা কৃষ্ণনাথ মৃত্যুর পূর্বে বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া গিয়াছিলেন এই প্রমাণ দিয়াই কৃষ্ণনাথের স্ত্রী স্বর্ণময়ী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া স্বামীর উইল রদ করেন এবং স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করেন। কান্তনামার কবি কৃষ্ণনাথের উন্মত্ততাকে কৃত্রিম বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কবি রাজার অপ্রকৃতিস্থতাকে দৈবী মায়া বলিয়া অভিহিত করিলেও ইহার মূলে কোন সত্য নাই বলিয়া মনে হয়।

কবি ও কাব্য

কবি বর্ণিত কৃষ্ণনাথের রাজসভার বিবরণ তাঁহার বিদ্যানুরাগের পরিচায়ক। সমসাময়িক ধার্মিক-পণ্ডিতজনের এবং রাজকর্মচারী পাত্র-মিত্রেরও উল্লেখ ইহার মধ্যে পাওয়া যায়।[৩৬]

আত্মপরিচয় অংশ হইতে কবির জন্মস্থান এবং পিতার নাম জানিতে

৩৬ কৃষ্ণনাথের রাজকীয় বিধি ব্যবস্থা এবং রাজার মত চালচলন তাঁহার অমাত্য ও বিভিন্ন কর্মচারী পরিবেষ্টিত দরবার ও রাজসেরেস্তার বর্ণনা হইতে অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।—মহারাজ মণীন্দ্রনাথ পৃ ৩৯

পায়া যায়। ধর্ম সম্বন্ধে কবি উদার মতাবলম্বী ছিলেন তাই একই দেবতাকে নানা নামে অভিহিত করিতে কবি কোথাও ইতস্ততঃ করেন নাই। স্বীয় কাব্যের পরিচয় প্রসঙ্গে কবি একাধিকস্থানে কাব্যটিকে 'সারি' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

স্বপ্নাদেশ প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন দীননাথ ভগবান তাঁহাকে স্বপ্নে বলিলেন—

লেখিয়া রাজার সারি সংসারে করহ জারি
প্রচার হউক কিত্তি খানি।

অপর এক স্থানেও— সংসারে তোমার নাম জেন নাম অনুপাম
তুমি লেখ মহারাজার সারি॥

'শাড়ি' বা 'শারি' গান সাধারণতঃ নৌকার দাঁড়ি মাঝি অথবা দিনমজুরেরা হাতের কাজের সহিত তাল রাখিয়া গাহিয়া থাকে। কবি 'শাড়ি' বা 'শারি' শব্দের যথার্থ অর্থ অনুযায়ী ইহা প্রয়োগ না করিয়া সাধারণ গান বা গাথা অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য অন্যান্য প্রাচীন কাব্যের ন্যায় কান্তনামাও সভায় গাহিবার উপযোগী করিয়াই লিখিত হইয়াছিল।

জীবনী কাব্যে কবিত্ব স্ফুরণের সুযোগ এবং অবসর দুইই স্বল্প হইলেও কান্তনামার স্থানে স্থানে কবিত্ব শক্তির যে নিদর্শন মিলে তাহা একেবারে অকিঞ্চিৎকর নহে। হরিনাথের নবজাত পুত্রের রূপ বর্ণনা অথবা রাজসভায় উপবিষ্ট মহারাজা কৃষ্ণনাথের বর্ণনা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে।[৩৭]

প্রতাপচন্দ্র লীলা স সঙ্গীত

অনুপচন্দ্র দত্ত রচিত 'প্রতাপচন্দ্র লীলারস সঙ্গীত' একটি ক্ষুদ্র কাব্য।[৩৮] কাব্যের কাহিনী বর্ধমানের জাল রাজা প্রতাপচাঁদ সম্বন্ধে। কবি জাল প্রতাপচাঁদকে একাধিকস্থলে ঈশ্বরের অবতাররূপে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস যে জনগণের নিকট লীলাপ্রকাশের জন্যই তিনি সকল উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিলেন এবং এই লীলা অলৌকিক বলিয়াই পরিশেষে বিচারের অজুহাতে জাল সাব্যস্ত হইয়াও তাঁহার 'মনোল্লাস' নষ্ট হয় নাই,

---

৩৭ খুব উৎকৃষ্ট না হইলেও প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যাবলির মাপকাঠিতে মাপিলে তাঁহার পুস্তককে কাব্য বলিয়া অসঙ্কোচে নির্দেশ করা যায়। কান্তনামা—ভূমিকা

৩৮ বীরভূমি পত্রিকায় (১৩০৮, ১৩০৯) প্রকাশিত

বরং অন্ত লীলা সম্বরণ করিয়া তিনি নিভৃত সাধনা অবলম্বন করেন। কবি অনুপচন্দ্র দত্ত ছিলেন শ্রীখণ্ডের অধিবাসী এবং জাতিতে আগুরী। প্রতাপচাঁদ শেষ জীবনে অনেককে মন্ত্রদান করিতেন—কবি অনুপও তাঁহার মন্ত্রশিষ্য হইয়াছিলেন। প্রতাপচাঁদের জীবৎকালের মধ্যেই ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৫০ সাল = ১৭৬৫ শকাব্দ = ১৮৪৩ খৃষ্টীয় শতকে তিনি এই কাব্য রচনা করেন।

রচয়িতা ও রচনাকাল

বর্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্রের পুত্রের নাম ছিল প্রতাপচাঁদ। বাল্য-কালেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তেজচন্দ্র পর পর সাতটি বিবাহ করেন। বৃদ্ধাবস্থায় শেষ বিবাহকালে প্রতাপচাঁদই যুবরাজরূপে বিষয় কার্য দেখাশোনা করিতেন। বিমাতা এবং তাঁহার সহোদর পরাণবাবু—যিনি পরে তেজ-চন্দ্রকে কন্যাদান করিয়াছিলেন, উভয়ের ষড়যন্ত্র জাল হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য প্রতাপচাঁদ একবার আটাশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। বৃদ্ধরাজা সংবাদ পাইয়া রাজমহল হইতে তাঁহাকে ধরিয়া আনেন। কিছুকাল পরে তাঁহার এক কঠিন পীড়ার কথা ঘোষণা করা হয়। এই পীড়া নাকি বৃদ্ধি পাইয়া মৃত্যু অবধারিত হইলে প্রতাপচাঁদের ইচ্ছায় তাঁহাকে কালনায় গঙ্গাতীরে স্থানান্তরিত করা হয়। সেইখানে একদিন রাত্রে অন্তর্জলী অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া ঘোষণা করা হয়। রাজা তেজচন্দ্র কিছু-কাল পরে পরাণ বাবুর পুত্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। এই ঘটনা ঘটে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে। প্রায় পনের বৎসর পরে ১৮৩৫ খৃষ্টীয় শতকে এক নবীন সন্ন্যাসী বর্ধমানে আসিলে কেহ কেহ তাঁহাকে ছোট মহারাজ অর্থাৎ প্রতাপচাঁদ বলিয়া চিনিতে পারিলে সেইকথা সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়া যায়। পরাণবাবু এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে বিতাড়নের জন্য লাঠিয়াল পাঠাইলে তিনি কাঞ্চননগরে আশ্রয় লন কিন্তু সে স্থান হইতেও পরাণ বাবুর লাঠিয়াল তাঁহাকে বিতাড়িত করে। জাল প্রতাপচাঁদের কাহিনীর সূত্রপাত এইখানে।

সঞ্জীবচন্দ্র রচিত জাল প্রতাপচাঁদ

এই কাহিনী বর্ধমান রাজার গল্পাকারে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করেন। পরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাহার অংশ বিশেষ পরি-বর্তন এবং পরিবর্জন করিয়া 'জাল প্রতাপচাঁদ' নামে প্রকাশ করা হয়। সঞ্জীবচন্দ্র তাঁহার অপূর্ব বর্ণনভঙ্গীতে এই অভিনব বিচারকাহিনী গল্পাকারে রচনা করিলেও ইহার মধ্যে কল্পনার লেশমাত্র পাওয়া যায় না। জাল রাজার মোকদ্দমার প্রকাশিত কাগজপত্রাদি অবলম্বনেই তিনি এই কাহিনী

লিপিবদ্ধ করেন। পূর্বকথা প্রসঙ্গে তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা হইতেও কাহিনীর সত্যতা সপ্রমাণিত হয়। "আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। পূর্বে গভর্ণমেণ্ট কিরূপ ছিল, আর সে সময়ে আমাদের এই বাঙ্গালীরা কিরূপ ছিলেন তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমরা জাল রাজার কথা আলোচনা করিতে বসিয়াছি। মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে যে সকল কাগজপত্র সেই সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া এই বিষয়টি লিখিলাম।[৩৯] সঞ্জীবচন্দ্র তাঁহার গ্রন্থে জাল রাজা প্রকৃতপক্ষে প্রতাপচাঁদ ছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য না করিলেও প্রতাপচাঁদের প্রতি যে তাঁহার অকৃত্রিম সহানুভূতি ছিল তাহা গ্রন্থশেষে তিনি নিজেও স্বীকার করিযাছেন। সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষায়—তিনি প্রতাপচাঁদ হউন, আর জাল রাজাই হউন, অদ্বিতীয় লোক ছিলেন। তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে ভালবাসি। তিনি হাস্যমুখে সেই কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, এইজন্য আমবা তাহাকে ভক্তি করি।[৪০]

১৮৩৯ খৃষ্টীয় শতকে নিজামতী আদালতের বিচারে প্রতাপচাঁদ জাল বলিয়া ঘোষিত হইবার বহু বৎসর পর সঞ্জীবচন্দ্র যখন জাল রাজার এই বিচিত্র করুণ কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করেন তখন তিনি যে কারণেই হউক প্রতাপচাঁদকে প্রকৃত রাজা বলিযা ঘোষণা করিতে পারেন নাই। তাঁহার পূর্ববর্তী রচয়িতা কবি অনুপ দত্ত জাল প্রতাপচাঁদকে ঈশ্বরের অবতার জ্ঞান করিযা প্রকৃত রাজা এবং নির্দোষ বলিযা স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন।

উভয় রচযিতার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য

যদি কেহ বহুরূপী সে কথা না রবে ছাপি
প্রচার হইবে জগময়।
তাহাতে কি পাবে ত্রাণ এহো স্বয়ং ভগবান
এতেক আপদে যেবা রয়॥
মিথ্যা নয় সত্যভাষ প্রতাপচন্দ্র এনির্য্যাস
তাহে উপহাস ভাল নয়॥

কবি লিখিয়াছেন যে, ষাটজন প্রতাপচাঁদের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিলেও পক্ষপাতিত্ব করিযা তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয। কিন্তু যে ম্যাজিষ্ট্রেট ওগলবি প্রতাপচাঁদের গঙ্গাবক্ষস্থিত নৌকার আরোহীদিগের

৩৯ জাল প্রতাপচাঁদ—পূর্ব্বকথা পৃ ১
৪০ ঐ পৃ ১৩৮

উপর গুলীবর্ষণের আদেশ জারী করিয়াছিলেন তিনি প্রকৃত অপরাধী হইয়াও বিচারে নির্দোষ সাব্যস্ত হন !

অবিচার অপন্যায় কারা কার শুভ হয়
জানি পাপে বহু দণ্ড হয়।
শিষ্ট লোক ষষ্ঠি জন দিল সাক্ষী একমন
তথাচ করিয়া পক্ষপাত।
না করি দোষের দণ্ড বিপরীত করি কাণ্ড
নির্দোষের দোষ অবঘাত ॥
সাপরাধী মেজেষ্টর তার প্রতি সাধুত্তর
ছাড়ি দিল দিয়া সাধুবাদ ॥

কবি অনুপচন্দ্র প্রতাপচাঁদের শিষ্য ছিলেন এবং প্রতাপচাঁদকে তিনি ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করিতেন বলিয়া তাঁহার বর্ণনায় অতিরেক ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু কয়েকটি স্থানে সঞ্জীবচন্দ্রের বিবরণের সহিত তাঁহার বিবরণের কিছু পার্থক্য লক্ষিত হইলেও অধিকাংশ স্থলেই উভয়ের বিবরণের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। সঞ্জীবচন্দ্র এবং অনুপচন্দ্র উভয়েই জনমত প্রতাপচাঁদের অনুকূল ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিচারের অজুহাতে জাল প্রতাপচাঁদের দুর্গতি জনগণের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। তাঁহার এই জনপ্রিয়তাব উল্লেখপ্রসঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্র লিখিয়াছেন—এ অঞ্চলের কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ সকলেই জাল রাজার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল। ভিক্ষুকেরা কৃষ্ণগীত ছাড়িয়া কেবল প্রতাপচাঁদের গীত গাইত, প্রতাপচাঁদের জয় হউক বলিয়া তাহারা ভিক্ষা চাহিত। ভিক্ষুকদের গীত বালকেরা শিখিয়া পথেঘাটে দল বাঁধিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাইত। "পরাণবাবু হয়ে কাবু, হাবুডুবু খেতেছে" এই গীত যখন তখন যেখানে সেখানে শুনা যাইত।[৪১] কবি অনুপচন্দ্রও লিখিযাছেন যে প্রতাপচাঁদ কাঞ্চননগরে আসিয়া এরূপ জনসমর্থন লাভ করেন যে পরাণবাবু শঙ্কিত হইয়া উঠেন। "জনরবে পরাণের প্রাণ উড়ে যায়। কিসে নিবারণ করি এহেন জনায়॥" প্রতাপচাঁদ যেখানেই অবস্থান করেন স্থানীয় জনগণ জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি নীরব শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে থাকেন। বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা করিয়া জলপথে কালনা পৌঁছাইলে বহুদূরাঞ্চলেরও আবালবৃদ্ধবনিতা যেভাবে

৪১ জাল প্রতাপচাঁদ—পূর্বকথা প ২

াহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কবি তাহার এক বর্ণনা দয়াছেন,—

দুকুল গঙ্গার পানী ভাসিয়া চলে তরণী
দিব্য চক্ষে দেখে ভাগ্যবান।
করি কত কৃতাঞ্জলি যোগায় নজর ডালি
দুঃখী লোক পায় বহু দান॥
মহাজনরব হয় আবালবৃদ্ধ যুবা ধায়
যোজনকে জুড়ি হাটবাট।
হইল আনন্দময় দরশন করে কয়
আইলেন ছোট মহারাজ।

বর্ধমান হইতে বিতাড়িত জাল প্রতাপচাঁদের সন্ন্যাসী বেশে বিষ্ণুপুর আগমনের উল্লেখপ্রসঙ্গে কবি অনুপচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, প্রতাপচাঁদ বিষ্ণুপুরের রাজার নিকট স্বীয় পরিচয় গোপন করেন। কিন্তু রাজার মনে সন্দেহ হয় এবং এই সন্দেহ ভঞ্জনার্থে তিনি প্রতাপচাঁদের অকৃত্রিমত্ব পরীক্ষা করেন।

কিন্তু এক সন্দেহ ভঞ্জিতে হইল মন।
জলমধ্যে ডুবিযা থাকিতেন অনুক্ষণ॥
মহাহ্রদ গম্ভীরে জল দহ যারে কয়।
স্নান ছলে সেই জলে নামাই আশয॥
ইঙ্গিতে বুঝিযা হরি চলি জাই তথা।
দহ মধ্যে ডুবিলেন শুনি তার কথা॥
প্রহর পর্যন্ত ডুবি থাকিলেন হরি।
রাজা আদি সর্ব্বলোক হাহাকার করি॥
অন্তর্যামী নারায়ণ জানিয়া অন্তর।
দহ হইতে উঠিলেন জগৎ ঈশ্বর॥
* * *
বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহ কহয়ে বচন।
প্রতাপচন্দ্র মহারাজা বটেন এই জন॥

সঞ্জীবচন্দ্র এইরূপ কোন পরীক্ষার উল্লেখ করেন নাই। তিনি শুধু লিখিয়াছেন যে বিষ্ণুপুরের রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ জাল রাজাকে দেখিয়া হঠাৎ তাঁহাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া চিনিতে পারেন। প্রতাপচাঁদ বিষ্ণুপুর

হইতে বাঁকুড়ায় আসিলে বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে বিতাড়নের জন্য পরাণবাবুর মোক্তারের এজাহার গ্রহণ উপলক্ষে প্রতাপচাঁদের উপর চব্বিশ ঘণ্টার নোটীশে জেলা ত্যাগের পরোয়ানা জারী করেন। কিন্তু কবি অনুপচন্দ্র প্রতাপচাঁদের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য এক অবাস্তব ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন এই প্রসঙ্গে ;—

তথিমধ্যে দেখ এক খেলার তরঙ্গ।
গভর্ণর কৌন্সিলে কথা হইল প্রসঙ্গ।
অকস্মাৎ ইংরাজী চিঠি কেবা করে জারি।
শ্রুতমাত্র কৌন্সিলেরা যথার্থ বিচারি॥
পূর্ব্ব পরোয়ানা পরিবর্ত্তে পরোয়ানা।
ইচ্ছামত থাকিবেন কে করিবে মানা॥

সঞ্জীবচন্দ্রের বিবরণ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। তাঁহার বিবরণ অনুযায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট এলিস সাহেব স্থানীয় দারোগা, জমাদার, বরকন্দাজ সমভিব্যাহারে যাইয়া সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করেন এবং বিনাবিচারে কারাগারে আটক করিয়া রাখেন। প্রায় আটমাস পরে সন্ন্যাসীকে হুগলীতে প্রেরণ করা হয়। এ স্থলে সঞ্জীববাবুর বিবরণই অধিকতর প্রত্যয়বাচক। হুগলীর বিচারে জালরাজার ছয় মাস কারাদণ্ড এবং মুক্তির পর চল্লিশ হাজার টাকার পরিমাণে এক বৎসরের জন্য ফেলজামিন প্রদানের হুকুম জারী হয়। এ সম্বন্ধে কবির বিবরণ অনুরূপ হইলেও এই সঙ্গে তিনি প্রতাপের এক সহচরেরও কারাবাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

বর্ষ এক আটক ফাটকে অবিচার।
চল্লিশ সহস্র মুদ্রা মেয়াদের পর॥
তাইন জামিন হইলে পর অবসর।
প্রতাপচন্দ্র প্রতি এই হুকুম সাদর॥
···স্বরূপাঙ্গ প্রতি হুকুম হল স্বতন্তর॥
বর্ষ এক মেয়াদ কাল হইলে জামিন।
দশ সহস্র মুদ্রা করি তাহার তাইন॥
হইবেন তবে অবসর স্বরূপাঙ্গ।
ম্লেচ্ছ অবিচার সংপ্রতি হয় সাঙ্গ॥

অনুপচন্দ্র উল্লিখিত এই "স্বরূপাঙ্গ" কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম বলিয়া বোধ হয় না, কারণ কবি ইতিপূর্ব্বেই একস্থানে বলিয়াছেন যে—

স্বরূপাঙ্গ করি রঙ্গ লিখি পরিচয়।
যাহাতে ম্লেচ্ছ কর্ম্ম কারক প্রত্যয়॥

কবি অনুপচন্দ্রের অলৌকিক বিবরণ

এই সূত্রে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, জাল রাজাকেও কবি 'শ্রীরূপ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বর্ধমান যাত্রাপথে কালনার অম্বিকাঘাটে ম্যাজিষ্ট্রেট ওগলবি ক্যাপ্টেন লিটল্-এর সৈন্য সহায়তায় জাল রাজার নদীগর্ভস্থিত নৌকার আরোহীদের উপর গুলী বর্ষণ করিয়া যে হত্যাকাণ্ড করেন তাহার ফলে বহু নিদ্রিত নৌকারোহী নিহত এবং আহত হয়। প্রতাপচাঁদ জলে ঝাঁপ দিয়া আত্মরক্ষা করেন। কবি অনুপচন্দ্র প্রতাপচাঁদের মাহাত্ম্য ঘোষণার উদ্দেশ্যে এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের আদৌ উল্লেখ না করিয়া শুধু লিখিয়াছেন যে এইরূপ অবিরাম গুলী বর্ষণের ফলেও কেবলমাত্র পরাণবাবু প্রেরিত গুপ্তচর তারাচাঁদ দ্বিজবরই নিহত হয়।

ইহা ব্যতীত জাল রাজার বিচার সম্পর্কে প্রদত্ত অন্যান্য বিবরণ উভয়ত্রই একরূপ। দায়রার বিচারের উল্লেখকালে উভয়েই বলিয়াছেন যে, কাজী যে ফতোয়া দিয়াছিলেন তাহাতে প্রতাপচাঁদকে নির্দোষ বলা হইলেও জজ সেই ফতোয়া গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। নিজামতী আদালতের রায় বাহির হইবার পর জালরাজা কিছুকাল কলিকাতায় বাস করেন। এই সময়ে জাল প্রতাপচাঁদের যে মানসিক প্রশান্তির উল্লেখ সঞ্জীবচন্দ্র এবং অনুপচন্দ্র উভয়ের রচনা মধ্যে পাওয়া যায় তাহা সত্যই বিস্ময়কর। প্রতাপচাঁদ তখন ভিতরে ভিতরে যে এক সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন এই বাহ্যিক প্রশান্তি তাহার পরিচায়ক মাত্র। কলিকাতায় অবস্থানের পর তিনি কিছুকাল ফরাসী চন্দননগর এবং শ্রীরামপুরে অবস্থান করিযাছিলেন বলিয়া শোনা যায়। এই সময় তিনি ধর্মগুরুর আসন পরিগ্রহ করেন এবং শিষ্যদের মন্ত্রদান করিতেন। কিন্তু "তিনি যে মন্ত্র দিতেন তাহা বিষ্ণুমন্ত্র নহে, শক্তিমন্ত্রও নহে। তাঁহার দীক্ষাপ্রণালী, অর্চনা-পদ্ধতি নূতন প্রকার। অদ্যাপি তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা মন্ত্র দিয়া বেড়ান।···শিষ্যদের মধ্যে জালরাজার স্বতন্ত্র নাম সত্যনাথ।"[৪২] জালরাজার শিষ্য অপেক্ষা শিষ্যাসংখ্যাই বোধহয় বেশি ছিল। তাঁহার এই বিচিত্র সাধনপদ্ধতির সহিত কি 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়ের কোন যোগ ছিল?

প্রতাপচাঁদের ধর্মমত

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কবি অনুপচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল সঞ্জীবচন্দ্রের উদ্দেশ্য হইতে কিছু ভিন্ন। সঞ্জীববাবু জাল প্রতাপচাঁদের বৃত্তান্ত

৪২ জালপ্রতাপচাঁদ—পৃ ১৩৬

সহানুভূতি সহকারে কেন বিবৃত করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব কথাতেই তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। সেরূপ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুপচন্দ্রের ছিল না এবং তাঁহার উদ্দেশ্যও ছিল প্রতাপচাঁদের লীলা মাহাত্ম্য জ্ঞাপন তাই তাঁহার রচনার মধ্যে ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে অপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশে প্রকৃত ঘটনা অতিরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রতাপচাঁদ সম্পর্কে একটি গাথা

পারিবারিক চক্রান্ত জাল হইতে প্রতাপচাঁদের বিচিত্র পলায়ন কাহিনী লইয়া রচিত একটি গাথা[৪৩] পাওয়া গিয়াছে। ভনিতা হইতে জানা যায়, রচয়িতার নাম কার্তিকচন্দ্র সিদ্ধান্ত। এই গাথাটির রচয়িতাও প্রতাপচাঁদকে অবতারকল্প পুরুষ বলিয়া অভিহিত করিয়া পলায়নের পরে যেভাবে তিনি আত্মগোপন করিয়া ছিলেন পৌরাণিক উপমার সাহায্যে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

কার্ত্তিকচন্দ্র সীর্দ্দান্তের বাণী শুন ঈশ্বর চক্রপাণি
ছোট রাজা পাপক্ষয় করিল আপন।
দ্বাপরে পাণ্ডবগণ করিআছিল যেমন
সেই মত প্রতাপচন্দ্র করিল এখন।

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁহার 'জাল প্রতাপচাঁদ' নামক গ্রন্থে প্রতাপচাঁদের আদালতে দাখিলীকৃত জবানীতে এই পাপ ক্ষয়ের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, বিমাতা এবং পরাণবাবু তাঁহাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন এবং দুইবার তিনি বিষ ভক্ষণ হইতে রক্ষা পান। শেষে তাঁহারা বৃদ্ধ রাজার নিকট মিথ্যা অভিযোগ করিয়া প্রতাপচাঁদের বিরুদ্ধে তাঁহার মন বিষাক্ত করেন। প্রতাপচাঁদ সেই সময় আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলেন। "আমি সেই অবধি অধঃপাতে গেলাম। ক্রমেই মদ অধিক খাইতে লাগিলাম। শেষে, অদৃষ্টদোষে গুরুতর পাপগ্রস্ত হইলাম। তখন কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্যের নিকট স্বকৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ব্যবস্থা দিলেন 'এপাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল; তাহা অশক্তে চতুর্দ্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস। এই সঙ্গে বলিয়া দিলেন যে, এরূপভাবে অজ্ঞাতবাস করিবে, যেন সকলেই জানে—তুমি মরিয়াছ।'. এই অজ্ঞাতবাস কিরূপে আরম্ভ করিব, প্রথমে ঠিক অনুভব করিতে পারি নাই, সুতরাং প্রথমে কাহাকেও না বলিয়া পলাইলাম। সে বার আমার

৪৩ প ১৫৫৩ (দুই পাতার খণ্ডিত পুথি)

পিতা আমাকে রাজমহল হইতে ধরিয়া আনেন। ** আমি ফিরিয়া আসিলে, পিতামহাশয় পরাণের অত্যাচার ও পীড়নের কথা জানিতে পারিলেন এবং সেই অবধি পরাণের উপর তিনি হাড়ে চটিয়া গেলেন। আমাকেও অনেক বুঝাইলেন কিন্তু আমার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক, আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। এবার ভাবিলাম কেবল পলাইলে হইবে না, যেরূপ ব্যবস্থাপত্র, সেইরূপ করা কর্ত্তব্য। আমি মরিয়াছি—সকলে জানা আবশ্যক।"[৪৪] জাল রাজার এই উক্তি হইতে তাঁহার মৃত্যু রটনার কারণ উপলব্ধি করা যায়। প্রকাশ যে জাল রাজা উক্ত মর্মে আদালতে একটি বাঙ্গলা দরখাস্ত দিয়াছিলেন।

অব্যবহিত পরবর্তী রচনা

আমাদের আলোচনাকালের শেষ বন্ধনী ১৮৫৫ খৃষ্টীয় শতকে। কুচবিহারের মহারাণী বৃন্দেশ্বরী রচিত 'বেহারোদন্ত' অর্থাৎ [কুচ] বিহারের ইতিহাস গ্রন্থের মুদ্রণের তারিখ ১২৬৬ বাংলা সন অর্থাৎ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং ইহা আমাদের আলোচ্য সময়ের পরবর্তী রচনা। কিন্তু আলোচ্য-কালের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের এবং একই ধরণের রচনা বলিয়া রাণী বৃন্দেশ্বরী রচিত 'বেহারোদন্ত' এবং দুর্গাদাস মজুমার রচিত 'রাজবংশাবলীর' প্রাসঙ্গিক উল্লেখ বাঞ্ছনীয়।

বেহারোদন্ত

রাণী বৃন্দেশ্বরী কৃত বেহারোদন্ত 'স্থিত বেহার রাজঅন্তঃপুর সন ১২৬৬ বাঙ্গালা তারিখ ১৫ ভাদ্র কাকিনীয়াস্থ শম্ভুচন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত।' পরবর্তী-কালে ১৩৩০ সনে রাণী নিরুপমা দেবী কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া কোচবিহার সাহিত্য সভা কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হয়। কাব্যটির রচনাকাল সংশয়িত—কারণ সম্পাদিকার বিবরণ অনুসারে কাকিনার শম্ভুচন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল বলা হইলেও কাকিনা 'শম্ভুচরিতে'র মধ্যে উক্ত মুদ্রাযন্ত্রের স্থাপনকাল ১২৬৬ সনের অগ্রহায়ণ মাস।[৪৫] অবশ্য 'শম্ভুচরিতে'র উল্লেখ ভ্রমাত্মক হইতেও পারে কিন্তু বেহারোদন্তের মুদ্রণ তো রচনার পূর্বে হওয়া সম্ভব নহে। রাণী বৃন্দেশ্বরী পরিশেষে কাব্য সমাপ্তি প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

অষ্টাদশ শতে কাশী শকের নির্ণয়।
মৃগেন্দ্রের পক্ষ দিনে লিপি সাঙ্গ হয়॥

গ্রন্থকর্ত্রী ছিলেন মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের মহিষী। 'কোচবিহারের ইতিহাস' প্রণেতা এই কাব্যে উল্লিখিত ঐতিহাসিক বিবরণাদির

৪৪ জাল প্রতাপচাঁদ—পৃ ৯৪
৪৫ বেহারোদন্ত—ভূমিকা

সত্যতা সম্পর্কে বিশেষ কোন আলোচনা করেন নাই। তিনি শুধু এই গ্রন্থের উল্লিখিত 'বংশলতা'র ভ্রমপ্রমাদের উল্লেখ করিয়াছেন।[৪৬]

কিন্তু মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের পরলোক গমনের পরে রাজকর্মচারীদের ঔদাসিন্য এবং ষড়যন্ত্রের ফলে রাজ্যের যে কিরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল এই কাব্য হইতে তাহার এক প্রত্যক্ষ বিবরণ সংগ্রহ করা যায়। রাণী বৃন্দেশ্বরীর কাব্য হইতে জানা যায় যে, মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া বারাণসী যাত্রাকালে তৎকালীন ইংরেজ এজেন্টের সম্মতিক্রমে ভ্রাতুষ্পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণকে দত্তক স্বরূপ গ্রহণ করেন। ইহার অল্পকাল পরে বারাণসীধামে তাঁহার মৃত্যু হইলে তথা হইতে প্রত্যাবর্তনকালেই রাজপুরুষদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। রাণী এই বিপদের পরিণাম আশঙ্কায় লিখিয়াছেন,—

কালী শিব প্রসাদ দুজনে দ্বন্দ্ব করি।
আপন নৌকায চলে সব পরিহরি॥
নানামত প্রবোধিলে না মানে বারণ।
দেখি দুর্ঘটনা মোরা চিন্তি সর্ব্বক্ষণ॥
রাজারে রক্ষণ করে দ্বারেব মোক্তার।
শ্রীতারামোহন ছোট বক্সী নাম তার॥

সমকালীন বিবরণ

রাজা নাবালক থাকায শিবেন্দ্রনারাযণের ভ্রাতা ব্রজেন্দ্রনারাযণ রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কিছুকাল পরে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করায় রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয এবং রাজকর্মচারীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সুযোগে দুষ্ট প্রকৃতির কর্মচারিগণ অবস্থা বুঝিয়া রাজ্যের ধনসম্পদ হরণ করিতে থাকে। রাণী বৃন্দেশ্বরী অত্যন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত চিত্তে তাঁহার কাব্যে রাজ্যের এই দুরবস্থা এবং তজ্জন্য প্রজার দুর্গতির যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহা নির্ভরযোগ্য বলিয়াই মনে হয়।

দুষ্ট বর্গ যারা কাল পেয়ে তারা
করে তাড়াতাড়ি তারা
ছিল যত ধন করিল হরণ,
কি করি রমণী মোরা॥

---

৪৬ কোচবিহারের ইতিহাস—খাঁ চৌধুরী আমানত উল্যা আহমদ

সচিব যাঁহারা, দ্বন্দ্বে মত্ত তাঁরা,
রাজ্য দিকে নাহি চায়।
প্রজার সর্ব্বস্ব, হরে সব দস্যু,
বিচার কে করে তায়॥

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ বয়োঃপ্রাপ্ত হইলে এজেণ্টের প্রস্তাবানুযায়ী ইংরেজী শিক্ষার জন্য তাঁহাকে কোচবিহার হইতে কৃষ্ণনগরে লইয়া গিয়া রাজ-কলেজে ভর্ত্তি করা হয়। রাজকুমারের প্রবাসে কালে মন্ত্রীদের স্বার্থপরতায় রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। রাণী বৃন্দেশ্বরীর ভাষায়,—

দীর্ঘ পরবাসে রাজা করিল গমন।
দুর্ভিক্ষ মরক রাজ্যে উপস্থিত হন॥
অন্নভাবে সব প্রজা করে হাহাকার।
দিনান্তরে কিছুমাত্র না মিলে আহার॥
জঠর জ্বালাতে মরে করিযা হুতাশ।
ছাড়য়ে বণিতা নিজ পতি গৃহ বাস॥
আর যত মন্ত্রী ছিল বেহার নিবাসে।
চক্ষু মুদে থাকে তারা নিজ কার্য বশে॥

দেওয়ান তারাচরণ মোক্তারের সুখ্যাতি করিয়া রাণী লিখিযাছেন যে তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টা এবং সতকর্ত্তায় অবস্থা ক্রমশই আয়ত্বাধীন হয়।

রাজার অবর্ত্তমানে রাণী বৃন্দেশ্বরী রাজ্যশাসন কার্যের সহিত যুক্ত ছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে নানাপ্রকারের দুর্নামের ভাগী হইতে হয় বলিযা তিনি মাঝে মাঝে দুঃখ প্রকাশ করিযাছেন। শিক্ষা শেষ করিয়া রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং রাজ্য শাসনের কিছু নূতন বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

রাণী বৃন্দেশ্বরী প্রদত্ত আত্মপরিচয় কাহিনী হইতে জানা যায়, তিনি গোয়ালপাড়ার অন্তর্বর্তী পর্বতজোয়ারের জমিদার রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কন্যা ছিলেন। নরেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ প্রসঙ্গে কাব্যটি হইতে কুচবিহার রাজবংশের একটি প্রাচীন কুলপ্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজাদের বিবাহের পূর্বে পাত্রীকে রাজবাটীতে আনিয়া রাখা হয় এবং রাজকুমারের মনোভিলাষ ব্যক্ত হইলে পরে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়। স্বয়ং রাণী বৃন্দেশ্বরীও বিবাহের পূর্বে এইভাবে রাজবাটীতে আসিয়াছিলেন।

প্রাচীন কুল-প্রথা

বৃন্দেশ্বরী সুশিক্ষিতা ছিলেন। তাঁহার কাব্যে কবিত্বের সহজ স্ফুরণের ছাপ সুপরিস্ফুট। গভীর তত্ত্বকথাও তিনি সহজভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন স্বচ্ছন্দে। তাঁহার কাব্যের উপমাগুলিও নারীসুলভ সারল্য-পূর্ণ। রাজার প্রজাপালনের বর্ণনায় এইরূপ এক উপমা বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়।

প্রজার পালন করেন অতি সাবধানে
যেন সাবধানে পাতা রাখয়ে নয়নে॥

রাজবংশাবলী

কবি দুর্গাদাস মজুমদার "রাজবংশাবলী" নামক বিপুলায়তন কাব্যটি ১২৭০ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে রচনা করেন। সেই সময়ে এক বৎসরের শিশু রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। রাজমালা প্রভৃতি ত্রিপুর-রাজবংশাবলী রচযিতার ন্যায় কোচবিহার রাজবংশের মর্যাদাবৃদ্ধিকল্পে কবি দুর্গাদাসও কাব্যের প্রথমাংশে পৌরাণিক কাহিনী সাড়ম্বরে বর্ণনা কবিযাছেন। এই সকল ইতিহাসবিরুদ্ধ কাহিনীর আলোচনা নিরর্থক। কিন্তু পরবর্তীকালের সকল বিবরণ অনৈতিহাসিক নহে, ববং অন্যত্র বর্ণিত হয় নাই এমন অনেক বিবরণই দুর্গাদাসের কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায়।[৪৭] রচনা হিসাব ইহাকে ত্রিপুরার রাজমালার সমশ্রেণী-ভুক্ত করা চলে। আত্মপবিচয প্রদানসূত্রে দুর্গাদাস লিখিয়াছেন যে, রাজা শুক্লধ্বজ যে চৌদ্দ জন কায়স্থকে পূর্বদেশ হইতে কোচবিহারে আনয়ন পূর্বক ভূমিদান করেন তিনি তাঁহাদের একজনের বংশধর। তাঁহার পিতার নাম মনোহর এবং পিতামহ শঙ্কর। এই চৌদ্দ জনের মধ্যে বাকী তের জনেরই নাকি বংশ নষ্ট হইযা যায়।

শিবের সন্তান সে শঙ্কর তার নাম।
শঙ্করের সুত নাম ধরে মনোহর॥
মনহর সুত আমি দুর্গাদাস মূঢ়।
চৌদ্দজন মধ্যে অবশিষ্ট কুলাঙ্গার॥

দুর্গাদাস প্রত্যেক রাজার স্বর্গলাভ এবং পববর্তী রাজার সিংহা-

৪৭ আলোচ্য পুঁথিতে ইতিহাসবিরুদ্ধ অনেক উক্তি আছে; তথাপি ইহা রাজোপাখ্যানের পরেই কোচবিহার রাজবংশাবলী বলিয়া ঐতিহাসিক সমাজে বিবেচিত হইবার উপযুক্ত। রাজোপাখ্যানে বিবৃত হয় নাই এরূপ অনেক বিবরণ এই গ্রন্থে লিখিত আছে। কোচবিহারের ইতিহাস—খাঁ চৌধুরী আমানতউল্যা আহমদ পৃ ৬

সনারোহণের রাজশক উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার রাজশকের সহিত রাজোপাখ্যান রচয়িতা জয়নাথ মুন্সীর রাজশকের সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। দুর্গাদাস তাঁহার কাব্যের নামকরণ করিয়াছেন—'রাজবংশাবলী'। শুধু কোচবিহার রাজবংশেরই নহে, কবি সংক্ষেপে আসাম রাজবংশেরও উল্লেখ করিয়াছেন। কাব্যের অপ্রাকৃত অংশসমূহ ছাড়া আসাম রাজের সহিত কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের যুদ্ধ, আসাম অধিকার, মোগল আক্রমণ, ভোটদিগের সহাযতা লাভ এবং ইহার ফলে ভোটদিগের কোচ-বিহারের উপর আধিপত্য বিস্তার, নাজিরের ষড়যন্ত্র, রাজহত্যা, পরিশেষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্য সাহায্যে ভোট বিতাড়ন, সন্ন্যাসীদমন প্রভৃতি কাহিনী রাজবংশাবলী গ্রন্থের আয়তন বৃদ্ধি করিযাছে। খুটি-নাটি সকল বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে নিসংশয় হইতে না পারিলেও মূল ঘটনাগুলি ইতিহাস বিরুদ্ধ বলা সঙ্গত নহে। রাণী বৃন্দেশ্বরীর কাব্যে শিবেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পরবর্ত্তীকালে রাজকর্মচারীদেব ষড়যন্ত্রমূলক কার্য-কলাপের ইঙ্গিত মাত্র আছে কিন্তু দুর্গাদাসের কাব্যে উল্লিখিত পূর্ববর্তী দেওযান এবং নাজিরদিগেব রাজ্যলাভেব জন্য ভুটিযাদেব সাহায্যগ্রহণ এবং রাজহত্যা প্রভৃতি কাহিনী হইতে সে সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত বিবরণ পাওযা যায।

দুর্গাদাসের রচনার ঐতিহাসিকত্ব

রাজকাহিনী ব্যতীত কয়েকটি বৈষ্ণবজীবনীকাব্য হইতেও কিছু কিছু ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা যায। আমবা অনুরূপ কযেকটি কাব্যের এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। নাভাজীকৃত হিন্দী ভক্তমাল অবলম্বনে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে দুইটি বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ রচিত হয। তন্মধ্যে কবি লালদাস (নামান্তর 'কৃষ্ণদাস') কৃত ভক্তমাল উল্লেখযোগ্য। লালদাস নাভাজী বর্ণিত বিষয়সমূহ ছাড়াও অনেক নূতন ভক্তকাহিনী যুক্ত করিযাছেন। ইহার মধ্যে মহারাজ নন্দকুমাব এবং পুঁটিয়ার রাজা রবীন্দ্রনারাযণের উল্লেখ দেখিয়া অনুমিত হয় যে, ইহা অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে রচিত হয। 'প্রেমবিলাসের' রচনাকালের প্রচীনত্ব সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রেমবিলাসের মধ্যেও বহু প্রাচীন বৃত্তান্ত সন্নিবিষ্ট আছে। অবশ্য আধুনিক অংশগুলি পরবর্তীকালের প্রক্ষেপও হইতে পারে। রচয়িতার নাম নিত্যানন্দ দাস। নিবাস শ্রীখণ্ডে।

বৈষ্ণবজীবনী-কাব্য

বাংলা ভক্তমালের দুইটি বিভাগ—একটি চারিত্রিক, অপরটি তাত্ত্বিক। এই চারিত্রিক বিভাগে পৌরাণিক ও মহাপুরুষ চরিত্রগুলির সহিত

লালদাস কয়েকজন সমসাময়িক ব্যক্তি এবং ঐতিহাসিক চরিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন' কবি চান্দরায় চরিত্রে' রাজমহালের জমিদার চাঁদরায়ের নানা অনাচার এবং অত্যাচারের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া সেই পাপে তাঁহার শরীরে দুরারোগ্য ব্যাধির সঞ্চার এবং ভ্রাতা সন্তোষ রায়ের অনুরোধে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের কৃপায় আরোগ্য লাভের বিবরণ দিয়াছেন। এই কাহিনী অনুযায়ী চাঁদরায় দস্যুতা করিতেন। তিনি এতদূর পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন যে মোগল রাজশক্তির ভয়েও তিনি ভীত ছিলেন না।

রাজমহালেতে স্থিতি চান্দ রায় নাম।
জমিদার অতি আঢ্য দস্যুবৃত্তি কাম॥
বিশলক্ষ মুদ্রা যায় কর নাহি দেয়।
নবাব-আসোয়ার আইলে মারিয়া ভাগায়॥
লস্কর বন্দুক তোপ অনেক আছয়।
নবাব তাহার সনে যুদ্ধে না আটয়॥

বৈষ্ণব লালদাস শাক্ত চান্দরায়কে শেষপর্যন্ত বৈষ্ণবধর্মানুরাগীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। নিত্যানন্দ দাস বিরচিত বৈষ্ণবজীবনী কাব্য প্রেমবিলাসের মধ্যেও পাওয়া যায় যে, রাজমহালের জমিদার চান্দরায় মোগল সম্রাটকে কর প্রদান না করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

মহাবীর শক্তি ধরে যুদ্ধ পরাক্রমে।
শুনিয়া তাহার নাম কাঁপয়ে জীবনে॥
চৌরাশি হাজার মুদ্রার ছিল জমীদার।
তার কথোদিনে হইল এমন প্রকার॥
গড়ি দ্বারে গেল তাহা ফৌজদার হয়।
রাজমহল থানা করি আমল করয়॥
বলবান দেখি সেই বিচারিল মনে।
না দেয় পাতসার কর থানা দেয় গ্রামে॥
পাঁচ সহস্র অশ্ব রাখে থানা দেয় গ্রামে।
কত দেশ মারি নিল করি অস্ত্রবল॥

চাঁদ রায়ের দস্যুদলে বহু ব্রাহ্মণ সন্তানও যোগদান করিয়াছিল?

গোবিন্দ ব্যাড়ুয্যা আর ললিত ঘোষাল।
কালিদাস ভট্ট দস্যু অতি দুরাচার॥

নীলমণি মুখুটি আর রামজয় চক্রবর্তী।
হরিনাথ গাঙ্গুলী আর শিব চক্রবর্তী॥
পূর্ব্বে তারা চান্দরায়ের সৈন্য যে আছিল।
চাঁদ রায়ের সঙ্গে বহু দস্যুবৃত্তি কৈল॥

প্রেমবিলাস কাব্যে নবাব কর্তৃক চাঁদ রায়কে হাতীর পায়ের তলায় ফেলিয়া হত্যার আদেশ দানের কথা আছে। শুধু চাঁদরায় নহে, প্রেম-বিলাসের মধ্যে আরও একজন বিদ্রোহী জমিদারের দস্যুবৃত্তির বিবরণ পাওয়া যায়,—

জলাপন্থের জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায়।
রাজদ্রোহী দস্যুবৃত্তি করেন সদায়॥

একাধিক বৈষ্ণব গ্রন্থে এই সকল করদ জমিদারীর যে বিবরণ আছে তাহা হইতে অনুমান হয় যে তদানীন্তন পাঠান রাজগণ নিয়মিত করের বিনিময়ে দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে সহজে হস্তক্ষেপ করিতেন না এবং সেই সুযোগে শক্তি সংগ্রহ করিয়া অনেক হিন্দু জমিদার করপ্রদান বন্ধ করিয়া বিদ্রোহও ঘোষণা করিতেন।[৪৮]

মহারাজ নন্দকুমার

বাংলা ভক্তমাল প্রণেতা লালদাস শক্তি উপাসক রাজাদের বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অনুরাগের বিশ্বাস্য-অবিশ্বাস্য নানা কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। পুঁটিয়ার রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ রায়ের ন্যায় শাক্ত শিবশক্তি উপাসক কিভাবে দুইজন বৈষ্ণবের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন লালদাস তাহার এক দীর্ঘ বর্ণনা দিয়াছেন। এই বর্ণনার মধ্যে বৈষ্ণবদের পৃষ্ঠপোষকরূপে মহারাজ নন্দকুমারের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

রায়রেঞে মহারাজ নন্দকুমার।
কালদণ্ড সমপ্রতাপ তাঁহার॥
রাজ রাজোড়া যত যাহার অধীন।
চাহে রাখে চাহে মারে চাহে লহে ছিন॥
শ্রীপাট মালিহাটির দাস তেঁহো হয়।
যেহেতুক রাজারে বৈষ্ণব না ডরায়॥

মীরকাসেমের পতনের পর মীরজাফর পুনরায় নবাব হইয়া নন্দকুমারকে মন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং নবাব সুজাউদ্দৌল্লা তাঁহাকে মহারাজ উপাধি এবং

---

৪৮ 'বৈষ্ণব সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ'—সা-প-প ১৩৩১ সন

সাত হাজার সৈন্যের উপর আধিপত্য প্রদান করেন। এই সময়ে নন্দকুমারের প্রতিপত্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায়—প্রকৃতপক্ষে নবাব ছিলেন নামমাত্র, নন্দকুমার-ই সকল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।[৪৯] ১৭৬৫ খৃষ্টীয় শতকে মহম্মদ রেজা খাঁ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। সুতরাং পুটিয়ার রাজা বৈষ্ণবদ্বয়কে ভীতি প্রদর্শন করিলেও তাহাদের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি অস্বাভাবিক নহে।

ভয় কি দেখাও তুমি হেন জমিদার।
শত শত রাজা নন্দকুমারের সেবাপর
তাঁহার ঠাকুর বাড়ীর ভৃত্য আমি।
আমারেহ মানে বহু রাজা যথা তুমি॥

এই উক্তি হইতে মনে হয় যে মহারাজ নন্দকুমার সেই সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার সত্যতা নিরূপণ করা না গেলেও মহারাজ নন্দকুমার যে ধর্মপ্রিয় সদাশীল ব্যক্তি ছিলেন তাঁহার জীবনচরিত গ্রন্থ হইতে তাহা জানা যায়।

"তিনি অবকাশমত রামপ্রসাদ, ত্রিবেণীর পণ্ডিত জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন প্রভৃতি ভক্ত মনীষীদের সহিত ধর্মালোচনা করিতেন।"[৫০]

প্রতাপরুদ্রদেব

ভক্তমালের একবিংশ মালায় উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের চরিত্র বর্ণনা সূত্রে শ্রীচৈতন্যের কৃপা অর্জনে রাজার সুদৃঢ় পণ, শ্রীচৈতন্যের রাজমুখদর্শনে অনিচ্ছা এবং পরিশেষে রাজার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধির কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ত্রয়োবিংশ মালা হইতেছে অন্ধ কবি সুরদাস সম্পর্কে। বিষয়াধিকারী হইয়াও সাধক কবির কৃষ্ণপ্রেম কিরূপ প্রগাঢ় ছিল লালদাস তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

পরগণে সড়িলা নাম তাহাত বৈসয়।
বিষয় করেন কিন্তু কৃষ্ণের আশ্রয়॥
পাৎসার চাকর তের লক্ষের তসিল।
করেন কিন্তু যে মন শ্রীকৃষ্ণের শিল॥

সুরদাসের জন্মস্থানের অবস্থিতি সম্পর্কে মতভেদ আছে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'আগ্রার নিকটবর্তী রেণুকা

৪৯ মহারাজ নন্দকুমার—সত্যচরণ শাস্ত্রী পৃ ১৬৫
৫০ ঐ পৃ ৭০

ক্ষেত্রকেই অনেকে সুরদাসের জন্মস্থান মনে করেন। রেণুকাক্ষেত্রের বর্তমান নাম রুণুকুতা। আবার কেহ কেহ মনে করেন, দিল্লীর নিকটবর্তী "সীহী" গ্রামে তাঁহার জন্ম। চৌরাশী বৈষ্ণববার্তায় আছে, সুরদাসের জন্ম হইয়াছিল পউঘাটে। পউঘাট রুণুকুতার কাছেই অবস্থিত। চৌরাশী বৈষ্ণববার্তার টীকাকার হরিরায় তাঁহার 'ভাবপ্রকাশে' বলেন যে, সুরদাসের জন্ম সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণকুলে এবং তাঁহার জন্মস্থান সাহীগ্রামে।"[৫১]

সুরদাস

এই বিবরণের মধ্যে সুরদাসের ছয় ভ্রাতার মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জনের উল্লেখ আছে। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে নরহরি চক্রবর্তী রচিত ভক্তিরত্নাকরের মধ্যেও বৈষ্ণব গোস্বামী মহাপুরুষগণ সম্পর্কে কিছু কিছু প্রামাণিক বিবরণ আছে। এই কাব্যের মধ্যে নরহরি তাঁহার অপর দুইটি গ্রন্থ নরোত্তমবিলাস এবং শ্রীনিবাসচরিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীনিবাসচরিত্রের পরেই নরহরি ভক্তিরত্নাকর এবং তাহার পর নরোত্তমবিলাস রচনা করিয়া থাকিবেন। নরোত্তমবিলাসের মধ্যে খেতুরীর রাজা হিসাবে নরোত্তমের পিতা কৃষ্ণানন্দ দত্তের উল্লেখ আছে।

কুলজী-শাস্ত্র রূপ এক নূতন সামাজিক শাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে কিছু কালের মধ্যে বহু আলোচনা হইয়াছে। ঠিক কোন্ সময় প্রকৃতপক্ষে এইসকল শাস্ত্র রচনা আরম্ভ হয় সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলেও এই সকল কুলগ্রন্থে কুলাচার্যগণ যেরূপ আগ্রহের সহিত প্রচলিত সামাজিক শ্রেণীবিভাগ এবং ধর্ম বিশ্বাসকে প্রাচীনত্বের মর্যাদা দান করিয়া সমাজ-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইয়া উঠেন ঐতিহাসিকগণ তাহা হইতে অনুমান করেন যে, দুইশত বৎসরের মুসলমানাধিপত্যের পর পঞ্চদশ শতকে হিন্দুদের নবজাগরণের ফলে সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ—জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পুরাতন আবর্জনা মুক্ত করিয়া জাতিকে স্ব মহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার যে প্রয়াস লক্ষিত হয় কুলশাস্ত্রকারগণের সামাজিক ব্যবস্থাদির এই সংস্কার প্রয়াসও তাহার সমকালীন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার কুলশাস্ত্রকারগণের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে এইরূপ অনুমান করিয়াছেন,—খুব সম্ভব এই সময়ে কুলশাস্ত্রগুলির নূতন সংস্করণ হয়। দেবীবর ঘটক, ধ্রুবানন্দ মিশ্র, বাচস্পতি মিশ্র, হুলো পঞ্চানন প্রভৃতি

কুলজী-শাস্ত্র

---

৫১ 'মহাকবি সুরদাস'—ক্ষিতিমোহন সেন দেশ আশ্বিন ১৩৫৯

প্রসিদ্ধ কুলাচার্যগণ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে এবং ষোড়শ শতাব্দীর আরম্ভে প্রাদুর্ভূত হন।[৫২]

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ হইতে যে কুলজীশাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হইতে আরম্ভ হয়, পরবর্তী যুগসমূহে সেই কুলজী রচনার ধারা অব্যাহত থাকে। শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় রামকান্ত প্রণীত বৈদ্য-কুলজী 'কবি কণ্ঠহার' এবং ভরত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা' যথাক্রমে ১৬৫৬ এবং ১৬৬৩ খৃষ্টীয় শতকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।[৫৩] আরো পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতকে কায়স্থ ও অন্যান্য বর্ণের কুলজী রচিত হইয়াছিল। এই সকল কুলজীর মধ্যে রাজা আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ হইতে বাংলাদেশে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন কাহিনী ব্যতীত অন্য কোন কাহিনীর মধ্যে ঐক্য দূরের কথা অত্যন্ত প্রভেদ এবং পরস্পর বিরুদ্ধমত লক্ষিত হয়।

কৌলীন্য গর্বিত ব্যক্তিদের নিকট বংশমর্যাদার স্মৃতি হিসাবে এই জাতীয় কুলজীর মূল্য যাহাই হউক না কেন এইরূপ সামাজিক মর্যাদাবর্ধক কুলগ্রন্থগুলির ঐতিহাসিক মূল্য বিচারে এইগুলি স্বতঃই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। কুলশাস্ত্রগুলি যে একেবারে নিছক কাল্পনিক বাক্-বিন্যাস নহে, সামাজিক প্রয়োজনেই কুলকারগণ কুলজী রচনায় ব্রতী হইতেন সে কথা অনস্বীকার্য কিন্তু ইহার কতখানি ঐতিহাসিক সত্য এবং কতখানি জনশ্রুতি এবং রচয়িতার উদ্দেশ্যমূলক প্রক্ষেপ-ই বা কি পরিমাণ তাহাই নির্ণেয়। রমাপ্রসাদ চন্দ সর্বপ্রথম কুলগ্রন্থগুলির ঐতিহাসিকতা নির্ণয়ে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।[৫৪] তাঁহার পর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এই সকল কুলজীগ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা[৫৫] করিয়া যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার যৌক্তিকতা প্রণিধানযোগ্য। "যে উদ্দেশ্যে রঘুনন্দন পুরাতন স্মৃতির বচন সংগ্রহ করিয়া অষ্টবিংশতিতত্ত্ব লিখিয়াছিলেন সেই উদ্দেশ্যেই কুলাচার্যগণও কুলগ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হন। তখনকার সমাজে যে শ্রেণীবিভাগ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাকে প্রাচীনত্বের মর্যাদা দিয়া তাহার মধ্যে নূতন

৫২ 'কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা —ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৪৬
৫৩ বাঙালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায় পৃ ২৬২
৫৪ Indo Aryan Races—R. P. Chanda
৫৫ বঙ্গীয় কুল শাস্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য—ভারতবর্ষ কার্তিক—ফাল্গুন ১৩৪৬

প্রাণের ও নূতন আদর্শের সৃষ্টি করাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দু রাজত্বের অবসানের প্রাক্কালে যে তিনটি হিন্দু রাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল—বর্ম, শূর ও সেন রাজবংশ—তাহাদের সহিত বঙ্গদেশের উচ্চ জাতির সংযোগ স্থাপন করিয়া তাঁহারা নবীনকে প্রাচীনত্বের মর্যাদা দান করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।···প্রকৃত ইতিহাসের মূর্তি এক ও অভিন্ন কিন্তু কাল্পনিক ইতিহাসের মূর্তি অনন্ত। সেই জন্যই কুলগ্রন্থের মধ্যে এত প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তি বংশ বা সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত রচিত কুলগ্রন্থে স্বভাবতই অনেক আখ্যানের সংযোগ হইয়াছে। এই সমুদয়ের ফলেই বর্তমানে কুল শাস্ত্রের সৃষ্টি হইযাছে। সুতরাং কুলশাস্ত্র ঐতিহাসিক গ্রন্থও নহে, নিছক কাল্পনিক উপাখ্যানও নহে। সমসাময়িক সমাজের প্রয়োজন অনুসারে প্রচলিত ঐতিহাসিক জনশ্রুতির ভিত্তিব উপর কল্পনার সাহায্যে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শাতব্দীতে এই শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।”[৫৬]

কুলজী শাস্ত্রগুলির ঐতিহাসিকত্বের অন্তরাযস্বরূপ নানা ছোট বড় সংশয়-গ্রন্থী রহিযাছে। আদিশূর কর্তৃক বঙ্গদেশে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়নের পূর্বে যে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ছিলেন না এবং উক্ত পাঁচ ব্রাহ্মণবংশেই বাংলা দেশেব সকল রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উদ্ভব, কুলজী গ্রন্থজাত এই বিবরণসমূহ যে একান্তই অনৈতিহাসিক এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রচারমাত্র আদিশূর-বল্লাল সেন পূর্ববর্তী রাজাদের তাম্রশাসনে বর্ণিত ব্রাহ্মণ সমাজের উল্লেখ হইতে তাহা সপ্রমাণিত হইযাছে।[৫৭] দ্বিতীয অন্তরায় হইতেছে—বল্লালসেন কর্তৃক কৌলীন মর্যাদার প্রবর্তন এবং তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন কর্তৃক সেই মর্যাদা বৃদ্ধির বিবরণ। বল্লালসেনের পূর্বেও যে কৌলীন্য প্রথা ছিল তাহারও প্রমাণ পাওযা গিযাছে।[৫৮] তদ্ব্যতীত বল্লাল সেনের সমসাময়িক কোন লিপি বা গ্রন্থে এসম্বন্ধে কোনরূপ উল্লেখই যে পাওয়া যায় না তাহাও কি অকারণ ?[৫৯]

৫৬ ‘কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা’—ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৪৬

৫৭ দামোদরপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনগুলি হইতে প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বেই বঙ্গদেশে সাগ্নিক ও বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণরা আগমন করিয়াছিলেন। কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৪৬ পৃ ৩৬৮

৫৮ ঐ পৃ ৩৭২

৫৯ বাঙালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায় পৃ ২৬৪

যে বল্লালসেনকে কুলজীকারগণ কৌলিন্যের প্রবর্তক বলিয়া সম্মান দেখাইয়াছেন তাঁহার কুল-পরিচয় ও বিভিন্ন শ্রেণীর কুলজীগ্রন্থে বিভিন্ন প্রকারের। শুধু তাহাই নহে, বল্লালসেনের সমসাময়িক যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে বল্লালসেনের যে বংশাবলির উল্লেখ আছে তাহার সহিতও কুলজী বর্ণিত বংশাবলির সাদৃশ্য নাই। কুলজীগ্রন্থে বল্লালসেন কর্তৃক রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীবিভাগের যে বিবরণ আছে তাহাও অনৈতিহাসিক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, কারণ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র নামকরণ ভৌগলিক সীমানির্ধারণ-সূত্রে করা হইয়াছিল।[৬০] কিন্তু কুলজীশাস্ত্র-সমূহের মধ্যে ঐতিহাসিক বিবরণ আদৌ নাই বলাও যায় না। কুলগ্রন্থে আছে যে পূর্বে পশ্চিমদেশবাসী ব্রাহ্মণদের কোন গাঁই ছিল না (?) গোত্রের নামেতেই তাঁহাদের বংশ পরিচয় দেওয়া হইত এবং বিভিন্ন ঋষির নামে বিভিন্ন বংশের গোত্রের নামকরণ হইত। তাঁহারা বাংলাদেশে আগমন করিলে বাংলাদেশের রাজা তাঁহাদের গ্রাম দান করেন এবং তাঁহাদের পূর্ব প্রচলিত গোত্রের সহিত গ্রামের নাম যুক্ত হয় এবং এই গোত্রের বিভিন্ন বংশের পরিচয় গাঁই-এর পার্থক্য হইতেই নির্ণীত হয়।[৬১]

যে হতে বঙ্গেতে রাজা আনিল ব্রাহ্মণ।
ছিল নাকো পূর্ব্বের কিছু বংশের লিখন॥
পূর্ব্বে যবে এই বংশ পশ্চিমেতে রয়।
গোত্রের নামেতে বংশ দিত পরিচয়॥
মরিচ্যাদি ঋষি হতে চলিতেছে বংশ।
কশ্যপাদি তার পুত্র হয় অবতংশ॥
ঋষিরা করেন গোত্র যজ্ঞের কারণ।
গোরক্ষা স্থানের নাম গোত্র নিরূপণ॥
তিন চারি পাঁচ মুনি একতা হইয়া।
গোত্রকার হন তারা যজ্ঞের লাগিযা॥
গোত্রমধ্যে ঋষিদের ছিল নিকেতন।
গাং রক্ষয়তি ইতি শব্দটি সাধন॥

* * *

সেকালে আছিল মাত্র গোত্র সমন্বয়।
তারপর বঙ্গদেশে রাজা দিল গ্রাম।
গোত্রেতে মিশ্রিত হল গ্রামেরই নাম॥

৬০ The History of Bengal. (D.U.) Vol 1 p. 659 fn.
৬১ আর্যবংশাবলী—তিনকড়ি ঘোষাল; কারিকা পৃ ৫৫ দ্রষ্টব্য।

প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণগণ রাজদত্ত গ্রাম পাইয়া প্রদত্ত গ্রামের নামানুসারে সেই 'গাঞি' আখ্যা লাভ করিতেন—কুলগ্রন্থের এই বিবরণটুকু মাত্র ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে গ্রহণীয় কিন্তু বাকী অংশ অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত পঞ্চব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আসিয়া বল্লালের নিকট হইতে গ্রাম পাইয়া গাঁই আখ্যা লাভ করিবার পূর্বে তাঁহাদের কোন 'গাঞি' ছিল না—স্বীকার্য নহে।[৬২]

কুলগ্রন্থানুযায়ী দেবীবর ঘটক কুলীনদের দোষ হিসাবে মেল বন্ধন করিয়াছিলেন। কুলীনগণ বিভিন্ন দোষে কৌলিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন—অপেক্ষাকৃত হীনবংশের কন্যা গ্রহণের ফলে যে সকল দোষ ঘটে তন্মধ্যে মেলমালায় 'যবনদোষ' এবং 'কাশ্যপকাঞ্জিড়ীকারিকা'য় মগদোষের বিবরণ পাওয়া যায়। মগজলদস্যুদের অত্যাচার বাংলাদেশের সমুদ্রকূলবর্তী জেলাসমূহে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকেই অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মগেরা বাঙ্গালীর রক্তে তাহাদের রক্ত মিশাইয়াছিল। কিন্তু তদ্রাশ্রিত বিবরণ সপ্তদশ শতকের পূর্ববর্তী হইতে পারে না। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতকের এক কুলজীগ্রন্থের মধ্যে কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। কয়েকটি প্রামাণিক চৈতন্যজীবনীর মধ্যে চৈতন্য-পার্ষদ যে-মুকুন্দ দত্তের উল্লেখ আছে, তিনি চট্টগ্রামবাসী বাসুদেব দত্তের অনুজ। এই বাসুদেবের ষষ্ঠ পুরুষ অধঃস্তন বিজয়রাম রচিত একটি কুলজী গ্রন্থ অনুযায়ী বাসুদেব গৌড় রাজ্যের মুসলমান শাসনকর্তাব অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া রাঢ় ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে গমন করেন। ইহার রচনাকাল 'বিন্দুপক্ষ ইন্দুধাতা মঘি মার্গশিরে।' মঘী ১১২০ = ১৭৫৮ খৃষ্টীয় শতকে। কুলজীর বর্ণনা এইরূপ—

যবনের অত্যাচারে রাঢ়ে আর গৌড়ে।
অরাজক হল সাত গ্রামের মাঝারে॥
কাতারে কাতারে কায়স্থ আর বামন।
যে বা যেথা পারে গেল নাহি তার লেখন॥
কাঞ্চনা হইয়া বসবাস দুর্গাপুরে।
বনাইল দত্তকুল হরিষ অন্তরে॥
কিছুকাল সেইখানে বসবাস কৈল।
চক্রশালা বহুতর জমিন ধরিল॥
তার পরে ভুলুয়াতে অরাজক হৈল।
বহুলোক ধনমান জাতি হারাইল॥

---

৬২ বাঙালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায় পৃ ২৬৪

তাহার দক্ষিণে আছে নগর চট্টল।
তথায় আছয়ে এক পুরী চক্রশাল॥
সেখানে রাজাই করে রাকাফ্রি মহান।
মঘরাজা দেবদ্বিজে অতি ভক্তিমান॥
তান খোসনামে মনে মনে হৈয়া খুসী।
বাসুদেব মুকুন্দ হৈলা চক্রশালাবাসী॥

পরে মুকুন্দ নবদ্বীপে গমন করেন—'ব্যাকরণ কবিরাজী পড়িবার তরে।' ইতিহাস হইতে জানা যায় চৈতন্য পূর্ববর্তীকালে গৌড়ে যে মুসলমান অত্যাচার ঘটে তাহা হাবসী রাজাদের শাসনকালের মধ্যে পড়ে। শামসুদ্দিন মুজফ্ফর শাহের সময়েই এই অত্যাচার চরম আকার ধারণ করিয়াছিল। কুলজীর মধ্যে চক্রশালার রাজা 'রাকফ্রি মগ ছিলেন বলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁহাকেই চক্রশালার মগরাজা 'জয়ছন্দে'র সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন।[৬৩]

কিন্তু এই সকল বিবরণ ইতিহাসের ইঙ্গিতমাত্র, তদতিরিক্ত কিছু নহে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই জনশ্রুতির উপর নির্ভর এবং কল্পনার আতিশয্যে যে কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে সেগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা স্থান বিশেষের উল্লেখ হইতে প্রকৃত তথ্য নিরূপণ প্রচেষ্টা নিরর্থক। শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় অবশ্য ইহাও বলিয়াছেন যে, কোনও কোনও বংশের প্রাচীনতর ইতিহাস পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয়, এবং কুলজী-গ্রন্থাদিতে তাহা ব্যবহৃতও হইয়াছে। সেই জন্য সাধারণভাবে অতীত জনস্মৃতির পরিচায়ক রূপে এইগুলি গ্রহণ করিতে বাধা নাই। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের কুলজীগুলির উল্লেখ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে এই নবজাগরণের দিনে বঙ্গদেশে প্রাচীন যুগের সম্বন্ধে কি ধারণা বদ্ধমূল ছিল এবং এই ভিত্তির উপর নূতন সামাজিক ব্যবস্থা কি প্রকারে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রকৃত চিত্র হিসাবেই ইহার মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।[৬৪]

বলাবাহুল্য যে এই জাতীয় কুলজী শাস্ত্রের কাব্যমূল্য কিছুই নাই বলিয়া আমরা সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করিয়া শুধু ইহাদের ঐতিহাসিকতা বিচারের চেষ্টা করিয়াছি।

---

৬৩ 'কবি ভবানীনাথ ও রাজা জয়ছন্দ'—দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সা-প-প ১৩৫৬

৬৪ 'কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা'—রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভারতবর্ষ ফাল্গুন ১৩৪৬

তৃতীয় অধ্যায়

দুর্যোগবার্তা

ইতিহাসাশ্রিত কাব্যের আলোচনায় পূর্ববর্তী দুইটি অধ্যায়ে আমরা রাষ্ট্রকথা এবং রাজকাহিনীর উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণভাবে এই দুই বিষয় অবলম্বনে রচিত সে যুগের ইতিহাসাশ্রিত কাব্যালোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, রাষ্ট্রকথাশ্রিত কাব্যের মধ্যেই পৌরাণিক সুর যেন বেশি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। রাজকাহিনীসমূহের মধ্যেও অবশ্য দেববংশে রাজগণের জন্ম কাহিনী এবং অন্যান্য অপ্রাকৃত ঘটনার উল্লেখ হইতে রচয়িতাদের মানসিক প্রবণতা উপলব্ধি করা যায়।

এই শ্রেণীর রচনা ছাড়া সমসাময়িক যে সকল নৈসর্গিক ঘটনা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহে বিঘ্নের সৃষ্টি করিত তাহার প্রতিচ্ছবিও একধরণের রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের ফলে অসহায় মানুষের দুর্গতি সর্বজনীন। সকল শ্রেণীর নরনারীর জীবনেই বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প প্রভৃতি নৈসর্গিক উৎপাত গভীর রেখাপাত করে। সমকালীন নরনারীর জীবনের উপর অতীতে যে দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিয়াছিল এই শ্রেণীর রচনা আমাদের নিকট তাহারই বার্তাবহ।

নৈসর্গিক ঘটনার উল্লেখ

পশ্চিমবাংলায় দামোদর, ময়ূরাক্ষী, অজয় প্রভৃতি নদনদীর কূলপ্লাবন বাৎসরিক ঘটনা। নদীর প্লাবনে লোকের প্রাণহানি, জিনিষপত্র নষ্ট, শস্যহানি দেশকে শ্রীহীন করিয়া ফেলিত। এই সকল প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের কাহিনী অবলম্বনে সমসাময়িককালে ছোটবড় ছড়া রচনার প্রচলন আছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাহিনী উপকরণ বলিয়া এবং সংস্কার বশেও ছড়ার রচয়িতাগণ এই সকল বিবরণের একটি পৌরাণিক ভূমিকাও সৃষ্টি করিতেন। মানুষের দুর্গতির কারণ বন্যা অথবা দুর্ভিক্ষ যাহাই হউক না কেন, দৈবী লীলা হিসাবে তাহা গ্রহণ করিলেই দুর্গতির ভার যেন অনেকটা লঘু বলিয়া মনে হয়।

প্লাবন

বাংলা দেশে বন্যা সম্বন্ধে একাধিক ছোট-বড় ছড়া রচিত হইয়াছিল। একই বিষয় অবলম্বনে একাধিক রচনা বাংলা কাব্য-সাহিত্যের এক ট্র্যাডিশন। পশ্চিমবাংলার দামোদর নদের বন্যা লইয়াই একাধিক ছড়া

রচিত হইয়াছিল। এই সকল ছড়া রচয়িতার মধ্যে নফর দাস[১], চণ্ডীচরণ[২], দ্বিজলালমোহন[৩], নরসিংহ দাস[৪], দ্বিজরাম[৫], প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ময়ূরাক্ষীর বন্যা অবলম্বনে একমাত্র দ্বিজ দ্বারকানাথ[৬] একটি ছড়া রচনা করেন। দামোদরের বন্যা সম্পর্কে উল্লিখিত ছড়াগুলির বর্ণনভঙ্গী প্রায়শঃই একরূপ, এমন কি অনেক স্থলে যে কোন কারণেই হউক একের রচনাংশ অন্যের রচনাশ্রিত হইয়া আছে। ইহাদের অধিকাংশের ছড়াই ১২০৩ সালের বন্যা অবলম্বনে রচিত হয়। সকল ছড়া রচয়িতাই পৌরাণিক রীতিতে ইন্দ্রের নিকট বসুন্ধরার পাপভার লাঘবের আবেদন এবং সেই আবেদনের ফলে ইন্দ্র কর্তৃক পাপীর বিনাশের জন্য পৃথিবী প্লাবনের আদেশ দানের কথা লিখিযাছেন।

একদিন ইন্দ্রকে কহিল বসুন্ধরা।
আমি ভার সহিতে নারি পাপে হইল ভরা॥
মহাপাপী হৈল লোক শুন মহাবলি।
ধনলোভে করে লোক মিথ্যা গঙ্গাজলি॥
সেই সব লোক জত মোর হয় ভর।
অতেব তোমার কাছে করিলাম গোচর॥
ইন্দ্র কহে বসুন্ধবা কহি তব স্থানে।
পৃথিবি ভাসাব আমি আশ্বিনের বাণে॥
দসঞি আশ্বিনে হব বৃহস্পতিবারে।
সেই দিনে পৃথিবী করিব একার্কারে॥

অবিশ্রাম বর্ষণের ফলে আশ্বিন মাসে দামোদরে প্রাযই দেখা দিত বন্যা।[৭] আশ্রয়চ্যুত নরনারী নিজেদের জীবন রক্ষার জন্য জ্ঞানশূন্যের

১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের পুথি ৪৮৭০
২ " " " ১৩৮৬
৩ " " " ৩৩৭৭
৪ " " " ৩৭৪৬
৫ সা-প-প ১৩০৬ পৃ ৭০
৬ বিশ্বভারতীব পুথি ১২৭
৭ On the 16th Aswin (about 1st October) in 1787, we find that the Damodar burst through its bank near 'Barderea'. On the 26th September 1823 it again rose in high flood and bursting over its banks inundated the country up to the Hooghly river.
Bengal District Gazeteer—Hughly

ন্যায় যে যেখানে পারে আশ্রয়গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিত। টুকরা টুকরা বর্ণনার মধ্যে এই সকল বিপদগ্রস্ত পরিবারের এক একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বাণ দেখি লোক সব হাহাকার ছাড়ে।
প্রাণ লঞা পালায় সব পখুরের পাড়ে॥
সাষুড়ি জামাই ভাগিন বোউ কিছুই না মানে।
গাছে উঠে সাষুড়ির হাতে ধরি টানে।

যাহারা পূর্ব অভিজ্ঞতা বশে বৃক্ষারোহণ না করিয়া কুঁড়ের চালের উপর বসিয়াছিল তাহাদের আবার সমূহ বিপদ—চাল শুদ্ধ সকলে বন্যাস্রোতে ভাসিয়া চলিল। শুধু মানুষ জীবজন্তু নহে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নরনারীর জীবিকার সাজসরঞ্জামাদি বন্যার জলে ভাসিয়া যাওয়ারও এক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। মৃত মানুষ, জীবজন্তুর মৃতদেহের দুর্গন্ধে পথঘাট চলাও শক্ত হইয়া উঠে।

কেহ বলে সব গেল বাচা হৈল মিছা।
গোরু-মানুষ মহিস কত লাখে লাখে ভাসে॥
পথে নাই চলা জায় তার পচা বাসে॥

দামোদরের বন্যার ছড়া রচয়িতা পার্বতী সমীপে নারদমুখে বন্যার এক কৌতুক উদ্দীপক কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। নারদের কথানুসারে সমুদ্র নাকি পৃথিবীর নদনদীগুলিকে আহ্বান করিয়া তাহাদের নিকট পঞ্চাশ বৎসরের বাকী কর দাবী করে! দামোদর নদ তদুত্তরে পৃথিবীতে জলাভাবের কথা জানাইয়া কর প্রদানে অসামর্থ্য জানায় এবং জল হইলে করদানে স্বীকৃত হয়। সমুদ্রের ইচ্ছায় পাতাল হইতে জল উঠিয়া নদনদী প্লাবিত করে।

দামোদরের বন্যা

নারদের ভাষায়ঃ—

ও মামী একদিন সমুদ্র ডাকিল নদিথাল।
পঞ্চাস বৎসর বাকি না হয় ইরসাল॥
এত শুনি সিন্দু হইল ক্রোধে হুতাসন।
পশ্চাত লইব জমা আগে লব পণ॥
নদিনালা বলে গো সাই কহি কর পুটি।
হিসাব কর বাকি বুঝি দিবওটী॥
তখন জবাব দিল দামোদর বাকা।
জার পৃথিবিতে জল নাই কোথা পাব টাকা॥

সমুদ্র বলেন জদি জল হয় ভারি।
দামোদর বলে তবে টাকা দিতে পারি।
এত বলি সমুদ্র ভাবিছে মনে ২।
নদিনালা পরিপূর্ন হৈল কানে ২।

* * *

তখন আনন্দ হৈল দামোদর বাকা।
কাঞ্চননগর ভেসে গেল বারি হৈল টাকা॥

নারদের এই অবান্তর কাহিনীর আসল সুরটি কিন্তু এখানে সবিশেষ লক্ষণীয়। জনগণের দুর্দশা দেখিয়া পার্বতী মহেশ্বরকে যখন বলিলেন যে তাঁহার জন্যই মানুষের এই দুরবস্থা, তখন কিন্তু নারদ আর নীরব থাকিতে পারিলেন না।

নারদ বলেন মামী না বলিলে ভাল।
তবে কেন তোমার পৃতিমা ভেসে গেল॥
গঙ্গার কাছেতে মামী কার নাই বল।
মামার উপরে গেল চৌদ্দ হাত জল॥

নারদের মুখনিঃসৃত এই প্রতিবাদ দুর্গত জনসাধারণেরই মানসিক সংশয়ের অভিব্যক্তি। অন্ধ প্রাকৃতিক শক্তির তীব্রতার নিকট দৈবী-শক্তিও যে তুচ্ছ, ভাগ্যনির্ভর আশাহত মানুষের মনে এইরূপ ধারণাসৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নহে। ভীষণ আকস্মিক, বিপদের সম্মুখীন হইয়া দেবতার উদ্দেশে আকুল প্রার্থনা জানাইয়াও যখন পরিত্রাণ পাওয়া যায় না তখন স্বভাবতঃই মানুষের দৈবশক্তির উপর আস্থা শিথিল হইয়া আসে।

ময়ূরাক্ষীর বন্যা

দ্বিজ দ্বারকানাথের বন্যার ছড়াটি ময়ূরাক্ষী সম্পর্কে। ভণিতায় কবির কিছু পারিবারিক পরিচয় আছে। বন্যাপীড়িত চাষী গৃহস্তের শস্য-সঙ্কট দুর্গতি জনিত মনঃক্ষোভ আমাদের চিত্ত স্পর্শ করে।

করিয়া কলরব করিয়া কলরব কান্দে সব গণিয়া হুতাশ।

* * * *

মাটেতে ছিল ধান মাটেতে ছিল ধান পেয়ে বান আথালি পাথালি
ছিল ইক্ষু অতি দীর্ঘ চেপে গেল বালি॥
রাজকর কিসে দিব
রাজকর কিসে দিব কি খাইব অন্তরে ভাবিয়া
স্থানান্তরে কেহ গেল দুঃখিত হইয়া।

কীর্তিনাশার প্লাবন

১২৭৬ সালে কীর্তিনাশা নদীর রাজনগর প্লাবন সম্বন্ধে একটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে।[৮] জনৈক জয়চন্দ্র ভট্ট রাজকবি স্বরূপ রাজনগরে বাসকালে বন্যাপ্লাবিত রাজনগরের দুর্দশা দেখিয়া এই কবিতাটি রচনা করেন। কবিতাটির মধ্যে কবির রাজনগরের জন্য মমত্ব সুপরিস্ফুট। বন্যাবিধ্বস্ত রাজনগরের কথা শেষ বারের মত স্মরণ করিয়া কবি লিখিয়াছেন—

যা হবার তা হয়ে গেছে আমার কি উপায়।
এরূপ মান্য আমি পাব আর কোথায়॥

রাজসভায় কবি যে সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন এই আক্ষেপোক্তি হইতে তাহা প্রতীয়মান হয়। কীর্তিনাশার বন্যায় রাজনগরের অট্টালিকাসমূহের পরের পর ধ্বংস সাধনের যে বিবরণ এই কবিতাটিতে রহিয়াছে তাহা কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত বলিয়াই অনুমান হয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া কবি লিখিয়াছেন যে—

প্রথম কুন্তের বাড়ী ভেঙ্গে ধরিলেক সুখ-সাগর॥
নিল সুখের সাগর সুখ সাগর মহাসাগর ধরে।
নদীর কি প্রতাপ অসম্ভব প্রাণটি কাঁপে ডরে॥
সাধের মতি সাগর মুহূর্তেক পরে ভাঙ্গিলরে ভাই।
দেখ কোথা গেল রাউত পাড়া আকশার চিহ্ন নাই॥

এইভাবে একের পর এক বিধ্বস্ত স্থানের কবি চিত্রার্পিত উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যে রথখোলার নদীর প্লাবনে এই ঐতিহাসিক রাজনগর তাহার অতুল ঐশ্বর্যশালী অট্টালিকাশ্রেণীসহ বিধ্বস্ত হয় সেই রথখোলার নদীর উল্লেখ প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিয়াছেন—, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পদ্মার এক অতি ক্ষুদ্র শাখা রাজনগরের বহু উত্তর দিক দিয়া ক্ষীণ কলেবরে পূর্ব পশ্চিমে প্রবাহিত হইত। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে, এই ক্ষুদ্র খালের

---

৮ রাজনগরের এই দারুণ দুর্গতির সময় শ্রীহট্টনিবাসী জয়চন্দ্র ভট্ট নামক একজন ব্যক্তি রাজনগরের রাজকবি স্বরূপ বাস করিতেছিলেন; তিনি রাজনগরের এই দুর্দশা দেখিয়া মনের দুঃখে যে সুদীর্ঘ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন অদ্যাপি তাহা বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে ভাট কবিগণ স্বরসংযোগে গান করিয়া দর্শকের মনে একটা বিষাদের ভাব জাগাইয়া দেন।
বিক্রমপুরের ইতিহাস—যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত প ১৬০

অবস্থানস্থলে গ্রামবাসী জনসাধারণের রথোৎসব সম্পাদিত হইত; রথের চক্রের আবর্তনে কালক্রমে উভয়পার্শ্বস্থ ভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও ক্রমে নিম্ন হইয়া যায় এবং বৃষ্টির জল প্রবাহিত হইতে হইতে খালের আকার ধারণ করিয়া রথখোলার খাল নামে অভিহিত হয়। এই উক্তি কেবল অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, কারণ ১৭৮১ সনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার সময়ে, বোর্ড অফ ডাইরেক্টারগণের অনুমত্যানুসারে তৎকালীন বঙ্গদেশের সার্বেয়ার জেনারেল জেমস্ রেনেল্ এফ.আর.এস সাহেব ঢাকার ও তন্নিকটবর্তী স্থান সমূহের যে ম্যাপ অঙ্কিত করেন তাহাতেও এস্থানে কোনও নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।"[১]

রাজনগরের তদানীন্তন রাজা রাজবল্লবকে কবি জরাসন্ধের অবতার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন :—

ঘোর যুদ্ধ করি আপনি শ্রীহরি
জরাসন্ধে কল্লেন বধ
পুনঃ জন্ম তারে দিল রাজনগরে
দ্বিতীয় রাজত্ব পদ

এই পৌরাণিক রূপকের আশ্রয়ে কবি ইতিহাসের কিছু ইঙ্গিত দিয়াছেন। বাংলাদেশে ইংরেজদের রাজ্যবিস্তারের অন্যতম সহায়ক ছিলেন রাজা রাজবল্লভ। তাঁহার এই দেশদ্রোহিতার উচ্চ নিন্দাবাদ রাজসভার কবির পক্ষে সম্ভব ছিল না তাই তিনি রাজার এইরূপ আচরণ বিধাতার শাপ বলিয়া রাজার মনোরঞ্জন করিয়াছেন।

জানি কোন শাপে জরাসন্ধ ভূপে
জন্মিল রাজনগর মাঝ
যাঁহার কৃপাতে বাঙ্গালা মুল্লুকেতে
প্রকাশ পাইল ইংরাজ॥
নবাবী আসন করি বেদখল
ইংরেজকে রাজত্ব দিল।
ধন্য মহারাজ ডঙ্কা ভব মাঝ
রেখে পরলোক হল॥

রাজসাগর, কৃষ্ণসাগর প্রভৃতি বিশাল দীঘি, জনাকীর্ণ পল্লী, চতুষ্পাঠি দেবালয় শোভিত সৌধকিরীটিনী ঐশ্বর্য্যশালিনী রাজনগরের প্লাবনবিধ্বস্ত

১ বিক্রমপুরের ইতিহাস—পৃ ১৫২

শ্রী কবিকে বিশেষ বিচলিত করিয়াছিল। কবি তাই দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে গাহিয়াছেন :—

এমন চমৎকার কীর্ত্তি আর হবে না ভুবনে।
এমন সোনার নগর কীর্ত্তি সাগর পাব কোন স্থানে॥
কত দেশ-বিদেশী লোক আসি দেখে বলে যায়।
নদী কি তরঙ্গে কীর্ত্তি ভেঙ্গে রাজ্য লয়ে যায়॥

কবি লিখিয়াছেন যে ছিয়াত্তর সালের প্লাবন তাঁহার জীবদ্দশায় ঘটিলেও কীর্ত্তিনাশার বিক্রমপুরের যাবতীয় কীর্ত্তিনাশের অপপ্রচেষ্টা এই প্রথম নয়। তিনি শুনিয়াছেন যে ১২২৫ সালেও কীর্ত্তিনাশার বন্যায় বিক্রমপুর প্লাবিত হইয়াছিল। কবির ধারণা যে কীর্ত্তিনাশার খলস্বভাব বলিয়া মধ্যে কিছুকাল শান্ত থাকিলেও পুনরায় ছিযাত্তর সালে কীর্ত্তিনাশা ভাঙ্গনের নেশায় মত্ত হয়।

শুনি পাঁচিশ সালে ভাঙ্গিল দু'কূলে
কীর্ত্তিনাশা হয়ে খল।
আড়াকুল বেড়িয়া গোকুলগঞ্জ ভাঙ্গিয়া
মুলফৎগঞ্জ কল্লে তল॥
চাঁদ কেদাব রায়ের কীর্ত্তি চমৎকার
ভেঙ্গে নিল কোটীশ্বর।···
পূর্ব্বে এই মত ভেঙ্গে নিযে কত
স্থির ছিল কিযৎকাল।
পুনঃ ছিযাত্তর সালে ভাঙ্গনি আরম্ভিলে
হইল তরঙ্গ উত্তাল॥

কবি বিক্রমপুরে আসিযা বাস করিলেও তাঁহার বাসস্থান অন্যত্র ছিল। কবিতাটির শেষাংশে ভনিতায কবি রাজনগবে ধ্বংসের প্রচণ্ডতার তুলনা প্রসঙ্গে কাছার জেলার যে ভাবে উল্লেখ কবি করিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহাকে কাছার জেলাবাসী বলিয়া অনুমান হয়।

ভট্ট জয়চন্দ্রের এই নিবেদন শুন সর্ব্বজন।
কাছার জিলায় ভূমিকম্পে এরূপ করয॥

দুর্ভিক্ষ

বিপদ কখনো একা আসে না—এই আমাদের দেশের জনশ্রুতি। ইহা একেবারে অমূলকও নহে। সাধারণতঃ অতি বৃষ্টির ফলে নদীতে দেখা দেয় বন্যা। প্লাবনের ফলে শস্যহানি এবং ভূমির উর্ব্বরাশক্তির অপচয়ের ফলে

দুর্ভিক্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে। বৃষ্টির কার্পণ্যেও জনপদ দুর্ভিক্ষের পদচিহ্নে বিক্ষত হয়।

ত্রিপুরা রাজ্যের গঙ্গামোণ্ডল এবং বরদাখাত এই দুই পরগণান্তর্গত 'ডাকাইতা কোনা' নামক নদীর প্লাবনে দেশে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় সে সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ ছড়া পাওয়া গিয়াছে।[১০] ছড়ায় রচয়িতার নাম এবং রচনাকাল কিছু পাওয়া যায় না। দুর্ভিক্ষের কারণ যে ডাকাইতা কোনা নদীর প্লাবন ছড়াকার একাধিক স্থলে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন :—

প্রথম য়াসাড় ম্নাসে গাঙ্গে দিল টান।
বড় ২ গীরস্তে বেচিল পুরান ধান॥
য়াউস হইব কার ভরসা আছিল খানি।
আচম্বিতে আসিল ডাকাইতা কোনার পানি॥

অন্যত্র,— দশ পাঁচ মনিষ্য মরে এক একঘরে॥
আইল ডাকাইতা পানি বংশ মজাইবারে॥

ছড়াটির শেষভাগে হোসেন আলি নামক এক স্থানীয় জমিদারের বন্যার ফলে ত্রিপুরা ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রার উল্লেখ আছে।

ধর্মভাবে আছিল সাহেব হোসন আলি।
কৈলকাত্তা চলিয়া গেল বালজীরে দি মালী॥
ছোট বর বেয়ানে বিকালে লএ কালির নাম।
সাহেবের হইত জমিদারী দেওয়ান দুল্ল্ভরাম॥
ধর্ম্ম দেওয়ান দুল্ল ভরাম জানে নানা ছন্দি।
য়াগে গিয়া কৈলকাতা বালজীরে কৈল বন্দি॥
মরিয়া লরাইল রায়ত রাজ্য কৈল খিল।
কাগজ বুজিয়া তারে বিদায় করিল॥

ছড়াটির সংগ্রহকর্তা লিখিয়াছেন—এই ছড়ার শেষ পৃষ্ঠায় হোসেন আলি নামক যে জমিদারের নাম করা হইয়াছে, তিনি পাটনার নবাববংশ সম্ভূত মীর্জা হোসেন আলি। ইঁহার পূর্বপুরুষগণ ত্রিপুরায় ইহাদের বিপুল জমিদারীর শাসন সৌকার্য্যার্থ পাটনা হইতে বরদাখাত পরগণার অন্তর্গত খোল্লা গ্রামে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। ইঁহারা মোগল পরিবারভুক্ত ছিলেন। বংশবৃদ্ধির সহিত ইহাঁদের কেহ কেহ পাটিকারা পরগণার অন্তর্গত বড় কামতা নামক স্থানে আসিয়া বাস করিতে

১০ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ পত্রিকা ১৯২৩

ত্রিপুরার ছড়া

থাকেন। থোল্লা ও বড় কামতায় ইহাদের সুবৃহৎ সরোবর, ইষ্টক প্রাচীর, মসজিদ ও পাকা কবরাদির ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপিও বর্তমান রহিয়াছে।[১১] ত্রিপুরার এই দুর্ভিক্ষের সময় নির্দেশ সূত্রে ছড়ার সংগ্রহকর্তা দশশালা বন্দোবস্তের কাগজপত্রাদিতে এক মীর্জ্জা হোসেন আলির নামের সহিত ছড়ায় উল্লিখিত হুসেন আলির কাকতালীয় নাম সাদৃশ্য দেখিয়া ছড়াটি দশশালা বন্দোবস্তের পনের-ষোল বৎসর পূর্বে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ বাংলা ১১৭৬ সালে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ ঘটে সে সম্পর্কেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই অনুমান যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না। ত্রিপুরার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে রাজমালা হইতে কিছু বিবরণ সংগ্রহ করা যায়। রাজমালা অনুযায়ী :—

এগার'শ চৌরানব্বই ত্রিপুরের সন।
অন্নাভাবে প্রজা ক্ষিতি হইল নিধন।
মূল্য দিয়া অন্ন নাহি পায়ে কোন স্থান।
পিতাপুত্র সম্বন্ধেতে অন্ন নাহি দান॥
দুঃখিত কাঙ্গালী জত স্নেহ দূর করে।
ইষ্ট মিত্র পুত্রকন্যা ত্যাগয়ে সত্বরে॥
সহস্রাবধি মৃত্যু হয় অন্নের অভাবে।
বিনামূল্যে বিক্রী লোক দেখি অসম্ভবে॥
এই মতে দুই বৎসর দুর্ভিক্ষ আছিল।
তারপর সনে রাজ্যে কিছু ধান্য হৈল॥
জলধৌত ধান্য নষ্ট দুর্ভিক্ষ যেমত।
এগার'শ পচানব্বই হইছে তেমত॥

ত্রিপুর ১১৯৪ সন অর্থাৎ ১৭৮৪ খৃষ্টীয় শতকে রাজধরমাণিক্যের রাজ্যপ্রাপ্তিকালে এই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কিন্তু ইহার পূর্বে ১১৭৬ সালে অর্থাৎ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কোন দুর্ভিক্ষের উল্লেখ রাজমালার মধ্যে পাওয়া যায় না।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণের দুর্দশার বর্ণনা উভয়ত্রই একরূপ। পূর্বোল্লিখিত ছত্রটিতে অবশ্য এই দুর্দশার বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে। দুর্ভিক্ষের সূত্রপাতের পর হইতে মাসের পর মাস যতই দিন অতিবাহিত হয় খাদ্যাভাবের ফলে

১১ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ পত্রিকা ১৯২৩

মানুষের অন্নকষ্ট ততই প্রকট হইতে থাকে এবং ধীরে ধীরে 'বড় বড় ভাল মানুষ' অর্থাৎ সম্পন্ন গৃহস্থগণও কষ্টের সম্মুখীন হন। দীর্ঘদিন স্থায়ী দুর্ভিক্ষের মধ্যেও নিম্নশ্রেণীর লোক কিভাবে সালুক-গোজ খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিল ছড়াকার সহানুভূতির সহিত তাহা বর্ণনা করিয়াছেন :—

মাঘ গইয়া গেল আসিল ফাল্গুন।
কাঙ্গাল ঘরের সবের না ছাড়ে আগুন॥
সালুক আনে গেজ আনে আনএ চেছরা।
দিনঅন্তে রাতে বেতারা রান্দি খাএ হোগরা॥

আকাল-চরিত্র

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য রচনা হইতেছে দ্বিজ নফরের 'আকাল-চরিত্র।'[১২] পুথিটি খণ্ডিত (পত্র সংখ্যা ৩-১৪, ১৮, ৩৭-৩৮)। প্রথম পত্রটি না থাকিলেও শেষ পত্র হইতে জানা যায় যে, পুথির লিপিকাল ১২৭৪ সাল। 'ইতি আকালচরিত্র সমাপ্ত সন ১২৭৪ সাল তাং ১৭ ভাদ্র।' রচয়িতা দ্বিজ নফর পৌরাণিক পদ্ধতিতে আকাল-অবতার কাহিনীর মাধ্যমে বাংলা ১২৭৩ সাল, ইংরাজী ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের দুভিক্ষে'র এক বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। কবি একাধিকস্থানে সুস্পষ্টভাবে আকালের সময় নির্দেশ করিয়াছেন—

৭৩ তিহোত্ত'র সালের উপর আকাল হৈছে দণ্ডধর : ঈশ্বরের অনুমতি পায়্যা।

অথবা— বিধাতা জন্মের কালে সন ১২৭৩
বার তিহোত্ত'র সালে পরাধীনের ভাগ্যে কি লিখীল।
অন্ন সুখ জাহা হোক লক্ষিহিন জত লোক পেটভরা য়ন্ন' না পাইল॥

১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে বাংলা এবং উড়িষ্যায় যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ ঘটে তাহার কারণ নির্ধারণের জন্য একটি তদন্ত কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।[১৩] এই কমিটি কর্তৃক ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত

১২ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি ৪৮৭০

১৩ The whole subject of the famine in Orissa and part of Bengal proper came under minute investigation. The Governor General requested Sir C. Beadon to appoint Mr. H. L. Dampier to make an enquiry, but about the same time a despatch from the Secretary of State, of 9th October 1866,ordered a similar enquiry and under his instruction an enlarged com-

বিবরণের সংক্ষিপ্ত সার হইতে যে তথ্যাদি সংগৃহীত হয় তাহার সহিত আকাল-চরিত্রের বর্ণনাগত সাদৃশ্য আছে। আকালের কারণ উল্লেখ-প্রসঙ্গে দ্বিজ নফর লিখিয়াছেন—

সুন ২ সর্ব্বজন ইবে করি লিখন আকালের পূর্ব্বব্যস্তা কথা।
না জন্মিতে আকাল হৈল জত জঞ্জাল বাহাত্তোরি শ্রাবণের বাত্রা॥
পুরনায় পাচকুড়ি দর মহানন্দে ছিল নর দেবতার দেখীআ সুচার।
ভাদ্রে গেল আখমাড়া টাকায় ধান্য অর্দ্ধ আড়া তাথে সুখ বাড়িল আপার॥
আশ্বিনে পার্ব্বন পর্ব্বে মহানন্দে ছিল সর্ব্বে মনে ভরসা হইবেক বৃষ্টী।
সে বোধি না জল হইল ধরম কৈল্য টাকা কি বেরাল্য মাটী॥

এই প্রসঙ্গে দুভিক্ষ তদন্ত কমিশনের বিবরণ উল্লেখণীয়—

The rainfall of 1865 was scanty and ceased prematuredly, so that the outturn of the great crop of winter rice, on which the country mainly depends, was reckoned at less than a third of the average crop. Food stocks were low, both because export had been unusually brisk of late and because the people had not been taught by precarious seasons to protect themselves by retaining sufficient stores at home.'[8]

দ্বিজ নফর লিখিয়াছেন যে 'আকাল চরিত্র' তাহার নিজ দেশেরই প্রত্যক্ষ বিবরণ, অন্য দেশের নহে। কিন্তু স্বীয় দেশের নামোল্লেখ তিনি কোথাও করেন নাই। তথাপি তাঁহার বিবরণের মধ্যে দুর্ভিক্ষের কারণ স্বরূপ 'বাহাত্তোরি শ্রাবণের বাত্রা'র উল্লেখ হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী ছিলেন। এইরূপ অনুমানের স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি হইতেছে, বাংলা দেশে ১২৭৩ সালের দুর্ভিক্ষের প্রকোপ (আকালচরিত্রের বর্ণনানুযায়ী) মেদিনীপুরেই সর্বাধিক অনুভূত হয়

mission was appointed in December 1866, by the Government of India. The Commission's report was dated 6th April 1867, after they had visited Orissa and Midnapur and recorded the statements of 130 persons.

Bengal under the Lieutenant Governors.
C. E. Buckland Vol 1. p 329

এবং ১২৭৩ সালের শ্রাবণ অর্থাৎ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক ঝড় এবং ঘূর্ণিবাত্যা মেদিনীপুর জেলার উপর দিয়াই প্রবাহিত হয়।[১৫] আকাল-চরিত্রের বর্ণনানুযায়ী, আশ্বিন মাসে যখন এই দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হয় তখন সাধারণ লোক ইহা অনুধাবন করিতে পারেন নাই, কিন্তু মহারানী অর্থাৎ ইংরেজ সরকার ইহা বুঝিতে পারিয়া ধান সংগ্রহের নির্দেশ-পরোয়ানা জারী করেন।

আকাল জে ক্ষিতিতলে জন্মিল সরদকালে সংশারেতে না জানিল কেহ।

* * *

গত সনে মহারানি সর্ব্বজ্ঞাত য়ন্তর্জ্জামি জেন্যে ছিল এ সব কারণ।
দুর্ভিক্ষি আকাল হবে লোকে বহু দুস্ক পাবে অতেব কর্য়ে পরয়ানা লিখন॥
লিখেছিলে না অই সুক্র আছে মোর স্থাপীত বস্তু তাহাতে খরিদ কর ধান।
আগত বৎসরে প্রায় কুরানেতে জানা যায় ধান্যের হবেক বোড টান॥
কর্য়ে ঐকথা লিখন সর্ব্বদেশে প্রচারন কোরিলেন ধর্ম্ম অবতার।
তাথে জার হৈল জ্ঞান খরিদ করিল ধান আকালেতে সে কৈল ব্যাপার॥

প্রসঙ্গক্রমে কবি পশ্চিমবঙ্গবাসীর অদূরদর্শিতার ফলে দুর্ভোগের এবং পূর্ববঙ্গের ব্যবসায়ীর পাটোয়ারি বুদ্ধির তারিফ করিযাছেন—

পূর্ব্ব দেশবাসী জত সে পরআনা শ্রোতমাত্র সাজাইল বলদ তরণী।
এদেসীঅ লোকজন দেখে ধান্য দর কম মনে অেই জুক্তি অনুমানী॥
আস আদায় পোউষ হাথে ধান্য জন্মিআছে ক্ষেত্রে কেহ গর্ভে
কেহ এল ফুলো।
না পাব য়েমন বিকি কি হবে ধান্য রাখি পাব ধান পশলাক বৃষ্টী হল্যে॥

১৫ The worst Famine, of which there is detailed information was that of 1866 the great Orissa famine, from which Midnapore suffered more than any district in Bengal. In 1864, a large area had been desolated by a cyclone and storm-wave. In September, 1864 it was reported that a fourth of the Doro and Gumgarh pargana was lying waste for want of men to cultivate it, while in Hizli, which had suffered most severely from the cyclone, the ryots were suffering from want of grain.

The District Gazeteer of Bengal—Midnapur.

এই জুক্তি কয়্যে ধনি ধানের দর করিল কমি আরম্ভিল বেচিবার ধান।
প্রতিদিন কমে দর সুন্য হোল ধান্ন ঘর দুখী লোকের জন্ন পেটের টান॥

কবির এই ইংরেজ-প্রশস্তি কিন্তু অকারণ। প্রকৃতপক্ষে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সরকারের পক্ষ হইতে কোনরূপ সতর্কীকরণের ব্যবস্থা হয় নাই। Famine Commission-এর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, এমন কি সরকারী কর্মচারিগণও এ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না।[১৬]

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে দ্বিজ নফর ঈশ্বরের অবতাররূপে আকাল-চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। পৌরাণিক কাব্য রচয়িতাদের পদাঙ্ক অনুসরণে দ্বিজ নফরও লিখিয়াছেন যে কলিযুগে পৃথিবী পাপের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া ঈশ্বরের নিকট ভারমুক্তির আবেদন জানাইলে শ্রীহরি স্বয়ং আকালরূপে আবির্ভূত হইলেন—উদ্দেশ্য এইভাবে পাপভার পূর্ণ হইলে পুনরায় কল্কিরূপে আবির্ভূত হইয়া ধরিত্রীকে পাপভার হইতে মুক্তি দিবেন। কবি পৌরাণিক উপমা সহকারে এই আবির্ভাব-কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন—

জেমন দ্বাপর জুগে কংসের বধের লাগে দেবগণ বৈল শুন্য বানী
ভোজপতি কংস দুষ্ট নিজ রাউ কৈল নষ্ট অধর্ম্ম কৈল রাকাব বাণী সুনী॥
তেমত কোলির নরের পাপ বাড়াবার তরে আকাল অবতার কৈল হরী।
পাইআ জোঠর কষ্ট কোলির মানব নষ্ট ধর্ম্ম কর্ম্ম সব পরিহরী॥
মহাপাপ উপার্জ্জিআ এশ্বরির ত্যাগীআ জনম লভিবে পুনর্ব্বার।
কোল্কিরূপে নারায়ণ জবে করিবে নিধন সেই দিন হইবে উদ্ধার॥

পরবর্তী কযেক ছত্রে এই চরিত্র বর্ণনের জন্য আকাল কর্তৃক কবিকে আদেশ প্রদান এবং এদেশবাসীদের ধানের কদর বুঝাইবার জন্যই আকালের আবির্ভাবের বিবরণ পাওয়া যায়।

---

১৬ ...It had. to be dealt with a body of officials necessarily ignorant of the signs of its approach. Un-prepared to expect it and inexperienced in the administration of relief measures, nor were the native inhabitants of Orissa in any respect more aware of what was comming out here than the British officers.

Bengal under the Lientenant Governors.

—C.E. Buckland Vol. I. p 329

এই বহুশ্রুত দুর্ভিক্ষের কারণ সম্বলিত তদন্ত বিবরণ হইতে দুর্ভিক্ষের মোটামুটি কারণ ব্যতীত এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কিছু জানা যায় না। সেই তুলনায় সমসাময়িক বর্ণনাদাতা দ্বিজ নফরের আকাল-চরিত্র হইতে দুর্ভিক্ষের পূর্বের এবং দুর্ভিক্ষকালীন দেশের অবস্থা সম্বন্ধে বহু কথাই জানিতে পারা যায়। দুর্ভিক্ষের পূর্বে দেশে ধানের কিরূপ দর ছিল এবং দুর্ভিক্ষের ফলে সেই মূল্য বৃদ্ধি পাইলে জনগণের কিরূপ অসুবিধা হয় কবি পরের পর তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের পূর্বে ধানকে কেহ মূল্যবান সামগ্রী বলিয়া মনে করিত না—টাকাপ্রতি দেড় আড়া ধানের ক্রয়-বিক্রয় চলিত এবং চাষী খাজনা পরিশোধকালে ইহার বেশি ধান দিতেও কাতর হইত না, কিন্তু দুর্ভিক্ষের ফলে দুষ্প্রাপ্য সেই ধানের কদর সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়—

জে ধান ইন্দুর গর্ত্তে মির্ত্তিকার সোহিতেত গোলিত হইথ দিনে ২।
আকালে শেশব ধান্য করি লোক বহু মান্য গুপ্তে থুইল ঘর দালানে॥

জমিতে যাহারা 'জন' খাটিত আকালের ফলে চাষী অপেক্ষা তাহাদের অসুবিধা হয় বেশি, কারণ পূর্বে তাহাদের শ্রমের বিনিময়ে ভাত-মুড়িই জুটিত, পয়সাকড়ি পাইলে অবশ্য তাহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইত, কিন্তু আকালের সময় পারিশ্রমিক হিসাবে লোকে ধান দেওয়া বন্ধ করিয়া পয়সাকড়ি দিতে থাকিলে তাহাদের মনঃপূত হয় না।

তখন কর্ম্মের করিঅ দেড়ি শারার্থ্য ভাতালি
মুড়ি, পয়শাকড়ি পেল্যে আনন্দিত।
আকালে ধান্য না জুটায়, জন লোকে পয়সা
দেআয়, তাদের মনেহঅ নাঞি পূত॥

ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ধানের দর হয় অগ্নিমূল্য কিন্তু ইহার ফলে গরীব ক্রেতার ঘরে হাহাকার উঠিলেও বিক্রেতার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়।

লক্ষিহিনের কি লঞ্চনা পয়শার ধান্যে
চার্‌আনা, টাকার ধান্যে হর্ল্য শোল টাকা।
বেচিতে য়াছিল জার মহানন্দ হর্ল্যতার
কিন্তে খায়ার পড়িল হাচাকা॥
জে ছিল খড়ার দানা সে চাল হল্য কানের
সনা, ভুমে রাখিতে না হয় প্রত্যয়।

আকালের সৃষ্টি-তত্ত্বে কবি লিখিয়াছেন—

ধনবানের গর্ব্ব জত শেসব ইশ্বর দর্ত্ত ঔসর্জ্যমদেতে সে মর্ত্ততা।

কবি নিজেই এই তত্ত্বের কল্পিত বিরোধী পক্ষের সম্ভাব্য যুক্তি অনুমান করিয়া পরবর্তী ছত্রে তাহার উত্তরদান করিয়াছেন—

ইহা সুন্ন্যে কোনজন জোদি কর জিজ্ঞাষন পরের অধিনগণ কবে
কৈল কোন অহঙ্কার কিসের হল্য ছার খার তার তর্ত্ত বিবরি কহিবে।
তার প্রত্যুত্তর কহি জে গৌরব কৈল জে দণ্ড কৈল জার।
সে সকল আছে দেখা তে কারণে জায লেখা বুঝ সবে করিয়া বিচার॥
পর অন্নে যে পালিত পব কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত পরধনে ধনিন জে জনা।
তার গর্ব্বে বসুমোতি কম্পিত হইল যতি অতেব এসব বিড়ম্বনা॥
জনলোকের জে গৌবব কি কব সে কথা সব দিন মাহিনায মাগজনী কৈল।
ব্রাহ্মণ সর্জ্জন আদি জে শকল চাষ আবাদি তাদের চাষ করা ভার হল্য॥
আর এক বিশম ছিল জনের বেতন কামিন নিল তবু তার ক্ষেত্র লৈল চির্ত্ত।
চাষা বহু জত্ন করে সর্ব্ব দিবা খাটাবারে তরে মন ঠিকার নিমির্ত্ত॥

কবির বিশ্বাস যে, ধানের অমর্যাদার ফলে ইন্দ্রের ইচ্ছায় ধানের অনাটন ঘটে। এই বিশ্বাসবশেই দুর্ভিক্ষের নৈসর্গিক কারণগুলি কবি যথারীতি অলৌকিক এবং দৈবেচ্ছা বলিযা মনে করিযাছেন।

পশলাক বৃষ্টি জন্য মর্ত্যে গেল শব ধান্য ইন্দ্র কৈল এসব প্রমাদ॥
...কৃষ্ণ বর্ণ হিন বোম কি বিশম ক্রমীগণ কুথা হত্যে এল্য॥
...দেখে রঙ্গ অনুমানি সে কিছু ষরূপ ক্রমী পুজ্যপুত শনী গ্রহবাজ।
দেখে জিবের দুষ্টপন কালে কৈল আকর্ষণ জাথে দুঃখ পায ক্ষিতি মাঝ॥
নতুবা এমত কালে কে দেখেছে কন কালে অথবা সুন্যাছ কোন জনা।
পাকা ধান্য কাটাব কালে না সুনীলা লোকে বলে ক্রমি কবে এসব বিড়ম্বনা॥

কবি স্পষ্টই বলিযাছেন যে অন্যে যাহা খুশী মনে করিতে পারেন কিন্তু নিজের কৃষিক্ষেত্রে এই সময়ে পোকার উপদ্রব দেখিয়া তাঁহার ইহাই মনে হইয়াছে। এই অপ্রত্যাশিত উপদ্রবে পাকা ধান নষ্ট হওয়ায় চাষীর সংসারে যে হাহাকার উঠে কবি স্বল্প কথায় সে কাহিনী পরিবেষণ করিয়াছেন। ঠিক ইহারই বিপরীত চিত্র পাওয়া যায়—যাহারা পূর্ব হইতে ধান সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল দেশে অনাটনের সুযোগে গোপনে চড়া দামে বিক্রয়েচ্ছায়—সেই লোভী ব্যবসায়ীদের বর্ণনায়। এই অতিরিক্ত

লাভেচ্ছু ধান বিক্রেতাদের কাহিনীর মধ্যে কবি সমসাময়িক এমন এক শ্রেণীর অর্থলোভী মানুষের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন—যাহাদের নিকট অর্থই পরমার্থ।

গুরু থাকে দ্বারে বস্যে ধান্য কিনিবার আযে তারে বলে ধান্য নাঞি ঘরে।
গুরু জায় বৈমুখ হয়্যা চোর এন্যে পয়সা লঞা তারে ধান্য দেই বেশি দরে॥

বলা বাহুল্য আজিকার সমাজ-জীবনেও এই শ্রেণীর লোক ঠিক এইভাবে অর্থ উপার্জন করিতেছে।

পুঁথির শেষাংশে কবি আকালের যে 'বয়ক্রম তথ্য' লিখিয়াছেন, তাহা শুধুই কৌতুক-উদ্দীপক নহে, তন্মধ্যে দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হইতে অবসান পর্যন্ত এক মূল্যবান কালানুক্রমিক বিবরণ আছে। কবির ভাষায়—

ইবে সুন সর্ব্বজন করি কিছু লিখন আকালের বযক্রম তর্ত্ত।
উক্তি যাহা হয় মনে তা লিখিএে কলমে জ্ঞান কিছু নাই সর্ত্তনত্ত॥
শ্রাবণে আকালের মাতা হইলেক ঋতু স্নাতা
ভাদ্রে আকাল নিজ মাত্রিগর্ব্বে।
আশ্বিনে হোল্য প্রসব তবু না জানে সব
আকাল যে জন্মিল প্রিথিবে॥
কার্ত্তিকেতে আকাল হইলেক বাল্যকাল বাচাল হইল অগ্রাণেতে।
পৌশে দুইয়েক পদ চলে আকাল আনন্দে মাঝে নর
লাগিল হিংসিতে॥
ফাল্গুনেতে আকাল হইল জুবত্তকাল পরিবার করিল বোইত্রে।
বৈশাগেতে আকালের পুত্র পৌত্র হোল্য ধের
ব্যাপিত করিল সংসারেতে॥
জ্যোষ্টেতে সকল জিবে করিলেক পরাভবে
আসাড়ে নিষ্কণ্ঠে করে ভোগ॥
শ্রাবণে হোল্য বৃর্ধকাল করিল অনেক·· আকালে ধরিতে জরা রোগ॥
·· ভাদ্রের পনের দিনে বুঝা গেল অনুমানে আকাল যে গেল যমঘর॥
আকালের পুত্রপৌত্র আশ্বিন কার্ত্তিক পর্য্যন্ত
কথোক জিবের কোরল্য অধিকার।
অগ্রাণে আকালের বংশ হইতে সব নির্বংশ তবে সুখে বঞ্চিল সংসার॥

জানা যায় যে, জুন মাসের শেষদিকে মেদিনীপুরের এই দুর্ভিক্ষ-

পীড়িতদের জন্য আঠারোটি সাহায্য কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে দুর্ভিক্ষ প্রকট হইয়া উঠে। নভেম্বর মাসের শেষদিকে সাহায্য দান বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।[১৭] দ্বিজ নফর প্রদত্ত আকালের পূর্বোদ্ধৃত বয়ক্রম তথ্যের সহিত ইহার মোটামুটি কালগত ঐক্য আছে বলা যায়।

বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের ছড়া ব্যতীত চট্টগ্রামের এক ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিবাত্যা সম্বন্ধে একটি ছড়ার বিবরণ আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রণীত বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণের মধ্যে পাওয়া যায়। ছড়াটির চরণ সংখ্যা ৬২। ছড়া রচযিতা ছড়াটির কোন নামকরণ করেন নাই। অবশ্য আরম্ভে তিনি বলিয়াছেন—বিষ্টি অগ্নি মারুত কথা শুন দিয়া মন। এই ঘূর্ণিঝড়ের অতঃপর সাল তারিখ সময সম্বলিত এক বর্ণনা পাওযা যায়।

ঘূর্ণিবাত্যা

এগার শত সাত পঞ্চাশ মঘি জ্যৈষ্ঠ মাস।
সন্ধ্যাকালে বুধবার প্রতিপদ প্রকাশ॥
তৃতীয় বিংশতি তারিখ জ্যৈষ্ঠ মাস ছিল।
পূর্ব্বভাগ হোতে পুনি মারুত উঠিল॥
এই সনেতে অগ্নি উঠিল চারিভিত।
সর্ব্বদেশেব ঘব সব ভাঙ্গিল ত্বরিত॥

ভণিতা হইতে জানা যায, রচয়িতাব নাম নবোত্তম কেবাণী। ছড়ার পুষ্পিকা হইতে লেখকের পরিচয এবং ছড়ার রচনাকাল সম্বন্ধে কিছু সংবাদ পাওযা যায।

"শাণ্ডিল্য গোত্র গোবিন্দবাজ তনয শ্রীনরোত্তম কেরাণী দে অস্য তান পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৈলাশচন্দ্র দুহস্বাকিঅবহি। সা কধুরখীল (জেলা চট্টগ্রাম) ইতি সন ১১৭৯ মঘি তারিখ ৩ ফাল্গুণ।" অতএব এই ছড়ার নির্দেয রচনা কাল হইতেছে ১২২৪ সাল অর্থাৎ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ।

১৭ By the end of June, 18 relief depots were opened. The famine reached its height in the months of August and September. From the begining of October the distress began to abate rapidly with the promise of aboundant harvest. Relief operations were brought to a close by the end of November.

Bengal District Gazeteer—Midnapore. Ch. VI

ভূমিকম্প সম্বন্ধে অনুরূপ একটি ছড়ার বিবরণও বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণের মধ্যে আছে। ছড়াটি হইতে ভূমিকম্পের সাল ব্যতীত উল্লেখ-যোগ্য কিছু পাওয়া যায় না।

ভূমিকম্প

নেত্র পাখা দুই চন্দ্র বৈসে একস্থান।
মঘী সন আছিলেক এই পরিমাণ॥
মধুমাসে ত্রিবিংশতি দিবস সুন্দর।
শুক্ল পক্ষ দশমীতে ভার্গব বাসর॥
বেদ দণ্ড বেলা স্থিতি লোকের বিদিত।
অকস্মাৎ ভূমিকম্প হৈল পৃথিবীত॥

হেয়ালী-আশ্রিত মঘী সন হইতে এই ভূমিকম্প ১২৬৮ সাল অর্থাৎ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হয় বলিয়া জানা যায়। ভণিতায় ছড়া রচয়িতার যথা-রীতি নামোল্লেখ আছে—

এই বাক্য কত দিন স্মরণ কারণ।
জগদীশ সিংহে কহে তাহার বচন॥

বলাবাহুল্য কেবলমাত্র পূর্বতন ঘটনার স্মৃতি হিসাবেই এই ছড়াগুলি আলোচ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

সংঘাতচিত্র

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের রাষ্ট্রীয় ঘটনা অবলম্বনে লিখিত একাধিক কবিতা-ছড়ার মধ্যে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা এবং ছোটখাটো যুদ্ধবিগ্রহের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গে নিযুক্ত কর্মচারীদের চিঠিপত্রাদি হইতে জানা যায় যে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে একশ্রেণীর নাগা সন্ন্যাসী ফকীর ভারতের বিভিন্ন স্থানে কুম্ভমেলা, মহাস্থান, সাগর, পুরী, নবদ্বীপ প্রভৃতি তীর্থস্থানে সমাগত পুণ্যকামী যাত্রীদের টাকাকড়ি লুঠতরাজ করিত।[১] এই সব সন্ন্যাসী সশস্ত্র হইয়া বিচরণ করিত এবং লৌহ শলাকা, বর্ম প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত।

লুটেরা ফকীর

এইরূপ লুটেরা সন্ন্যাসীদের একজন প্রধান সর্দাররূপে মজনু শাহের কীর্তিকলাপের উল্লেখ আছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উত্তরবঙ্গের তদানীন্তন কর্মচারীদের চিঠিপত্রের মধ্যে। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাহিরেও বিভিন্নস্থানে মজনুশাহের অত্যাচার এবং কোম্পানীর সিপাহীদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ চলে।

পঞ্চানন দাস কর্তৃক ১২২০ সালের ১৪ই কার্তিক রচিত "মজনুর কবিতা" নামক একটি ঐতিহাসিক ছড়া রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়

---

১ 'A set of lawless banditti,' wrote the council in 1773, 'known under the name of Sannyasis or Fakirs have long infested these countries and under the pretence of religious pilgrimage have been accustomed to traverse the chief part of Bengal, begging, stealing and plundering wherever they go and as it best suits their convenience to practise. ...They always travel with weapons, usually a metal lock and sword and shield and that these weapons are not carried in vain has been shown in many instances.

Sannyasi Fakir raiders in Bengal—J. M. Ghosh p 9

১৩১৭ সালে প্রকাশিত হয়। মজনু ফকীরের নৃশংস অত্যাচারের ফলে জনগণের মনে যে কিরূপ আতঙ্কের সৃষ্টি হয় মহাস্থানের ছড়ায় আমরা তাহার কিছু নিদর্শন পাইয়াছি। এই ছড়াটিতেও মজনু-ভীতির উল্লেখ প্রারম্ভেই পাওয়া যায়।

মজনুর কবিতা

শুন সভে একভাবে নৌতুন রচনা।
বাঙ্গালানাশের হেতু মজনু বারণা॥
কালান্তক যম বেটাক কে বলে ফকির।
যার ভয়ে রাজা কাঁপে প্রজা নহে স্থির॥

বুরহানা বংশীয় ফকীর মজনুশাহকে ছড়াকার বাংলানাশের কারণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বাস্তবিকই ১৭৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের জনগণ এই ফকীর-বেশী লুটেরা সর্দারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা সর্বত্রই নিজেদের নিরীহ ফকীর বলিয়া পরিচয় দিত, কিন্তু কার্যকালে বলপূর্বক টাকাকড়ি লুণ্ঠন এবং প্রতিরোধীদের সহিত যুদ্ধ করাই ইহাদের প্রকৃত পেশা ছিল। ছড়াটির মধ্যে মজনু ফকীরের যাত্রাকালের জাঁক-জমকের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা লক্ষণীয়।

সাহেব সুভার মত চলন সুঠাম।
আগে চলে ঝাণ্ডা বাণ ঝাউল নিশান॥
উঠ্ গাধা ঘোড়া হাতী কত বোগদা সঙ্গতি।
জোগান তেলেঙ্গা সাজ দেখিতে ভয় অতি॥
চৌদিকে ঘোড়ার সাজ তীর বরকন্দাজি।
মজনু তাজির পর যেন মরদ গাজি॥

রাজপুত্র শাহসুজা কর্তৃক বুরহানা ফকির জনাব শাহ সুলতান হাসানকে ১৬৫৯ খৃষ্টীয় শতকে প্রদত্ত সনদে এইরূপ আড়ম্বরের সহিত শোভাযাত্রা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কিন্তু উক্ত সনদে ইহাও পরিষ্কার ভাবে বলা হয় যে তাঁহারা কোথাও করস্বরূপ অথবা দান হিসাবে কোনরূপ টাকাকড়ি এবং জিনিষপত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন না।[২] কিন্তু মজনুশাহের ক্ষেত্রে ইহার বিপরীত আচরণ হইতে মনে হয় যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বুরহানা ফকীরেরা এই সর্তটি পালন করিত না।

২ SannyasiFakir raiders in Bengal—J. M. Ghosh p 20

মজনু শাহের এক বিশেষ আক্রমণ পদ্ধতি ছিল।[৩]

যেদিন যেখানে যা'য়া করেন আখড়া।
একেবারে শতাধিক বন্দুকের দেহড়া ॥
সহজে বাঙ্গালী লোক অবশ্য ভাগুয়া।
আসামী ধরিতে ফকির যায় পাড়াপাড়া ॥

বন্দুকের শব্দে ভীত হইয়া জনগণ সর্বস্ব ফেলিযা পলায়ন করিলে মজনু শাহের অনুচরেরা অলঙ্কাব ও ধনসামগ্রীর সন্ধানে তাহাদের ধরিবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় অন্বেষণ করিত। ছড়াটিব পরবর্তী অংশে মজনু শাহের আগমনে ভীত বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং জাতির নরনারীর পলায়ন এবং লুটেরা ফকীরদের লুণ্ঠন, স্ত্রীলোকদের ধর্মনাশ প্রভৃতি নানাবিধ অত্যাচারের বিবরণ পাওযা যায। অত্যাচারিত স্ত্রীলোকদের অভিযোগের উল্লেখে ছড়া শেষ হইয়াছে।

কোন্ দেশ হইতে আইল অধম। ইহাকে ভারথে থুযা পাশরিছে যম ॥

জানা যায যে, এই মজনু ফকীব বুবহানা সম্প্রদায়ের মাদারী শ্রেণীভুক্ত ছিল এবং তাহার প্রধান আশ্রয়স্থল ছিল কানপুব জেলার মাখনপুর।[৪]

সন্ন্যাসী-ফকীরদেব এই অত্যাচার প্রথমে পশ্চিম বাংলায় ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে সুরু হয় এবং ধীরে ধীরে পূর্ব বাংলায় ছড়াইয়া পড়ে। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসবকাল মজনু শাহ অবাধে অত্যাচার করিযা যায বলিযাই উৎপীড়িত স্ত্রীলোকের মনে হইয়াছে 'ইহাকে ভারথে থুযা পাশরিছে যম।' ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে বগুড়ার কল্যেশ্বরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিপাহীদের সহিত মজনুশাহের এক সংঘর্ষ হয়। মজনুশাহ পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। ইহাই তাহার শেষ অভিযান। অতঃপর ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ অথবা মে মাসে মাখনপুরে মজনু মারা যায় ॥

Majnu Shah died in March or May, 1787 (according to different report) at Makhanpur and his were carried to a famous burial place in the country of Mewaat lying to the southwards of Dholly.[৫]

এই সন্ন্যাসী-আক্রমণের আলোচনাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র রচিত আনন্দমঠের

---

৩ Sannyasi Fakir raiders in Bengal—J. M. Ghosh p 107
৪ ঐ পৃ ২১
৫ ঐ পৃ ১১০

সন্তান-বিদ্রোহের কাহিনী স্মরণ করা যাইতে পারে। বাংলাদেশের বীরভূম অঞ্চলে সন্ন্যাসীদের রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কাহিনী অবলম্বনে আনন্দমঠ রচিত হয়। কিন্তু মজনু ফকীরের এই কাহিনীর মধ্যে যে অত্যাচারী লুণ্ঠক সন্ন্যাসীর চিত্র রহিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-সন্তানগণ তদ্রূপ হীন চরিত্র নহেন। সুতরাং মনে হয় যে উপরোক্ত সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ কথা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দেশাত্মবোধক উপন্যাসের কাহিনীরূপে বহুলাংশে স্বীয় কল্পনা-মণ্ডিত করিয়া লইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—সত্যকার সন্ন্যাসী ফকিরেরা অর্থাৎ পশ্চিমে গিরি-পুরীর দল, একেবারে লুঠেড়া ছিল, কেহ কেহ অযোধ্যা সুবায় জমিদারিও করিত; মাতৃভূমির উদ্ধার, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল, এই মহাব্রত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পনায় সৃষ্ট কুয়াশামাত্র। সুতরাং ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে 'আনন্দমঠে' বর্ণিত নরনারী এবং তাহাদের কার্য ও কথা (ইংরেজ সৈন্যের সহিত দুইটা খণ্ড যুদ্ধ বাদে) অনেকাংশে অসত্য এবং এ বইখানি কোনমতেই ঐতিহাসিক এই বিশেষণ পাইতে পারে না।[৬]

আনন্দমঠের সন্ন্যাসী

রঙ্গপুর, ধুবড়ী, কুচবিহার এবং জলপাইগুড়ি অঞ্চলে চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে কামদেবের পূজা উপলক্ষে 'জাগ গান' শোনা যাইত। গানের মধ্য দিয়া কাম জাগরণ করা হইত বলিয়া এই সকল গানের নাম ছিল জাগগান। রতিরাম দাস রচিত একটি জাগ-গানের ভণিতা হইতে এইরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'মদনকামের জাগ গায় দাস রতিরাম।' রতিরাম দাস জাতিতে রাজবংশী ছিলেন। এই রাজবংশীয়দের মধ্যেই পল্লীর বাহিরে কামপূজা এবং জাগগানের প্রচলন ছিল। জাগগান সাধারণতঃ অশ্লীল—ইহার কোন কোন অংশ এতদূর অশ্লীল যে প্রান্তর ভিন্ন কোথাও গীত হইত না। এইজন্য জাগগান সম্বন্ধে ভদ্রসমাজে বিতৃষ্ণাই প্রবল। কিন্তু রতিরাম দাস রচিত জাগগানেরই 'রাস' অংশের মধ্যে এমন একটি ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় যাহা একান্ত ঐতিহাসিক এবং তথাকথিত ইতরশ্রেণীর নির্ভীকতা এবং সৎসাহসের পরিচায়ক। জাগগানের এই অংশটি—যাহার মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

জাগগান

৬ 'আনন্দমঠ'—(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত)

কর্মচারীদের অমানুষিক অত্যাচার এবং রঙ্গপুরের কৃষক ও রাজবংশীদের বিদ্রোহ-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে—হইতে বুঝা যায় যে আদি রস অবলম্বনে ধামালী রচনা করিলেও সমসাময়িক রাজনৈতিক এবং সামাজিক দুরবস্থা রাজবংশী কবির মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল বলিয়াই এই নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর কবি সমসাময়িক এক ঐতিহাসিক ঘটনা জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুণে বীর এবং রৌদ্ররস সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন।

রঙ্গপুরের কৃষক বিদ্রোহ

রতিরামের রচনার কোন তারিখ তাঁহার লেখার মধ্যে পাওয়া যায় না। তিনি ইটাকুমারীর খ্যাতনামা জমিদার শিবচন্দ্র রায়ের সমসাময়িক ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অত্যাচারী ইজারাদার দেবীসিংহের নিকট প্রজাদের দুঃখের কথা নিবেদন করিতে গিয়া শিবচন্দ্র কিভাবে কারারুদ্ধ হন এবং মুক্তিলাভ করিয়া প্রজাদের দেবীসিংহের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন কবি রতিরাম তাহা আনুপূর্বিক বিবৃত করিয়াছেন। রতিরাম নিজে রাজবংশী ছিলেন এবং এই কাহিনীর সূত্রপাতে তিনি রাজবংশীদের আদি বাসস্থান পৌণ্ড্রক্ষেত্রের চতুঃসীমা বর্ণনা করিয়াছেন :—

> ···নিবেদন করে দাস জাতি নাম ধাম
> পূবব দিগেতে ব্রহ্মপুত্রের মেলানি
> পশ্চিমে কুশাই গঙ্গা আছয়ে ছড়ানি।
> উত্তরেতে গিরিরাজ দক্ষিণে বাঙ্গালা।
> যে দেশে কিরিপা করে কামাখ্যা মঙ্গলা॥···
> এই সীমার মাঝে দেশ পোণড়ুয়ার স্থিতি।
> এদেশে আমাদের জাতির বসতি॥

ইহার পর কবি পরশুরামের নিঃক্ষত্রিয়-অভিযানের পুরাণ আশ্রিত কাহিনীর উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাঁহার ভয়ে ক্ষত্রিয়েরা রঙ্গপুরে আসিয়া ভঙ্গক্ষত্রী রাজবংশী নামে বাস করিতেছেন।

> রণে ভঙ্গ দিয়া মোরা এই দেশে আইসাছি।
> ভঙ্গ ক্ষত্রি রাজবংশী এই নামে আছি॥

রঙ্গপুরের মাহাত্ম্য বর্ণনায় রঙ্গপুরের ঘোড়াঘাট জেলার শেষ প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা নীলাম্বরের রাজ্যে মুসলমান সৈন্য নারীবেশে প্রবেশ করিয়া কিভাবে অধিকার করিয়াছিল কবি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

গোসানীমঙ্গলের আলোচনাকালে আমরা এই প্রবাদ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। কবি রঙ্গপুরে মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রজাদের অবস্থা মানসিংহ কর্তৃক মোগল বাদশাহের হস্তে ভগিনীকে সমর্পণ করিয়া সম্মানলাভের সমতুল্য বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। এইভাবে পূর্ব-কথা বর্ণনা করিয়া রতিরাম পরিশেষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে দেশের দুরবস্থা এবং ইজারাদার দেবীসিংহের অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। রাজবংশী কবির শিরায় বোধ করি স্বভাবতঃই উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত ছিল, তদুপরি দেবীসিংহের অত্যা-চারের তীব্রতা তাঁহাকে আরো উত্তেজিত করিয়া তোলে—সেইজন্যই এই অত্যাচারী ইজারাদারের চিত্র-চরিত্রে বিদ্রূপের রঙ চড়াইতে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। রাজবংশী কবির বৈশিষ্ট্য এই যে, অপরাপর অদৃষ্টবাদী কাব্যরচয়িতার ন্যায় রতিরামও ইজারাদারের এই অত্যাচারকে প্রজার পাপের ফল বলিযা মনে করেন নাই। কবি বরং ইজারাদারের ভীষণ অত্যাচারের ফলে যে দুর্ভিক্ষ ঘটে, তাহার জন্য রাজ-শক্তিকেই প্রত্যক্ষভাবে অভিযুক্ত করিয়াছেন।

দেবীসিংহ

কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবীসিং।
সে সময়ে মুল্লুকেতে হৈল বার ঢিং ॥
যেমন যে দেবতার মূরতি গঠন।
তেমনি হইল তার ভূষণ বাহন ॥
রাজার পাপেতে হৈলো মুল্লুক আকাল।
শিওরে রাখিয়া টাকা গৃহী মারা গেল ॥

এই দুর্ভিক্ষের মধ্যেও দেবীসিংহের হররাম প্রমুখ কর্মচারীরা আদায়-বকেয়ার কোন হিসাব-নিকাশ না রাখিয়া কিভাবে প্রজার নিকট হইতে অনবরত অর্থ আদায় এবং জমিদারের উপর অত্যাচার করিয়াছিল নিম্নোদ্ধৃত ছত্র হইতে তাহার এক নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায়।

কত যে খাজনা পাইবে তার নেকা নাই।
যত পারে তত নেয় আরো বলে চাই ॥
দেও দেও চাই চাই এইমাত্র বোল।
মাইরের চোটেতে উঠে ক্রন্দনের রোল ॥
মানীর সম্মান নাই মানী জমিদার।
ছোট বড় নাই সবে করে হাহাকার ॥

সোয়াস্কিত চড়িয়া যায় পাইকে মারে জোতা।
দেবীসিংহের কাছে আজ সবে হলো ভেঁাতা॥

অর্থ আদায় ব্যতীত আনুষঙ্গিক অত্যাচারও দেবীসিংহের কর্মচারী-বৃন্দ বড় কম করে নাই।

পারেনা ঘাঁটায় চলিতে ঝিউরী বউরী।
দেবীসিংহের লোক নেয় তারে জোর করি॥

প্রজাদের নিকট দেবীসিংহের এইরূপ নানাবিধ অত্যাচারের অভিযোগ শুনিয়া ইটাকুমারী চাকলার রাজা শিবচন্দ্র অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া মন্থনার রাজ্ঞী জয়দুর্গা ঠাকুরাণীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া প্রতিকারের আশায় স্বয়ং দেবীসিংহের নিকট যাত্রা করেন। কিন্তু ইহাতে হিতে বিপরীত হয়। শিবচন্দ্রকে দেবীসিংহ বন্দী করে।

শুনি চক্ষু কট্‌মট লাল হৈল রাগে।
'কৌন হ্যায়' 'কৌন হ্যায়' বলি দেবী হাঁকে॥
শিবচন্দ্রকে কযেদ করে দিযা পায়ে বেড়ি।
শিবচন্দ্র রাজা থাকে কযেদখানাত পড়ি॥

শিবচন্দ্রের দেওয়ান এই সংবাদ পাইয়া বহু অর্থ ব্যয়ে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া ইটাকুমারীতে ফিরাইয়া আনেন। শিবচন্দ্র দেবীসিংহের নিত্য নূতন অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য রঙ্গপুরের সকল জমিদার এবং প্রজাদের পত্রদ্বারা আহ্বান করেন। এই উপলক্ষে কবি সমবেত প্রজাদের অত্যাচার জনিত দুঃখ-দুর্দশার যে চিত্র আঁকিযাছেন তাহা বাস্তবিকই মর্মান্তিক।

রাইয়ৎ প্রজারা সবে থাকে খাড়া হৈয়া।
হাত জুড়ি চক্ষু জলে বক্ষ ভাসাইয়া॥
পেটে নাই অন্ন তাদের পৈরাণে নাই বাস।
চামে ঢাকা হাড় কয়খান করি উপবাস॥

শিবচন্দ্র সমবেত জনগণের উদ্দেশে নিবেদন করিলেন—

উত্তর হাতে জল আসিয়া বড় লাগে বাণ।
সেই বাণে খায়া ফেলায় যত কিছু ধান॥
কতদিনে কত কষ্টে কত টাকা দিয়া।
ক্যারোয়ার মুখ আমি দিয়াছি বান্ধিয়া॥
রাজার পাপে প্রজা নষ্ট দেওয়ার নাহি জল।
মাঠে ধান জ্বলিয়া গেল ঘরে নাই সম্বল॥

শিবচন্দ্রের নিকট দেবীসিংহের অত্যাচারের বিবরণ এবং ইহার প্রতিকারের আহ্বান শুনিয়াও দেবীসিংহের ভয়ে স্থানীয় জমিদারেরা যখন তাঁহাকে সমর্থন না করিয়া নীরব হইয়া রহিল, তখন মন্থনার কর্ত্রী জয়দুর্গাঠাকুরাণী ক্রোধান্বিতা হইয়া বলিলেন,—

তোমরা পুরুষ নও শকতি কি নাই ?
মাইয়া হয়া জনমিয়া ধরিয়া উহারে।
খণ্ড খণ্ড কাটিবারে পারোঙ তলোয়ারে ॥
করিতে হইবে না আর কাহাকেও কিছু।
প্রজাগুলা করিবে সব হইব না নীচু ॥

এইভাবে প্রজাদের শক্তির উপর আস্থা জ্ঞাপন করিবার পর শিবচন্দ্র প্রজাদের উত্তেজিত করিয়া দেবীসিংহের গৃহলুণ্ঠনের জন্য আদেশ দিলেন।

শিবচন্দ্র হুকুমেতে সব প্রজা ক্ষ্যাপে।
হাজার হাজার প্রজা ধায় এক খাপে ॥

কবি স্বয়ং রাজবংশী ছিলেন তাই নিম্নশ্রেণীর এই নিরীহ প্রজাদের উত্তেজিত বিদ্রোহ অভিযানের বর্ণনাকালে ভদ্রলোকদের অসহযোগিতার জন্য তিনি কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই।

চারিভিতি হতে আইল রঙ্গপুরে প্রজা।
ভদ্রগুলা আইল কেবল দেখিবারে মজা ॥

এই বিদ্রোহ-অভিযানের ফলে দেবীসিংহ পলাইয়া আত্মরক্ষা করে। কবি লিখিয়াছেন—

ইংরাজের হাতে রাজ্য দিলেন চক্রপাণি।
সুবিচার করি গেল আপনি কোম্পানি ॥
ইংরাজ বিচার করে এজলাস করি।
একে একে ফাটকেতে রাখে টিংএ করি ॥

কবির এই উক্তি তাঁহার সারল্যেরই পরিচায়ক মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী খুব সুবিচার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কালেক্টার গুডল্যাড তাঁহার প্রিয় ইজারাদার দেবীসিংহের অঙ্গস্পর্শ করিতে দেন নাই। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপুরে এই কৃষক-বিদ্রোহ ঘটে। গুডল্যাড দেবীসিংহের উপর সকল দায়িত্ব অর্পণ করিয়া নির্ঝঞ্ঝাটে কাল অতিবাহন করিতেছিলেন। বিদ্রোহের সংবাদে তিনি সৈন্য প্রেরণ করেন। বিদ্রোহের নায়ক নিহত হইলে প্রজাগণ গুডল্যাডের নিকট হইতে বর্ধিত হারে

কালেক্টার গুডল্যাড।

খাজনা সংগ্রহ বন্ধ এবং অত্যাচারের প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি পাইয়া শান্ত হয়। বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের জন্য গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাউন্সিল সদস্য পিটারসন সাহেবকে রঙ্গপুরে প্রেরণ করা হয়। গুডল্যাডের চাতুরী এবং জমিদারদের পলায়নের ফলে পিটারসন ব্যর্থ মনোরথে স্বীয় মন্তব্য লিখিয়া পাঠান। ওয়ারেন হেষ্টিংস পিটারসনের মন্তব্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহাকে দণ্ড দিবার অভিপ্রায়ে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এক নূতন কমিশন নিয়োগ করেন।[৭]

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস ভারত ত্যাগ করিলে লর্ড কর্ণওয়ালিশ গভর্ণর হইয়া আসেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে কমিশনের তদন্ত কার্য শেষ হয়। বিচারে মিথ্যা সাক্ষ্যে দেবীসিংহ নিরপরাধ বিবেচিত হয় এবং হররাম প্রভৃতি কর্মচারী অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া মাত্র একবৎসর করিয়া কারাভোগ করে। এই গুরু অপরাধের শাস্তি যতই লঘু হউক না কেন গ্রাম্য কবি ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া ইংরেজ সরকারের বিচারের সুখ্যাতি করিয়াছেন।

রতিরামের এই গানের মধ্যে প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপের এক সুন্দর বর্ণনা আছে। পল্লীবাসীদের জীবিকা হিসাবে বিভিন্ন প্রকারের বৃত্তি গ্রহণের এক সুদীর্ঘ তালিকাও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশেষে কবি শিবচন্দ্রের নিবাসস্থল বর্ধিষ্ণু ইটাকুমারী গ্রামের ঐশ্বর্য এবং শিক্ষা-দীক্ষার প্রসারের উল্লেখ করিয়াছেন। কবির ভাষায়—

নবদ্বীপে সরস্বতী আগে এক পহর।
বসতি করেন ইহা জানে সর্ব্বত্তর ॥···
ইটাকুমারীতে থাকে আসি পহর বেলা।
মাইয়া লোকের সঙ্গে হয় সরস্বতীর খেলা॥

তিতুমীর

তিতুমীর নামক জনৈক ধর্মান্ধ বলদৃপ্ত মুসলমানের স্বীয় ধর্মমত প্রচার প্রচেষ্টায় মূর্খ নিম্নশ্রেণীর মুসলমান অনুচরদের সহায়তায় নদীয়া, যশোহর, চব্বিশপরগণার জমিদারবর্গ এবং সাধারণ প্রজাদের উপর ধর্মান্তর গ্রহণের তাগিদে অত্যাচার এবং জমিদারগণের সহিত দ্বন্দ্বে জয়লাভের সাফল্যগর্বে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধাচরণের ফলে বহু অনুচরসহ প্রাণত্যাগ প্রভৃতি সকল ঘটনাই ঐতিহাসিক। এই সকল ঘটনা অবলম্বনে হয়

৭ The District Gazetteer of Bengal—Rangpur.

সমসাময়িককালে কিংবা আরো পরে একাধিক ব্যঙ্গ ও করুণ রসাত্মক ছড়া রচিত হয়।

তিতু ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বর্তমান গোবরডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে কিছু দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত হায়দারপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। বাল্যকাল হইতেই তিতু স্বধর্মানুরাগী এবং মুসলমান রাজ-শক্তির পুনরুত্থানে বিশ্বাসী ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রথম যৌবনে তিতু শরীর চর্চা এবং অস্ত্রশিক্ষায় মনোনিবেশ করে। নদীয়ার কোন জমিদারের অধীনে লাঠিয়ালের চাকুরী করিবার সময় এক দাঙ্গার ফলে তাহার কারাদণ্ড হয়। কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর তিতুর জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। "তিতুমীর" রচয়িতা লিখিয়াছেন,—···এক সময় দিল্লীর রাজ-পরিবারের কোন এক ব্যক্তির সহিত তিতু মীরের আলাপ-পরিচয় হয়। এই আলাপ-পরিচয় তিতু মীরের মতান্তর অবলম্বনের অন্যতম একটি হেতু হইল।[৮] ইহার পর তিতু মক্কায় গমন করে এবং তথায় মুসলমান ওয়াহবী সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মপ্রচারক সৈয়দ আহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ওয়াহবী সম্প্রদায়ের শিক্ষা অনুযায়ী মুসলমান ধর্মের জন্য যুদ্ধ অত্যাবশ্যক এই ধারণা তিতুর মনে বদ্ধমূল হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে মক্কা হইতে ফিরিয়া তিতু তাহার ধর্মমত প্রচার করিতে আরম্ভ করে। সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ তাহার এই নূতন ধর্মমত স্বীকার না করিলেও জোলা, নিকারী, পটুয়া, বাদ্যকর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা তিতুর নবধর্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া দলে দলে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তিতুর শিষ্যদের এক নির্দিষ্ট পরিমাণ দাড়ি রাখিতে হইত এবং মাথার অগ্রভাগ ক্ষৌর করিতে হইত। ক্রমশঃ তিতুর শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময় এক ফকীর আসিয়া তিতুকে বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের পরামর্শ দিতে থাকে। এই পরধর্ম-অসহিষ্ণুতাই পরে তিতুর পতনের কারণ হইয়া উঠে। শুধু হিন্দু নহে, তাহার নবধর্মে অবিশ্বাসী মুসলমানেরাও অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইত না। তাহার অত্যাচারে উত্যক্ত হিন্দু মুসলমান প্রজাগণ পুঁড়া গ্রামের জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের নিকট তিতুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। কৃষ্ণদেব তিতুর দমনের জন্য এইরূপ আদেশ দেন যে তাঁহার জমিদারীর মধ্যে বসবাসকারী ওয়াহবী মতাবলম্বীদের প্রত্যেককে দাড়ির উপর আড়াই

---

৮ তিতুমীর—বিহারীলাল সরকার পৃ ১৬

টাকা করিয়া খাজনা দিতে হইবে। ইহার ফলে তিতুর সহিত কৃষ্ণদেবের সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। পুড়া গ্রামে দাড়ির খাজনা নির্বিঘ্নে আদায় হইলেও সর্পরাজপুরে তিতুর শিষ্যদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতে গিয়া উভয় দলে সংঘর্ষ বাধে। তিতু শুধু জমিদার কৃষ্ণদেবের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয় নাই, ক্রমাগত বলবৃদ্ধি এবং পূর্বোক্ত ফকিরের সোৎসাহে তিতু নিজেকে রাজা বলিয়া জাহির করে এবং অন্যান্য জমিদারের নিকটও কর দাবী করে। গোবরডাঙ্গার জমিদারের নিকট কর দাবী করিলে তিনি দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত হন এবং তাঁহার অনুরোধে মোল্লাহাটী কুঠির ম্যানেজার ডেভিসও কয়েকশত লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালা সহ তিতুর দমনে অগ্রসর হন। কিন্তু ডেভিস স্বয়ং তিতুর অনুচরবর্গ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া কোনপ্রকারে প্রাণ রক্ষা করেন এবং তাঁহার বজরা নষ্ট হইয়া যায়।

তিতুমীরের ছড়া

তিতুমীর সম্বন্ধে একটি ছড়ায় তাহার অত্যাচার, জমিদারদের সহিত দাঙ্গা, গ্রামবাসীদের পলায়ন, নীলকুঠির ম্যানেজার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত সংঘর্ষ, তাহাদেব পশ্চাদপসবণ এবং অতঃপর বহু সৈন্যসহ ইংরেজ সেনাপতির আক্রমণ ও নারিকেলবেড়িয়ায় তিতুর বাঁশের কেল্লার ধ্বংস-সাধন প্রভৃতি ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ছড়াটি সুদীর্ঘ। শেষের ভনিতা হইতে জানা যায় রচয়িতার নাম হারু। ছড়াটির আরম্ভ এইরূপ :

শুন সবে ভক্তিভাবে করি নিবেদন।
হজরত আলির লড়ায়ের বিবরণ॥
কৃষ্ণদেব রায় হতে, লড়াযেতে মেতে গেল ন্যাড়া।
ফকিরের বুজরুগীতে লোকে হোল পুঁড়াছাড়া॥
নাই আর অন্যগতি, ব্রাহ্মণ জাতির থাকা হোল ভার।
ব্রহ্মহত্যা গোবধ আদি কল্লে একাকার॥
কয়েকটা জোলা মিলে তাঁত ফেলে মৌলবি সব হোল।
মুলুকগিরি করি ফিরি, লাউঘাটিতে গেল॥
সেথাতে কল্লে মজা, তুল্লে ধ্বজা, লড়াই ফতে করে।
রতিকান্ত রাযের বেটা, দেবনাথকে মারে॥

তিতুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া পুঁড়া হইতে অনেকে গোবরা-গোবিন্দপুরে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলে ঐ গ্রামের জমিদার রতিকান্ত রায়ের সহিতও তিতুর বিরোধ ঘটে। তিতু দলবলসহ গোবিন্দপুর আক্রমণ করিলে রতিকান্ত রায়ের পুত্র দেবনাথ রায় স্বীয় অনুচরবৃন্দকে লইয়া অসমসাহসের

সহিত তিতুর প্রতিরোধ করেন। উভয় দলে ঘোর যুদ্ধ হয় কিন্তু দেবনাথের অশ্ব আহত হইলে দেবনাথ ভূপতিত হন এবং অলক্ষিতে তিতুর এক অনুচর তাঁহার শিরশ্ছেদ করে। ছড়া রচয়িতা এই কাহিনী স্মরণ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

কইতে ফাটে বুক, বড় দুঃখ, রায় মারা গেল।
সিংহের মরণ যেন শৃগালের হাতে হল ॥

তিতুর অন্যতম অনুচর মুসলমান লেখক সাজন গাজী লিখিত একটি ছড়ায় এই যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়। লাউঘাটির যুদ্ধের উল্লেখ করিয়া সাজন গাজী তিতুর অত্যাচারের ফলে গ্রামবাসীদের পলায়ন এবং তিতুর উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাদশাগিরির এক বিবরণ দিয়াছেন।

সাজন গাজীর গান

এই সব আজব কথা, খেলে মাথা, যত ন্যাড়া মেলে।
গেরস্থ লোক পলায় সব, ঘর দুয়ার ফেলে ॥
তাদের বা দুখ কত, নারী যত ঘর ছেড়ে যায়।
দেখলে ন্যাড়া, দেয় তাড়া, বুদ্ধি হত হয় ॥

এইরূপ লোটে দেশ, অবশেষ নারিকেলবেড়ে গিয়ে।
বলে আল্লা বানায় কেল্লা, বাঁশের বেড়া দিয়ে ॥
তিতুমির বাদশা হোল, হুকুম দিল উজিরের তরে।
মৈজদ্দি উজির হয়ে, হুকুম জারি করে ॥

নদীয়া এবং বারাসত এই দুইটি জেলাতেই তিতু ক্রমাগত অত্যাচার চালাইয়াছিল। এই জেলা দুইটিতে সে সময়ে একাধিক নীল কুঠি ছিল। তিতুর অনুচরেরা বারঘরের কুঠি আক্রমণ এবং লুঠ করে এবং বারাসতের দারোগাকে হত্যা করে। কুঠির ম্যানেজার পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন।[১] ছড়াটির মধ্যে এই ঘটনার বর্ণনা নিম্নরূপ,—

শেষেতে একে আর, বাঁচা ভার, শুন সমাচার।
বারঘরের কুঠী লুঠে, কল্লে ছারখার ॥

---

১ An European magistrate immediately repaired to the scene of riot with a detachment of local troops, in the hope that his presence thus supported would restore order, but he was dissapointed. His authority defied, his troops resisted and beaten off, several of them killed, others dangerously wounded and it was not without difficulty that the magistrate escaped unharmed.

History of British India—E.Thornton Vol. V p 178

সাহেব যায় পলাইয়ে, খবর নিয়ে মেজেষ্টারে গিয়ে।
গ্রেপ্তার কারণে সাহেব আইল ফৌজ নিয়ে॥

*　　*　　*

কিন্তু ঘেরা মাত্র, হাতে অস্ত্র, দাঁড়াইয়ে ছিল।
মার মার শব্দ করে মৌলবি সরে গেল॥
মাল্লে সিপাই যত, কব কত আহা মরি মরি॥
দারগাকে মাল্লে সব চারি দিকে ঘেরি॥
সাহেবের কপাল ভাল, জোর ছিল, দৌড়ে সে পালালো॥

এই সংবাদ পাইয়া কলিকাতা হইতে সৈন্য প্রেরণ করা হয় এবং বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেটকে বাগাণ্ডীতে সিপাহীদের সহিত যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আলেকজাণ্ডার হাবিলদার, জমাদার এবং কুড়িজন সিপাহীসহ তিতুকে আক্রমণ করিতে গিয়া স্বয়ং আক্রান্ত হন এবং বসিরহাটের দারোগা, জমাদার ও সিপাহীদের তিতুর অনুচরেরা বন্দী করে। তিনি কোনপ্রকারে অশ্বারোহণে পলায়ন করেন। কিন্তু দারোগা ও কয়েকজন সিপাহীকে তাহারা হত্যা করে। ইহার পর তিতুর দলবল আরো বেপরোয়াভাবে লুণ্ঠতরাজ আরম্ভ করে। তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেটের পশ্চাদপসরণের সংবাদ পাইয়া নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটকে বিদ্রোহ দমনের আদেশ দেন।[১০] আদেশ অনুযায়ী নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট প্রস্তুত হইয়া বারবারিয়া যাত্রা করেন। ছড়াটিতে তাঁহার অভিযানেরও বর্ণনা আছে,—

নদে জেলার ম্যাজিষ্টার, আইল তারপর।
কিন্তু তার জাঁক বড়, হয়ে দড় আছু সাহেব এল।
সুলুক বজরা পিনেষ আদি হাতি কতকগুল॥
ধমকে পাষাণ ফাটে, সত্য বটে মিছে কিন্তু নয়।
একদিন ছাউনি করে বারঘরেতে রয়॥
হাতি যায় দশ বারটা, ঘোড়া ছটা, সাত আটজন ইংরাজ।
পিছে পিছে চল্ল সব থানার বরকন্দাজ॥

কিন্তু এই যুদ্ধেও তিতু জয়লাভ করে এবং নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন করিতে হয়। সর্বশেষে গভর্ণর জেনারেল কলিকাতা

---

১০ History of British India—E. Thornton vol V pp 178-79

হইতে দুইটি কামান, একশত ইংরেজ ও তিনশত দেশী সিপাহীসহ একজন কর্ণেলকে তিতুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই ইংরেজ সৈন্যের গোলাবর্ষণে তিতুর ভগ্নোৎসাহ অনুচরদের স্বীয় অলৌকিক ভেল্‌কী দেখাইয়া তাহার পরামর্শদাতা ফকীর কি ভাবে যুদ্ধোন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল ছড়াটীর মধ্যে তাহার বর্ণনা আছে—

তিতুর পরামর্শদাতা ফকীর

ফৌজ সব এল যত. কব কত,বর্ণিতে না পারি।
নারিকেলবেড়ে হল যেন যমরাজার পুরি॥
কামানের শব্দ শুনে, ফকির পানে মৌলুবি সব চায়।
বুজরুগী সব ফাঁকি, জান্ গেলোরে হায়।
ফকির বলে তখন, বাপুধন, ভয় করবে কারে।
এই ছাথ গোল্লা খাই হজরতের বরে।
···কাপটেন সাহেব জোরে ফকিরের কহেন এককথা।
দস্তগির হবে কি লড়ায়ে দিবে মাথা॥
ফকির বলে লড়াই চাই, দস্তগির না হব।
গোল্লা মার এখন আমি ধরে ধরে খাব॥

এই ফকীরের প্ররোচনায় তিতুর অনুচরেরা যুদ্ধ করিলেও ইংরেজ সৈন্যের কামানের গোলায় তিতুর বাঁশের কেল্লা নিমেষের মধ্যেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। তিতু বহু অনুচরসহ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করে। বহু অনুচর বন্দী হয় এবং বিচারের জন্য আলীপুরে প্রেরিত হয়। বিচারে ৩৫০ জন আসামীর মধ্যে ১৫০ জনের কারাদণ্ড এবং সেনাপতি মাসুমের প্রাণদণ্ড হয়।[১১]

তিতুর যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কিত এই দীর্ঘ ছড়াটি ব্যতীত আরও কয়েকটি ছড়ায় তাহার অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তীব্র ধর্মোন্মাদনা তিতু ও তাহার অনুচরদের পশুত্বের পর্যায়ে নামাইয়া দিয়াছিল। সাজনগাজী নামক তাহারই জনৈক অনুচর কর্তৃক লিখিত একটি ছড়ায় তাহার স্পষ্ট ছাপ আছে। আহত শত্রু হিন্দুব্রাহ্মণ যুদ্ধস্থলে পিপাসার্ত কণ্ঠে জলভিক্ষা করিলে তিতুর অনুচর তাহার মুখে গোস্ত গুজিয়া দেয়! তিতু যে সকল হিন্দুকে মুসলমান করিয়াছিল সাজনগাজী ব্যঙ্গোক্তি সহকারে তাহাদের ঘরে-বাহিরের দুর্দশার উল্লেখ করিয়াছেন।

তিতুর অত্যাচারের কাহিনী

বামুন গোণেরে ধোরে কলমা পড়ায় জোরে
চুল ফেলে মুখে রাখে দাড়ি।

১১ History of British India—Thornton vol V p 179

গাঁওা গোস্ত তারা খাইয়া   কাপড় পরে ওন্দারা দিয়া
    কাছা খুলে সবে গেলো বাড়ি…
গালপাট রাখিয়া দাড়ি   সবে যায় নিজ বাড়ি
    দেখে তারে কহেন ব্রাহ্মণি।
মাথায় দেখি না কেস   ধরেছো মোল্লার বেশ
    বুঝি তোদের গেছে হিন্দুয়ানি॥

তিতুর দলবল হিন্দুনারীও কম অপহরণ করে নাই।

অদৃষ্টের পরিহাসস্বরূপ তিতুর পরাজয়ের পর তাহার ন্যায় দুর্দান্ত লোকের নামেও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ছড়া রচিত হয়। যে তিতু একদিন দেশবাসীর আতঙ্কের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, পথভিক্ষারীদের কণ্ঠেও পরবর্তীকালে তাহার দুর্দশার ছড়া শোনা যাইত! তিতুর বাঁশের কেল্লা নির্মাণ এবং দাড়ী রাখা সম্পর্কে শ্লেষাত্মক এই ছড়াগুলি জনসাধারণের উপভোগ্য ছিল।

তিতু সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক ছড়া

উত্তরে এক গ্রাম ছিল   নামে নারিকেলবেড়ে
    তাতে হাজার দুই নেড়ে।
ওরে বুড়ো, ওরে বুড়ি,   আজকে গাঁয়ের হাট,
    কেস্তে দিয়ে দাড়ি কাট॥
তিতু মীর বলে আল্লা,   বানাইলাম বাঁশের কেল্লা
    তাতে আমার নেই হেল্লা;
যেমন মাঠে ধান ছিল,   তেমনই হ'লো মাঠ,
    কেস্তে দিয়ে দাড়ি কাট॥

একটি ছড়ায় তিতুর অনুচরের মুখে তাহাদের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য আক্ষেপ শুনিতে পাওয়া যায়। ছড়াটি কোন হিন্দুরও রচনা হইতে পারে।

জোর করে সব ধরে আনলাম গৃহস্থের বৌ ঝি
তার প্রতিফলন হাতে হাতে জারিজুরি খাটলো না।
এবার মারলে ইংরেজের মামু জানে নাক্‌লে না॥ ইত্যাদি।

আরো দু'একটি ছড়ায় তিতুর শিষ্য-সেবকদের পরে দাড়ী ফেলিয়া হিন্দু সাজিয়া আত্মরক্ষার ব্যঙ্গচিত্র পাওয়া যায়।[১২]

ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা এবং যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে রচিত এই কবিতাগুলির মধ্যে দুর্নিবার গণশক্তির জাগরণ-কাহিনী কোন

১২ তিতুমীর—পৃ ১৬

কোন ক্ষেত্রে সুর-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিলেও রচনা হিসাবে এগুলিকে ঠিক আধুনিক নামাঙ্কিত করা যায় না। কথারম্ভে আমরা প্রাচীন বাংলা কাব্যের আলোচনাকালে দেখিয়াছি যে কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনার মধ্যে তৎকালীন সমাজ-চেতনার ফলে কিছুটা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী

ঈশ্বরগুপ্ত

ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোলাহল-উচ্চকিত কলিকাতা মহানগরীর বিচিত্র অঙ্গনে নানাদেশের লোকজন, নানা ধরণের সংবাদ, পণ্য কবি-চিত্তের সম্মুখে নূতন নূতন তথ্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। গুপ্ত কবি তাঁহার এক বিশেষ ভঙ্গীতে সেই সকল তথ্যকে ছন্দে রূপায়িত করিয়াছেন। ইহার ফলে যে গতানুগতিকতায় বাংলা কাব্যের গতি শ্লথ হইয়া আসিতেছিল তাহা অপসৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার সমকালে ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত একাধিক যুদ্ধকাহিনী অবলম্বনে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, কৃষক-বিদ্রোহ, সাঁওতাল-বিদ্রোহ প্রভৃতি কাহিনী অবলম্বনে রচিত অনুরূপ কবিতা হইতে ঈশ্বরগুপ্তের যুদ্ধের কবিতাগুলি যেন ভিন্নজাতের বলিয়া মনে হয়। সংবাদপত্রের ন্যায় বিচিত্রস্বাদী এই কবিতাগুলির মধ্যে মোটামুটি

যুদ্ধ বিষয়ক কবিতায় নাগরিক সুর

তথ্যের অভাব নাই, কিন্তু বর্ণনভঙ্গীগুণে এইগুলির মধ্যেনাগরিক সুর প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন কবিগণ অনুপ্রাস-যমকে বীতস্পৃহ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না—তাঁহাদের নিস্তরঙ্গ রচনার মধ্যে মধ্যে অনুপ্রাস-যমকের তরঙ্গক্ষেপ দেখা যায় কিন্তু এই অনুপ্রাস-প্রীতি কবিওয়ালাদের গানের মধ্যেই অতিমাত্রিক হইয়া উঠে। ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন এই কবিওয়ালাদেরই উত্তর সাধক। যুদ্ধবিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যেও অনুপ্রাস-যমকের বাহুল্যে অস্ত্রের ঝঞ্ঝণাও বায়ুস্তরে মিশিয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, প্রথম স্বদেশানুরাগী কবি বলিয়া যাহাকে আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি তাঁহার এই যুদ্ধ বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী শিখদের সহিত ইংরেজ সৈন্যের যুদ্ধ বর্ণনায় তিনি যে ভাবে বারংবার শিখদিগকে তুচ্ছ এবং ইংরেজ শক্তির জয়গান করিয়াছেন তাহা শুধু অপ্রীতিকর নহে, বীর যোদ্ধাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন ঘৃণারও পরিচায়ক। সেই সময়ে সমাজে শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রেই যে সংস্কার সাধনের চেষ্টা চলিতেছিল ঈশ্বর গুপ্ত বিদ্রূপের কশা চালনায় সাহিত্যক্ষেত্রে সেই সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগবশতঃ বিদেশের ঠাকুর

অপেক্ষা দেশের কুকুর যে-ঈশ্বর গুপ্তের নিকট প্রের বলিয়া মনে হইয়াছে শিখযুদ্ধের বর্ণনায় আবার তিনিই লিখিয়াছেন—

এসেছিল শিখ সব করিয়া বিক্রম।
বামনের অভিলাষ ধরিবেক শশী।
উর্দ্ধভাগে হস্ত তুলি ভূমিতলে বসি॥
তুরঙ্গের খর গতি ধর করে শক।
বাসুকি করিতে বধ বাঞ্ছা করে বক॥
কাকের কোকিল-রবে লজ্জা নাহি ভয়॥
ইত্যাদি

ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কোনরূপ মন্তব্য সে যুগের কবির পক্ষে করা সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু প্রতিকূল মনোভাব তো দূরের কথা—ইংরেজ বিজয়ে কবি একেবারে উৎফুল্ল চিত্তে প্রধান সেনাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া দেশবাসীকে রাজার সাহায্য ও মঙ্গল গীত করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

এদেশের প্রজা সব ঐক্য হয়ে সুখে।
রাজার মঙ্গল গীত গান কর মুখে॥
ধন্য চীফ কমাণ্ডার ধন্য দেও লর্ডে।
ইংরাজের র‍্যাঙ্ক বাড়ে থ্যাঙ্ক দেও গডে॥
গণ্য বটে সৈন্যগণ ধন্য দেও তায়।
লর্ডের রহিল মান গডের কৃপায়॥

গুপ্ত কবির এই কবিতাগুলির ঐতিহাসিক উপাদান-বস্তুর আলোচনায় দেখা যায়, লর্ড অকল্যাণ্ডের শাসনকালের আফগান যুদ্ধ হইতে সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা পর্যন্ত তাঁহার কবিতার বিষয়ীভূত হইয়াছে। চার্লস মেটকাফের বিদায় গ্রহণের পর ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ভারতের গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসেন। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের শাসনকালে আফগান জাতিকে পদানত করিবার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য পরাজিত হয়। যে ইংরেজ সৈন্যদল কাবুলে উপস্থিত হইয়াছিল যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁহারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। ঈশ্বর গুপ্ত এই যুদ্ধের কাহিনী তাঁহার 'কাবুলের যুদ্ধ' নামক কবিতায় বর্ণনা করিয়াছেন।

ঐতিহাসিক উপাদান

চেগেছে বিষম যুদ্ধ তেগেছে কাবেল শুদ্ধ
দেগেছে কামান শত শত।

ভেগেছে গোরার দল   মেগেছে আশ্রয় বল,…
করেছে আসর জারি   হয়েছে বিলাতী নারী
তরেছে সময়ে খুব তারা।

এই যুদ্ধে ইংরেজদের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। বৃটীশ এনভয় নিহত হন এবং ইংরেজ সৈন্য প্রত্যাবর্তন-পথে আফগানদের গুলীতে দলে দলে মারা পড়ে। এইভাবে ষোল হাজার লোক আফগানদের গুলীবর্ষণ, ক্ষত, ঠাণ্ডা এবং ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।[১৩] কবির ভাষায়,—

কাপ্তেন কর্ণেল কত   বিপাকে হইল হত
স্বর্গগত ডাবলিউ এম।
রাজদূত যাঁরে কয়   কোথা সেই এনবয়
কোথায় রহিল তাঁর মেম?…
কেড়ে নিল তাঁবু টেণ্ট   হতবল রেজিমেণ্ট
হায় হায় কারে কব সেম।
অবশিষ্ট যত সৈন্য   আহার অভাবে দৈন্য
কাঁচা মাংস ছিঁড়ে খায়॥

লর্ড এলেনবরো স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিলে লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া আসেন। ভারতে পদার্পণের আট মাসের মধ্যেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া শিখদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়। রণজিৎ সিংএর মৃত্যুর পর তাঁহার দুর্ধর্ষ সৈন্যদলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এবং স্বেচ্ছাচারিতা প্রবল হইয়া উঠে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এই বিরাট শিখবাহিনী শতদ্রু (Sutlej) নদী অতিক্রম করিয়া ইংরেজদের আক্রমণ করে। এই শিখ যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত একটি

১৩ On November 2, 1841, an insurrection broke out in Kabul, and Sir Alexander Burnes was killed. In December 23 the British envoy Macnaghten, was killed in an open meeting by Akbar Khan, son of the exiled Dost Muhammad. In January 1842 the British of four thousand, with twelve thousand camp-followers began their retreat from Kabul. The entire force and camp-followers, sixteen thousand men perished under the Afgan fire, or died of wounds, cold and hunger in the Afgan snows. One solitary survivor Brydon excaped.

India in the Victorian Age—R. C. Dutta—p9

কবিতায় শিখদের শতদ্রু নদ অতিক্রমণ এবং ইংরেজদের সহিত যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শতদ্রু পার হ'ল শিখ সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥
পাঞ্জাবীয় শিখদের আশা ছিল মনে।
ব্রিটিস বিনাশ করি জয়ী হবে রণে॥
সমুদয় অস্ত্র লয়ে হয়ে অগ্রসর।
করিল শিবিরে আসি সম্মুখ-সমর॥
প্রথমে জঙ্গল পেয়ে মঙ্গল-সাধন।
দঙ্গল বাঁধিয়া করে ঘোরতর রণ॥
মাঠে এসে ফাটে বুক মুখ শুষ্ক হয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥

মুদকী যুদ্ধের প্রারম্ভেই শিখ সেনাপতি লাল সিং পলায়ন করিলে শিখগণ ইংরেজদের নিকট পরাজিত হয়। গুপ্ত কবি 'মুদকির যুদ্ধ' নামক কবিতায় লিখিয়াছেন,—

সেরেছে এবার শিখে হইয়া প্রবল।
মেরেছে বিপক্ষগণে মুদকির রণে॥
ঘেরেছে সকল শত্রু গোরাদের সনে।
ভেগেছে সম্মুখ যুদ্ধে নদী পার হয়ে॥

শিখ সেনাপতি লালসিং এবং তেজসিং এর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মুদকী, ফিরোজশা প্রভৃতি যুদ্ধে শিখগণ পরাজিত হয়। গুপ্তকবির রচনার মধ্যে এ সকল বিবরণ পাওয়া যায় না। তিনি মুদকী এবং ফিরোজ-পুরের যুদ্ধে শিখদের প্রথমে জয়লাভ ও পরে ইংরেজদের নিকট পরাজয় বরণের কাহিনী বর্ণনা করিয়া পরিশেষে লর্ড হাডিঞ্জের দীর্ঘ প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন। এই প্রশস্তির মধ্যে কবি লর্ড হাডিঞ্জের একটি মাত্র হস্তের সাহায্যে যুদ্ধে জয়লাভে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া লিখিয়া-ছেন,—

থ্যাঙ্ক লাড্ ধন্য তুমি ফিরোজপুরের ভূমি,
শিখ-রক্তে প্রবাহিত নদী।
একহস্তে এ প্রকার না জানি কি হত আর,
দুই হস্ত প্রাপ্ত হতে যদি॥

যুদ্ধে যুদ্ধে আপনার সমতুল্য কোথা আর,
মহিমার নাহি হয় শেষ।
ডিউকের হয়ে পাটি বধ করে বোনাপাটি
রেখেছিলে ব্রিটনের দেশ॥

সিপাহী বিদ্রোহকালে কানপুর, দিল্লী, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে যে যুদ্ধ হয় সে সম্বন্ধেও ঈশ্বরগুপ্ত কয়েকটি কবিতা লিখিয়াছেন। পূর্বোল্লিখিত শিখ যুদ্ধের কবিতার ন্যায় এই কবিতাগুলিও ইংরেজ শক্তির ঢক্কানিনাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। একজন রাজভক্ত প্রজা হিসাবে ইংরেজ-সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার যুদ্ধই তিনি প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। কিন্তু এই রাজভক্তির আধিক্যবশতঃ তিনি সিপাহী যুদ্ধের বীরাগ্রগণ্য শহীদদের উদ্দেশে যে রূপ অশিষ্ট উক্তি করিয়াছেন আজিকার দিনে তাহা খুব শ্রুতিমধুর বলিয়া কাহারও মনে হইবে না। ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস আলোচনাকালে ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈএর নাম সকলেই সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত এই সাহসিকা, স্বদেশ-সেবিকার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত কটূক্তি করিয়াছেন। বিঠুরে নির্বাসিত নানাসাহেব সম্বন্ধেও তাঁহার অনুরূপ ব্যঙ্গ-বাণ বর্ষিত হইয়াছে। এমন কি কুমার সিংহ সম্বন্ধে দোষারপের কোন অজুহাত খুঁজিয়া না পাইয়া তিনি লিখিয়াছেন যে, নারীহত্যা শিশুহত্যা করেন নাই বটে কিন্তু 'রাজদ্বেষী' হইয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহাকে মহাপাপী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

গুপ্তকবির কটূক্তি

ঈশ্বরগুপ্তের যুদ্ধ বিষয়ক কবিতাগুলি কয়েকটি কারণে আদৌ জনপ্রিয় নহে। প্রথমতঃ ইংরেজি শব্দের বিকৃতি এবং যমক-অনুপ্রাসের আধিক্যে কবিতাগুলি একেবারে নীরস এবং একঘেয়ে বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি এই সকল কবিতায় সর্বত্রই এদেশীয় সৈন্যগণের মূঢ়তা এবং অপরিণামদর্শিতার নিন্দা এবং ইংরেজ সৈন্যদের জয়ধ্বনি সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছেন। এমন কি ইংরেজ সরকারের মহিমা কীর্তনেচ্ছায় তিনি শ্রদ্ধেয় চরিত্রগুলিও কালিমালিপ্ত করিয়াছেন।

১৮৫৫ খৃষ্টীয় শতকে বীরভূমে যে সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটে সে সম্পর্কে দুইটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে। প্রথম কবিতাটির[১৪] লেখক রায় কৃষ্ণদাস। সমসাময়িক ঘটনা বিবৃত করিয়া কৃষ্ণদাস পরিশেষে লিখিয়াছেন—

সাঁওতাল বিদ্রোহ

"যে কিছু কহিলাম আমি সকলি তাহা সইত্য। কথা মিথ্যা নয়, সত্য হয়

১৪ 'বীরভূমি' দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ-পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত

শুন সকল ভাই।" সাঁওতাল বিদ্রোহের সূত্রপাত ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে। রচনা-কালের তারিখও সেই সময়ের বলিয়া অনুমিত হয়।

বারশ বার্ষট্টি সাল, বাণের বড় বৃদ্ধি।
আব্বারপুরের মানুষ কেটে করলে গাদাগাদি॥

কৃষ্ণদাসের কবিতা

এই কবিতাটিতে কৃষ্ণদাস বীরভূমে সাঁওতালদের বিদ্রোহাত্মক কার্য-কলাপের উল্লেখ কালে লিখিয়াছেন যে 'শুভবাবুর হুকুম পেয়ে সাঁও-তাল ঝুকেছে।' এই শুভবাবু অন্যতম সাওতাল সর্দার। জানা যায় যে ভগ্নডিহির সিদু ও কানু নামক সাওতাল ভ্রাতৃদ্বয় প্রধানতঃ এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করে।

This spark came from two brothers named Sidhu and Kanhu of Bagnadihi, situated half a mile from Barhait, with their less pushing brothers ohand and Bhairab-"[১৫]

কৃষ্ণদাসের এই নাতিক্ষুদ্র রচনা হইতে বেশবুঝা যায় যে সাওতালদের এই বিদ্রোহ-অভিযান কার্যতঃ ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে চালিত হইলেও তাহাদের আক্রোশ মূলতঃ ছিল স্থানীয় মহাজনদের উপর এবং এই কারণেই তাহারা সর্বাগ্রে মহাজনদের আক্রমণ করিয়া হত্যা করিয়াছে, তাহাদের গৃহে অগ্নিসংযোগ এবং জিনিষপত্র লুঠ করিয়াছে। মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোর্টে অভিযোগ করিয়াও যখন বিশেষ কোন ফল হইল না, বরং তাহাদের জীবনরক্ষার জন্যই পুলিশ কর্তৃপক্ষ তৎপর হইয়া উঠিল তখন সাঁওতালেরা ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণেও প্রবৃত্ত হয়। ছড়াটির একাধিক স্থানে প্রথমে এই মহাজনদের উপর সাওতালদের আক্রোশ-আক্রমণের বর্ণনা আছে,—

বিদ্রোহের কারণ

বেচারামকে কেটে বেটাদের রক্তমুখো সব।
আর কি হাকিম মানে, বনে বনে রাস্তা পেয়ে সোজা।
সাদিপুরে লুটে গিয়ে কাপড়ের বোঝা॥

অন্যত্র,— পোরবপুরে মোকাম কৈল গয়ারামের ঘরে।
যত সব চেলের গোলা, ভাঙ্গিল তারা, সকল বা'র করিল।
মরা পেটে চড়া দিয়ে খিটন করিল॥

১৫ The Santal Insurrection of 1855-57—K.K.Dutta. p I4

নীরিহ সরল, সাঁওতাল শ্রেণীর মহাজন-জমিদারের উপর এই আক্রোশ অকারণ নহে। সাঁওতাল বিদ্রোহের মূল কারণ তাহাদের প্রতি বাঙালী-অবাঙালী ব্যবসাদার এবং মহাজনদের দিনের পর দিন অত্যাচার এবং জমিদার শ্রেণীর লোভসঞ্জাত অন্যায় দাবী।

The causes of the insurrection were deeply rooted in the changing conditions of the Santals, due to the oppressions and frauds committed on these simple minded people by the above mentioned Bengali and upcountry merchants and mohajans had become awful and they had ammassed large fortunes within an incredibly short period by securing cash and grains from the Santals through various obnoxious ways.[১৬]

শুধু মহাজনেরাই সাঁওতালদের প্রতারণা করিয়া বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিত না, স্থানীয় জমিদারদের কর্মচারী হইতে, পুলিস কর্মচারী, কোর্টের আমলা পর্যন্ত কেহই বাদ ছিল না।[১৭] অবশ্য বিদ্রোহের সূত্রপাতের কারণ ইহা হইলেও ক্রমশঃ তাহা রাজবিদ্রোহের আকার ধারণ করে এবং সাঁওতালেরা কোর্ট, থানা প্রভৃতি সরকারী কার্যস্থলসমূহ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে।[১৮] ইংরেজ সরকারের আদালতের বিচারে মহাজনদের অপরাধের কোন শাস্তি না হইলেও এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা হয় বুঝিয়া শান্তিপ্রিয়, নীরিহ সাঁওতালেরা প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠে। তাহাদের এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার আভাস কৃষ্ণদাসের কবিতা হইতে পাওয়া যায়।

বলে সব মার, ধর ধর, এই মাত্র রব।
আজ সিউড়ী জেলা লুটবো গিয়ে, করবো পরাভব॥

১৬ The Santal Insurrection etc. p. 5

১৭ Zamindars or more properly speaking zamindari retainers, as gomosta, surbarakar, peons and other mahajans and their 'mustajirs' or agents the police, revenue and court amlas have exercised a combined system of extortions. oppressive exactness, forcible dispossession of property, abuse, and personal violence and a variety of petty tyrannies upon the timid and yeilding Santals. Calcutta Review 1856

১৮ The Santal Insurrection etc p 10

যাও সব জেহাল খানা, দিব থানা মুক্ত করবো চোরে।
শুভবাবু রাজা হবে জজ সাহবকে মেরে॥
আমরা খুচবো মাঝি, কাজের কাজি, মহারি করবো বসে।
কৃষ্ণসাহার দোকান ভেঙ্গে সরাপ খাব ব'সে।

ছড়াটি হইতে অভিযানকারী সাঁওতালদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তীর-ধনু এবং টাঙ্গির নাম আছে। এইসব অস্ত্র তৈয়ারী করিবার জন্য তাহারা নিজেদের সঙ্গে কর্মকার রাখিত—ইহারা প্রয়োজন মত তীরের ফলা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিত।

কত শত কর্ম্মকার সঙ্গেতে এনেছে।
তীরের ফলা বনাইতে, বরাত মতে যখন জেমন কয়।
হাতে হাতে জোগায় ফাল পাছে টানা হয়।

কৃষ্ণদাস সাঁওতালদের মহাজন-কুঠী আক্রমণ, লুণ্ঠন এবং মহাজনগণ কর্তৃক ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা, ইংরেজ সৈন্যের সহিত সাঁওতালদের যুদ্ধ এবং পরাজয়ের উল্লেখ করিয়া ছড়া শেষ করিয়াছেন। মহাজনদের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ সাঁওতালদের উদ্দেশ্য হইলেও তাহাদের বেপরোয়া লুণ্ঠনের ফলে সাধারণ লোকেরও যথেষ্ট অসুবিধা হয়।

লোকের কি যন্ত্রণা, কি লাঞ্ছনা করলে সাঁওতালে।
কত গর্ভবতী রাস্তায় প্রসবিলে ছেলে॥
এমনি সর্ব্বত্তরে লুট করে বেড়াল সাঁওতাল।
মনুষ্য কি কথা, দেবতা, পালাল গোপাল।

কৃষ্ণদাসের ছড়ার মধ্যে তাহার বাসস্থানের নাম পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর দত্ত তাঁহার গ্রন্থে কৃষ্ণদাসকে বীরভূম জেলার কুলকুরি গ্রামের বাসিন্দা বলিয়াছেন।

ধনকৃষ্ণের কবিতা

অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে উনবিংশ শতকের শেষ দিকে রাজমহল মহকুমার পাচকেথিয়ার বাজার-চৌধুরী ধনকৃষ্ণ রুদ্র সাঁওতাল-হাঙ্গামা সম্পর্কে একটি দীর্ঘ গ্রাম্য কবিতা রচনা করেন। কৃষ্ণদাসের ছড়া অপেক্ষা এই কবিতাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বেশি। ইহার মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহের সূত্রপাত হইতে দমন পর্যন্ত সকল ঘটনাই বিস্তারিত আকারে পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত কবিতাটি রচনাগুণেও উন্নত। প্রারম্ভেই কবি পর্বতবেষ্টিত মনোরম রাজমহলের শান্তিপ্রিয় কৃষিজীবী সাঁওতালগণ কিভাবে নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য ভীষণ সর্বনাশের সম্মুখীন হয় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। কবির ভাষায়—

ভাগলপুরের অধীনে রাজমহল।
সে রাজমহল খাম্য,
স্থান অতি মনোরম্য,
চৌদিকে পরিবেষ্টিত পর্বতমণ্ডল॥

কিবা শোভা মনোলোভা বর্ণনে না জায়।
তার উপত্যকা ভূমে,
সাঁওতাল জাতি নামে,
বাস কবে অল্প করে কৃষি করে খায়॥
অসভ্য বর্ব্বর অতি বুদ্ধি নাই ঘটে।
হলে কোন গণ্ডগোল,
সেই বোলে দিযে বোল,
ভবিষ্যৎ না ভাবিযা সেই পথে ছুটে॥

কবি সাঁওতালদেব এই অভ্যুত্থানকে সুদৃষ্টিতে না দেখিলেও তাহাদেব বিক্ষোভেব কাবণ উল্লেখ করিতে ইতস্ততঃ কবেন নাই।

বৌদ্রে শীতে জলে তাতে কষ্টে কবি চাষ।
কি দোষে সাঁওতাল জাতি
দুখে থাকে দিবাবাতি,
উদব পুবিযা অন্ন নাহি বার মাস॥
বুদ্ধি বলে বাঙ্গালী ও যত হিন্দুস্থানী।
আমাদেব দেশে আসি,
আমাদেব মধ্যে বসি,
আমাদেবি লযে সব হইযাছে ধনি॥

বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ধনীদেব বিরুদ্ধেই নেতা সিহু ও কানু ভ্রাতৃদ্বয় সাঁওতালদেব উত্তেজিত কবিযা তোলে। নিজেদেব সমপর্যাযভুক্ত বলিয়া পবিশ্রমজীবী দবিদ্রদেব দোষও সাঁওতালেবা ক্ষমার্হ বলিযা মনে কবিযাছিল।

বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী
দেশ মধ্যে সবে ধনী
আগে দণ্ড দেওযা চাই তাদেবি বিশেষ॥
হাল ধবে চাষ কবে বাবুগিবি নাই।
এরা যদি কবে দোষ
কভু না কবিব রোষ।
সাজা না পাইবে তারা সবে শুন ভাই॥

সাঁওতাল নেতার কৌশল

স্থানীয প্রত্যেকটি বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী ধনীব উপব সাঁওতাল সম্প্রদাযেব বিদ্বেষ ও ঘৃণাব উদ্রেক করিযা তাহাদের ধ্বংসসাধনে সাঁওতালদের নিযোগ করিবার পূর্বে তাহারা যাহাতে শিহু ও কানুর নেতৃত্বে বিশ্বাসী হইযা উঠে সেই উদ্দেশ্যে দুই ভ্রাতা এক কৌশল অবলম্বন কবে।

এই দুই সহোদরে যুক্তি করি মনে।
নিজ সম গুণধর,
জোটাইয়ে সহচব,
আরম্ভিল, পুরস্কার্ক আপন মনে।..

...হইত ঘণ্টার ধ্বনি তুলসীর তলে
কোথা থেকে কে বাজায়,
কেহ না দেখিতে পায়।
হইল আশ্চর্যান্বিত সাঁওতাল সকলে
দর্শক সাঁওতালগণ জিজ্ঞাসা করিলে
বলিত শিদ ঠাকুর
মোদের দুঃখ গেল দূর।
আসিয়াছে পরমেশ তুলসীর তলে...

শিদু-কানুর মুখে এই রহস্যপূর্ণ ঘণ্টাধ্বনির অদ্ভুত ব্যাখ্যা শুনি অত্যাচারক্লিষ্ট সাঁওতালেরা মুক্তির আশায় দলে দলে শিদু-কানুর বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাহাদের নির্দেশমত বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর দত্ত লিখিয়াছেন,—

Religion often acts as a great stimulating force among the average masses, and here also the story of a miraculous divine revealation inspired the Santals to take prompt and open measures for the removal of their distress.[১৯]

কবির বর্ণনানুযায়ী ১২৬২ সালের ১৮ই আষাঢ় তারিখে বিদ্রোহী সাঁওতালেরা দলে দলে পাঁচকেথিয়ার এক বটবৃক্ষতলে সমবেত হয়,—

বাঙ্গালা সন বারশত বাষট্টি সালে।
আঠারোই আষাঢ়েতে,
চলে পাঁচকেঠে বটবৃক্ষ তলে॥
সেই বটবৃক্ষ রাক্ষসী দেবীর স্থান।
তথায় সাঁওতাল সব,
করে মহাবীর রব,
দেবীরে প্রণাম করে সসঙ্গীত গান॥

কবি আরো লিখিয়াছেন, সেই সময়ে গোপালচন্দ্র রুজের পরলোকগত জ্যেষ্ঠতাতের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হইতেছিল—হঠাৎ সাঁওতালদের এইরূপ আচরণে তাঁহারা সকলেই শঙ্কিত হন এবং মানিক মুদী, গোরাচাঁদ সেন, হিঙ্গলাল প্রভৃতি কয়েকজন সাঁওতালদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য মদ ইত্যাদি লইয়া শিদুঠাকুরের সহিত দেখা করিতে যান। দারোগা মহেশলালও আসিয়া তাহাদের মিষ্ট বাক্যে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু 'বর্বর সাঁওতাল নানা কটু কথা কয়।' এবং শিদু ঠাকুরের আদেশে সাঁওতালেরা তাঁহাদের সকলকে ধরিয়া দেবীর সম্মুখে বলি দেয়। হিংসান্মোত্ত সাঁওতালেরা

---

১৯ The Santal Insurrection etc. p 14

অতঃপর ভগ্নাডিহিতে যাইয়া তুলসীতলে পূজা করে এবং বারহাট (Barhait) বাজার লুঠ করে।[২০]

> লুটিল বাড়েৎবাজার কত হাজার পেয়েছে সব টাকা।
> এ সকল বলতে পারে হিসাব করে নাইক কারো লেখা॥

এইভাবে লুঠ করিতে করিতে তাহারা পাকুড় আসিয়া পাঁচকেথিয়ার রাজধানী লুঠ করে এবং তাহার পর মহেশপুর অভিমুখে অগ্রসর হয়। মুর্শিদাবাদস্থিত ইংরেজ শিবিরে এই সংবাদ পৌছাইলে তাঁহারা সাঁওতাল দমনের জন্য প্রস্তুত হন। মহেশপুরে পৌছাইয়া সাঁওতালেরা রাজবাটী লুঠ করিয়া মূল্যবান ধনরত্নাদি লইয়া যায়।

> পৌছিল সাঁওতাল সবে, উচ্চ রবে, মহেশপুর গিয়ে।
> লুটিল দুষ্টচয়, রাজালয়, ধনরত্ন নিল।
> নিল সব রেশমী-বসন, স্বর্ণভূষণ যেখানে যা ছিল॥

লুণ্ঠনশেষে তাহারা যখন নদীতীরে রন্ধনে ব্যস্ত সেই সময় অকস্মাৎ ইংরেজ সৈন্য তাহাদের আক্রমণ এবং ধ্বংস করিয়া ফেলে।[২১] কবি লিখিয়াছেন,—

> দৈবেতে মহামান্য রাজার সৈন্য মহেশপুরে এলো।
> করিল মহাধূম গুড়ুম গুম, বন্দুক ছুটিল॥

সাঁওতালেরা অপ্রস্তুত হইলেও যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই—

> করিয়া দরশন সাওতালগণ ধরলো ধনুর্বাণ।
> পড়ি সে রহিল অন্ন, অবসন্ন, ক্ষুধায় কাতর প্রাণ॥
> তথাপি সাহস করে, সমর করে, রাজার সেনার সাথে।
> মরে, সবে উচ্চরবে, মহাহর্বে, বন্দুকের গুলিতে॥

শিছু ও কানু পলায়ন করিলে তাহাদের ধরাইয়া দিলে পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। অবশেষে ধরা পড়িলে বিচারে তাহাদের ফাঁসি সাব্যস্ত হয় এবং সেই পাচকেথিয়ার বটবৃক্ষ তলেই তাহাদের ফাঁসী দেওয়া হয়।[২২] কবি পরিশেষে সদাচারের উপদেশ দান এবং 'ভারতগগনে ইংরাজ শারদ পূর্ণ শশীর' মহিমা কীর্তন করিয়া কবিতা শেষ করিয়াছেন।

২০ The Santal Insurrection etc. p 14

২১ Two hundred men of 7th Regiment N. I. fell upon 5,000 of the insergents near Pakur on the bank of the Tarai river and routed them completely 'killing great numbers and without single loss of life (on their own side)' —ঐ পৃ ৩৬

২২ The Santal Insurrection etc. p 67.